ষট্‌ত্রিংশ ভাগ]

[প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৩৬

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ডি লিট্, সি আই ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্, এটর্ণি

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

ডাঃ স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি-এচ ডি, ডি এস-সি সি আই ই

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি

মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে সি আই ই

স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, এল এল ডি. সি আই ই

শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন) এফ আর এস্ ই

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্ এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার

শ্রীযুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি, এম্ এস-সি, এফ জেড্ এস্

পত্রিকাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্

চিত্রশালাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম্ এ, এড্‌ভোকেট

গ্রন্থাধ্যক্ষ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল,

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। অধ্যাপক ডাঃ কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, পি-এইচ ডি; ২। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত; ৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ৪। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্; ৫। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়; ৬। রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্ এ; ৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি এস; ৮। অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি; ৯। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল; ১০। ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি; ১১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী ভিষগ্-রত্ন এল এ, এম এস; ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; ১৩। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি, এল; ১৪। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ; ১৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি; ১৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ; ১৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, ১৯। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস (লণ্ডন); ২০। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ; ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৪। শ্রীযুক্ত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি-এচ ডি; ২৫। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; ২৬। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ষটত্রিংশ ভাগ]

সভাপতির অভিভাষণ

বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ

হিন্দু ও বৌদ্ধ

বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই কথাটা আজ কিছু বলিব। যখন আফগানেরা বাঙ্গালা দখল করেন, তখন পূর্ব্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, এমন নহে; এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। এক শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।

ইংরাজী ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিলের প্রভাবে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তাঁহার প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয় জন ছিলেন? বল্লাল সেন তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন; দেখিয়াছিলেন,—৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাঙ্গালায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বেশী ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাঙ্গালায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন।

কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা একটা মহা সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাঙ্গালা দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম ত বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে—তখন বাঙ্গালার অনেক রহস্য জলের মত

বুঝিতে পারা যায়; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বাঙ্গালায় যদি কোন ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোন নিগূঢ় কথা থাকে, তবে তাহা এই। রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটী খুলিয়া দিলে বাঙ্গালীর চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়—তাহারা কি ছিল, কি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কি হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়। ভবিষ্যতের গৌরব অগৌরবের কথা তাহাদের নিজের হাতে।

ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটী কাঁচপোকা ও একটী আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছু দিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে; দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতর-বিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না। আবার ইংরাজ অধিকাররূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া থাকিলে, কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই ত অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমান জাতি এখন বাঙ্গালা দেশে অর্দ্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, ইঁহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অর্থাৎ বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইয়া যখন বাঙ্গালা দেশ, তখন হিন্দু কাহাকে বলে ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড় দরকার। লোকে বলিবে, এ ত সহজ কথা, এর আবার ঠিক করা কি? সহজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে জানে, আমি ঠিক বুঝি; কিন্তু জেরায় টিকে না। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝায়; কেন না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার বিনয় ভিক্ষুদের জন্য, তাঁহার যত কিছু আইন-কানুন, পাচিত্তিয় পারাজিকা ভিক্ষুদের জন্য। সুতরাং বৌদ্ধ বলিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু বুঝায় না।

আর এক দল বলেন,—না। গৃহস্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ মানিত না। ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সঙ্ঘারাম তৈয়ার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তর্ব্বাস বহির্ব্বাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। ভিক্ষুরা ত রোজগার করিত না; ভিক্ষা করিয়া খাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাড়ীর অধিক চারি বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে পারিত না। যে বাড়ীতে একবার ভিক্ষা পাইয়াছে, এক মাসের মধ্যে আর সে বাড়ীতে যাইতে পারিত না। সুতরাং একজন ভিক্ষুর জন্য ৯০ ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধের দরকার হইত। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, হিন্দুরাও ত ভিক্ষা দিত; তাহারাও ভিখারী ফিরাইত না। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত।

আর এক দল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ধার্ম্মিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপরাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল। বৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—সংসার ত্যাগ বা ভিক্ষু হওয়া। সুতরাং যে গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহার তত সম্মান ও আদর হইবে। তাহা হইলেও পঞ্চ শীল লইবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন হইত, তাহাই বা ক'জনের ছিল ? অথচ শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কিরূপে হইতে পারে ?

অতএব সব বৌদ্ধকে ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার হইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগার শতকে। তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন,—আদিকর্ম্মরচনা। তাঁহারা বলিলেন, যে কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। অনেক দিন ধরিয়া এই তিনটী মন্ত্র শিখাইবার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না ; কিন্তু পরে হইয়াছিল। সুতরাং যাহার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা যে, ধর্ম্মের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? আপামর সাধারণ আপনি আপনি এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু 'শীল' দিবার সময় বড় গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, মাছ ধরা, শীকার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুরি করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারিত না। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনও আপত্তি থাকিত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িত না, তাহারা হয় বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকিত, অথবা তাহাদের জন্য ধর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা—কৌলধর্ম্ম, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, মীননাথের ধর্ম্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম্ম ইত্যাদি।

একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত ; ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ এবং পরে বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে সকল জন্মজন্মান্তরসাধ্য।

হিন্দু কাহাকে বলে ?

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। যাঁহারা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা হইতে চান না, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু। ধর্ম্ম ও নীতি তাঁহাদেরই হাতে। ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্য করেন। শূদ্রেরা উপরের তিন জাতির সেবা করেন। বাঙ্গালায় কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত এড়াইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সকল বইই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পারিবে না। যাঁহারা হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরা—বিশেষ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লেখা বই তাঁহাদিগকে পড়িতে হইত ও পড়াইতে হইত; তাহা তাঁহারা অম্লানবদনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া নাক সিঁটকাইতেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আমরা সুশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সত্য। বৌদ্ধেরা অন্য ভাষায়ও বই লিখিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ছাড়া প্রধানতঃ অন্য ভাষায় বই লিখিতেন না।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্ম্মী ও নীচকর্ম্মী লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষকে বড় এবং ছোট সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয়। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী। মুসলমানেরা অনাচরণীয়; যে হেতু তাহারা বিধর্ম্মী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই সকল অনাচরণীয় জাতিরা অনেকে এখন ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল ব্রাহ্মণকে পতিত ও অনাচরণীয় মনে করেন।

পূর্ব্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে অনাচরণীয় মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে 'চতুঃশতিকা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রকীর্ত্তি একটি গল্প দিয়াছেন,— একটি যুবক সর্ব্বদা এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করিত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুব সম্মান করিত। ভিক্ষুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ করিতেন। সে দীক্ষা লইত না; বলিত,—এখনও দেরী আছে। তিন চারি মাস পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দীক্ষা লইবার সময় হইয়াছে। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দিন হয় নাই, এখন হইয়াছে কেন? সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেলি; সুতরাং আমার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে। সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার জন্য এখন যে ব্রাহ্মণদিগকেই দোষী করা হয়, সেটা ঠিক নয়। সকল ধর্ম্মের লোকই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের লোককে অনাচরণীয় করিয়া থাকে। অনেক জায়গায় একেবারে তাহাদের বিনাশ সাধনও করিয়া থাকে।

যাহারা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, হিন্দুরা তাহাদের খুব সম্মান করেন। কিন্তু যদি সে আবার সংসারে আসিতে চায় অথবা আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন—পতিত ও অনাচরণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইরূপে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনাচরণীয় হইয়া আছে। যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহারা চতুর্ব্বর্ণ সমাজও ছাড়িয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিলে তাহারা চতুর্ব্বর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ অনাচরণীয় হইয়া রহিল।

বৌদ্ধসাহিত্য

যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাঁহারা সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপের সময় তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

তর্কবিতর্ক করিবার জন্য চলিত ভাষা ছাড়িয়া সংস্কৃতে বই লিখিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাকরণ পাণিনি লয়েন নাই। অন্য নানা ব্যাকরণের সাহায্যে বই লিখিতেন। পরে তাঁহারা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এইরূপ ব্যাকরণ কয়েকখানা খুব চলিয়াও যায়। তাহার পর তাঁহারা পাণিনির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই টীকায় তাঁহারা পতঞ্জলির মহাভাষ্যকে এক হিসাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। তাঁহাদের পাণিনির টীকা বাঙ্গালায় খুব চলিয়া যায়।

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব। তাঁহাদের অমরকোষ সকলকেই লইতে হইয়াছিল। অমরকোষের যত পরিশিষ্ট আছে, প্রায় সবই তাঁহাদের। আরও অনেক কোষ তাঁহাদের লেখা। কোষের তিন অঙ্গ—পর্য্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। তিন বিষয়েই তাঁহাদের অনেক বই আছে। ব্রাহ্মণেরাও সেই সকল বই পড়েন, পড়ান ও তাহাদের টীকা লিখেন।

ছন্দেও তাঁহাদের ভাল ভাল বই আছে। তাঁহারা পিঙ্গল নাগের অনুসরণ করিয়া অনেক ছন্দের বই লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলঙ্কারে তাঁহাদের প্রভুত্ব খুবই বলিতে হইবে। কারণ, ভামহ অতি প্রাচীন। তাঁহারই বই অনেকে অলঙ্কারের চলিত বইএর মধ্যে প্রথম বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু অলঙ্কারে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

বানানের বই বৌদ্ধদের ঢের বেশী। আমার বোধ হয়, বাঙ্গালী বৌদ্ধেরাই বেশী বেশী বানানের বই লিখেন এবং তাহাদের প্রভাব এখনও চলিতেছে। কারণ, বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ অন্য দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেক তফাৎ। তাই এইখানেই বানানের বইএর বেশী দরকার হয়।

এ ত গেল শব্দশাস্ত্রের কথা। দর্শনেও বৌদ্ধদের প্রভাব ঢের বেশী। তাঁহাদের দর্শন সমস্ত এসিয়া এখনও পড়িতেছে, পড়াইতেছে ও তাহার টীকা টিপ্পনী লিখিতেছে। তাঁহাদের তর্ক-শাস্ত্রেরও সেইরূপ এসিয়ায় সর্ব্বত্র আদর। এখনও জাপানে বৌদ্ধমন্দিরে বৌদ্ধতর্কশাস্ত্র পড়া হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ান হয়। এই দুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধতর্কশাস্ত্রেরই প্রায় জয়লাভ হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদানু-বাদের খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি অতি চমৎকার। পালি ভাষার কথা আমায় এখানে বলার কোন দরকার নাই। সংস্কৃতে বৌদ্ধদের দুই জাতীয় গল্প আছে,—১। জাতক, ২। অবদান। জাতক বুদ্ধদেবের পূর্ব্বজন্মের কথা, আর অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাদের পূর্ব্বজন্মের কথা। সকল দেশের গল্পই একটা কাঠামতে গাঁথা থাকে। আরব্য উপন্যাসের একরূপ কাঠাম, কথাসরিৎ-সাগরের আর একরূপ কাঠাম। বৌদ্ধদের কাঠাম নাই; সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। বৌদ্ধদের গল্পে পশুপক্ষী ও ইতর জন্তুর কথাও আছে। কথাসরিৎসাগর ও আরব্য উপন্যাসে তাহা নাই। বরং আমাদের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঁচীশী ও বত্রিশ সিংহাসনে জন্তু জানোয়ারের কথা অনেক। সেগুলিরও একটা কাঠাম আছে। খুব আঁট কাঠাম নহে, বড় আল্‌গা। বৌদ্ধদের কাঠামই নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যদি কাব্য বা নাটক লিখিতে বসেন, জিনিষটা একঘেয়ে হইয়া যায়। বৌদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরূপ একঘেয়ে নয়, সে কথা বলা যায় না। তবে তাহাতে কল্পনার খুব দৌড় আছে এবং সৌন্দর্য্যও খুব সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পড়িলে তাহার মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের কাব্য নাটক পড়িতেন, তাহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ব্যাকরণশুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় উদ্ধারও করিতেন।

বুদ্ধদেবের নিজের বচন বলিয়া যে সকল বই আছে, বৌদ্ধেরা তাহারই অধিক দোহাই দেন। সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের উক্তি—অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও বিভিন্ন রকমের। প্রজ্ঞাপারমিতায় ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম্ম এক। আর চণ্ডমহারোষণ তন্ত্রের ভাব আর এক, ভাষা আর এক, উপদেশ আর এক, আর ধর্ম্মও আর এক। দুইই কিন্তু বুদ্ধবচন।

বৌদ্ধদের এমন কোন স্মৃতির পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সঙ্ঘ, দুইএরই কাজ চলিতে পারে। তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সঙ্ঘের জন্য। দশ ও এগার শতকে তাঁহারা স্মৃতির বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, নিত্য কর্ম্ম, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে। ইহাতে মূলমন্ত্র, মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা-মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেক কথা লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবমূর্ত্তি-সমূহের উৎপত্তির ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সাহিত্য গেল কোথায় ?

এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায় ? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর,—হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন দিব, ও তাহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধসমাজটা গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়াছে, তাহারও কতক কতক আভাস দিব।

বৌদ্ধব্যাকরণ গেল কোথায় ?

গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমরা জানি, পাণিনিই সংস্কৃতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্ত্তিক, ব্যাড়ির সংগ্রহ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য, এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ। ব্যাড়ির সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যাকরণশাস্ত্রকে ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলে। কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য ছোট ছোট ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখান হইত; সূত্রের সঙ্গে তাহাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখান হইত। সর্ব্ববর্ম্মা সেই উদাহরণগুলি লইয়া, কতকগুলি সূত্র করিয়া কাতন্ত্র ব্যাকরণ ছয় মাসের মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য্য চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই চলিত। গরুড়পুরাণে ব্যাকরণের উপর যে দুটি অধ্যায় আছে, তাহা দেখিলে এ কথাটি বেশ

বুঝা যায়। বৌদ্ধেরা প্রথম যখন খাটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন।

পরে তাঁহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারি করেন, তাহার নাম চান্দ্র ব্যাকরণ। গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিব্বতীয় ভাষায় 'পগ্-সম্-জোন্-জঙ্' নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীর বাড়ী বরেন্দ্রভূমে, তিনি থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন। কেন না, তিনি বলিয়াছেন, গুপ্তেরা হূণদের জয় করিয়াছে। এ স্থলে তিনি লঙ্ ব্যবহার করিয়াছেন। লঙ্ ব্যবহারের অর্থ, ঘটনাটা তাঁহারই সময়ে ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিতেন। হূণেরা ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

চান্দ্র ব্যাকরণ—ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুসাশন, সূত্রপাঠ, বৃত্তি প্রভৃতিতে চারি দিকে পাণিনির মত পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল ; উহার বহুসংখ্যক টীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত ; টীকাকারেরা প্রায়ই বৌদ্ধ। এখন সে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তিব্বতীয় তর্জ্জমায় পাওয়া যায়। প্রোফেসর বেণ্ডল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোন কোন অংশ পাইয়াছিলেন। আমি উহার একখানি পূরা সূত্র-পাঠ পাইয়াছিলাম ; সেখানি জার্ম্মানিতে ছাপা হইয়াছে। এত বড় ব্যাকবণখানা লোপ হইল কিরূপে ?

সংক্ষিপ্তসার নামে একখানি ব্যাকরণ আছে ; সেখানি বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে চলে—এখনও চলিতেছে। ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য বই লিখেন। যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি-সূত্রে, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধবৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন। অথবা বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যের মত প্রবল করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতন্ত্রের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে।

চাঙ্গুদাস নামে একজন কায়স্থ বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন ; তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের টীকা লিখিয়া যেমন গ্রন্থকার বা টীকাকার কারক, সমাস, তদ্ধিতের জন্য কতকগুলি কারিকা করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি কারিকা করিয়াছিলেন। চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি এখনও উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন ? তিনি বলেন, গ্রন্থকারেরা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন চাঙ্গুদাসের

কারিকা আছে, তেমনি বৌদ্ধ রভস নন্দীরও কতকগুলি কারিকা আছে। সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে।

এই সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, রভস, চাঙ্গু লোপ পাইয়াছেন। বাঙ্গালায় চন্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, প্রয়োগরত্নমালা তাহা একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারী হয়। কামতাপুর রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ যখন সমস্ত কামতাপুর রাজ্য আপন রাজ্য-ভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও হাজোরা বাঙ্গালার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারের রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত প্রয়োগ-রত্নমালা নামে এক ব্যাকরণ লিখিলেন খৃঃ ১৫৮০ সালে। চন্দ্রের যাহা কিছু জ্যোতি ছিল, রত্নমালার আলোতে তাহা আরও ম্লান হইয়া গেল। রত্নমালা বাঙ্গালা ও আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে।

পাণিনির বৌদ্ধ টীকাগুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্টোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষ্যবিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাহাতে ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। শেষে এমন হইল যে, পঠনপাঠন ত দূরে যাক্, তাহাদের পুথি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যে কষ্ট করিয়া লোকে সেই সকল টীকা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছে, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার সুযোগ্য সহযোগী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ন্যাস বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকার পূরা পুথি কোথাও পাইলেন না; সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়া সংগ্রহ করিয়া, অনেক বৎসর খাটিয়া পুরা পুথিখানি ছাপাইয়াছেন। এই সকল পুথি বারেন্দ্রদেশে কিছু ছিল। তাহাতেই বারেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটীর উদ্বোধ হয়, এ সকল পুথি ছাপান উচিত। একখানি বৌদ্ধের লেখা পাণিনি-মতের ব্যাকরণ বারেন্দ্র অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। যাঁহারা এই লোপের মূল, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—রাঢ়দেশে বাড়ী। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের যত টীকাকার আছেন, প্রায় সবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ গয়বড় বাঁড়ুরী। ইহার উপর আবার মহারাষ্ট্রদেশের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার দু ধার আশ্রয় করিল এবং মিথিলার সুপদ্ম-ব্যাকরণ মিথিলায় স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪পরগণা আশ্রয় করিল। বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। মুগ্ধবোধের বহুসংখ্যক টীকাকার আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাড়া সবই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। একজন ছাড়া সুপদ্মের টীকাকারগুলি সব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এইরূপে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলিকে তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থান বাঙ্গালা হইতে লোপ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাহাদের যা কিছু ভাল ছিল, সব আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ অভিধান

অভিধানের ব্যাপার কিন্তু আর এক রকম। সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিষ লইয়া,—পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্য্যায় মানে, এক মানের অনেক শব্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দের নানা অর্থ। লিঙ্গ শব্দে কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ। বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্য, কালিদাস, অমর প্রভৃতি অনেকেই ইহার এক একটি অংশের বই লিখিয়া যান। কিন্তু বৌদ্ধ অমর সিংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গানুশাসন' এবং 'ত্রিকাণ্ড' নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন; আগেকার সব পুথি কাণা হইয়া যায়; উহার এত প্রচার হয় যে, উহার তিন চারিখানি পরিশিষ্ট লেখা হয়। একখানির নাম শেষামর, একখানির নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও আর একখানির নাম 'বিশ্বলোচন' বা 'মুক্তাবলী'। স্বয়ং নৈষধকার উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্তু ছোট সমালোচনা করেন। উহার বহুসংখ্যক টীকা লেখা হয়। অমর ও তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণেরা লোপ করিতে পারেন নাই।

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান বৌদ্ধের লেখা; উহা কিন্তু নানার্থ শব্দ মাত্র। গ্রন্থকার আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সাহসাঙ্ক নরপতির চিকিৎসক ছিলেন এবং কান্যকুব্জের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়, বাঙ্গালী ছিলেন। কেন না, তাঁহার বইএ এক অংশ আছে বানানের জন্য। অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। বইখানি লেখা ১১১১ খ্রীঃ অব্দে।

আর একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তম দেব; তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন। অমরের পর বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সম্প্রদায় হয়। সেই সকল সম্প্রদায় কত নূতন নূতন শব্দ চলিত করিয়া দেয়; সে সব তিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিশিষ্টে জুড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার আরও একখানি অভিধান আছে, তাহার নাম 'হারাবলী'। যেখানে যত অপ্রচলিত শব্দ আছে, হারাবলীতে তাহার মানে দেওয়া আছে। তাঁহার একখানি ব্যাকরণ আছে; নাম 'ভাষাবৃত্তি'। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জ্জন করিয়া যাহা থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা। লোকে বলে, লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক কার্য্য আছে—সেটা বানান দুরস্ত করা। অন্যান্য দেশে সংস্কৃত বানানের বইএর দরকার হয় না; কিন্তু বাঙ্গালায় আমরা অন্তঃস্থ "য" ও বর্গীয় "জ," এই উভয়ের ভেদ করিতে পারি না। অন্তঃস্থ "ব" ও বর্গীয় "ব"এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্দ্ধণ্য "ণ" ও দন্ত্য "ন"-কারের উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। তিনটা "শ, ষ, স"ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। এ জন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল শব্দের দুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারও একটা তালিকা করিয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পারেন নাই। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অমরের উপর নানা দোষারোপ করিয়াও তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অমরের ভাল ভাল টীকা লিখিয়াছেন, মূল হইতে টীকার আদর অধিক হইয়াছে। অমরের প্রথম বাঙ্গালী টীকা ১১৫৯ ইংরাজী অব্দে তৈয়ারী হয়; টীকাকার সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুর্জ্যা। আমাদের দেশে

তাঁহার বইএর পুথি থাকিলেও দক্ষিণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়া যায় এবং সেখানে ইহার আদর অধিক। আমাদের দেশে আর একখানি টীকার আদর অধিক; সেখানি বৃহস্পতি মতিলালের। ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন। তখন একজন হিন্দু বাঙ্গালার সুলতান হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৃহস্পতির প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন, ইঁহাকে অনেক উপাধি দেন। 'রায়মুকুট' উপাধি দিবার সময় ইঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া অভিষেক করা হয়। ইঁহাকে অনেক জড়ওয়া গহনা দেওয়া হয়, দুটী ছত্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়া হয়, আর রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। ইঁহাদের দুজনের টীকা ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যায়, কেমন করিয়া বৌদ্ধসাহিত্যের লোপ হইতেছে। সর্ব্বানন্দ প্রায় ৩০ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, আর রায়মুকুটে মাত্র দশখানি। ইঁহার পর বাঙ্গালায় অমরের ঢের টীকা টিপ্পনী হইয়াছে; তাহাতে বৌদ্ধসাহিত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা হয় নাই, বরং দেখাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, অমর বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে; তিনি হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখিবার জন্য অনেক নূতন নূতন অভিধান লেখা হইয়াছে। কিন্তু অমর যে অমর, সেই অমরই আছেন—তিনি মরেন নাই।

ছন্দঃশাস্ত্র

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 'ছন্দঃসূত্র'ই চলিত। পরে বৃত্তরত্নাকর চলিতেছে। তাহার পর 'ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের লেখা। বৌদ্ধদের একখানি খুব বড় অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক—রত্নাকর-শান্তি। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত-দেশে এখনও দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড় যে রত্নাকরশান্তি, তাঁহারও ছন্দের বই টিকিল না—লোপ পাইল।

অলঙ্কার

ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন—না হইবার সম্ভাবনা অধিক, তবে বৌদ্ধদের অলঙ্কারের বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে অলঙ্কারের বই ছিল না বা অলঙ্কারের চর্চ্চা ছিল না, এ কথাও বলিতে পারি না। কারণ, কালিদাসের কাব্যগুলির তীব্র সমালোচনা বৌদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল। এ কথা মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক নন—স্বয়ং দিঙ্‌নাগ।

ন্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল বইএর তর্জ্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্যায় ৭।৮টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া খসিয়া প্রমাণগুলি নাগার্জ্জুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন; তাহার পর দিঙ্‌নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিষ্ট হইতে বাদ দেন।

তখন বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র প্রমাণ দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ আর অনুমান। আমাদের ন্যায়সূত্রখানি নাগার্জ্জুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে লেখা হয়। ইঁহারাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইঁহারা সেই চারিটিই ধরিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোরতর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। বাৎস্যায়ন, ন্যায়বার্ত্তিককার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চারিটি প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মোদয়, শীলভদ্র প্রভৃতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া গিয়াছেন এবং দুই প্রমাণ স্থাপনের জন্য তুমুল তর্ক করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা ন্যায়সূত্রের লক্ষণই খাঁটি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা সে লক্ষণ পরিহার করিয়া কল্পনাপোঢ় প্রথম ও তাহার পর "কাল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্" লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের গৌতমসূত্র তিনরূপ অনুমান স্বীকার করেন,—(১) পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য, (২) শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণ এবং (৩) সামান্যতো দৃষ্ট। বৌদ্ধেরা দুইরূপ অনুমান মানেন—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। ইহার মধ্যে পরার্থানুমানের জন্যই অবয়বের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ সিলোজিস্‌ম্। আমাদের নৈয়ায়িকেরা পাঁচটি অবয়ব মানেন, বৌদ্ধেরা তিনটি বই মানেন না। তাঁহাদের পুস্তকসমূহে অনুমানের যে প্রয়োগ খাটান, তাহাতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব দেখান। কিন্তু আমাদের পঞ্চ অবয়ব শুদ্ধ অনুমানের মূল নহে, উহা তর্কের মূল; তর্ক করিতে বসিলেই অবয়ব সাজাইতে হয়। গোতম, আমাদের অবয়ব অনুমানপ্রমাণের মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তের পর দিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমান ছাড়া অন্যত্রও অবয়বের দরকার হয়। কিন্তু অবয়ব সাজান বড় জটিল ব্যাপার দেখিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা, এই দুইটিকেই অনুমানের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং ব্যাপ্তির লক্ষণ করিতে গিয়া অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাপ্তির পক্ষধর্ম্মতা অবয়বেরই সার কথা। উদাহরণ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে তাহার একটি যদি পক্ষে অথবা পর্ব্বতে থাকে, তবেই অনুমান হয়। কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং ব্যাপ্তির ধারণাটা কোন্ পক্ষ হইতে উঠে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই প্রথম উঠে।

কিন্তু উদাহরণ হইতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাহাতে অনেক সময় উদাহরণ পাওয়া যায় না। বহ্নি ও ধূম স্থলে অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, বহ্নি ও ধূম এক জায়গায়। কিন্তু উচ্চ অনুমান স্থলে, যথা—ঈশ্বরানুমান অথবা ধর্ম্মকায়ানুমানে, উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেখানে বৌদ্ধেরা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, উদাহরণ ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়; উহার নাম অন্তর্ব্যাপ্তি। অন্তর্ব্যাপ্তির উপর রত্নাকরশান্তির এক বই আছে; তাহার নাম অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন। রত্নাকরশান্তি খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ সালেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য যখন তিব্বত দেশে যাত্রা করেন, তখন তিনি বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই।

বার শতকের শেষ ভাগে মিথিলায় মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদের ন্যায়শাস্ত্র ঘুঁটিয়া চারিটি প্রমাণের উপর চারিখানি চিন্তামণি রচনা করেন। চারিখানির সাধারণ নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। এই পুস্তক রচনা বা সঙ্কলনের উদ্দেশ্য—"প্রচণ্ডপাষণ্ডতমস্তিতীর্ষয়া," অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করা। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বই আমাদের দেশে মূল বলিয়া

বিখ্যাত। এই মূলের বহুসংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই সকল টীকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালা—এমন কি, ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে। দু একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ পশ্চিম-ভারতের জৈনভাণ্ডার হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধেরা খুব সোজা করিয়া আনিয়াছেন। আর আমাদের ন্যায়শাস্ত্র এখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া শেষে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকার নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী—এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহার স্থিতি নাই। উঁহারা দুই সত্য মানেন—এক সাম্বৃত সত্য, আর এক পরমার্থসত্য। সাম্বৃত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায়, উহার মূল নাই, উহা মায়া। আরও পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের শেষ বিচার। ইহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্মবাদ। উঁহাদের পরমার্থসত্য ধর্ম্মধাতু। ধর্ম্মধাতু অনির্ব্বচনীয়; উহার আর এক নাম শূন্য। শূন্য অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়: উহা অনির্ব্বাচ্য একটা স্বরূপ—যাহা বাক্য মনের অগোচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশি,—এই শূন্যতার নামই বজ্র। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এই যে সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক্ হইতে হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক দিকে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই সমস্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় এবং শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই মতই প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার পড়িয়া যাঁহারা শঙ্কর ও গৌড়পাদের এই দুখানি বই পড়িবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারিবে না। শঙ্করের পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা বলিতেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" এখন দুই হাতে দুই মতের বই লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না; মনে হইবে,—"প্রকাশং বৌদ্ধমেব তৎ।" তবে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উহা সৎশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর বৌদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছাস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, মায়া জিনিষটা নাগার্জ্জুন ২য় শতকে লেখেন আর শঙ্কর সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৮ শতকের গোড়ায় একখানি বই বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে লেখা হয়; সেখানির নাম 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচারের কথা লেখা আছে। যখন বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক পরস্পর বিচার করিতে আসিলেন, বৌদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন,—ভাই, তোমায় আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বল, "আছে আছে", আমি বলি,—"নাই"। অর্থাৎ তুমি বল,—ব্রহ্ম, আমি বলি, - শূন্য। কিন্তু কাজে আমরা দুই জনেই এক।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" করেন নাই। তাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক,

এই দুইটি দর্শনের ঐক্য করিয়া বৌদ্ধদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য উদয়ন। তিনি 'দ্রব্যকিরণাবলী' ও 'গুণকিরণাবলী' নামে বৈশেষিকের টীকা লিখিয়া তাহার পর 'আত্মানাত্মবিবেক' রচনা করেন। ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসম্বন্ধে যতরূপ মত হইতে পারে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর তাহাদের আবার যত অবান্তর মত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, এক এক করিয়া খণ্ডন করেন ও তাহার পর আপনাদের ন্যায়-বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থাপন করেন। তাঁহার মতের সারসংগ্রহ হইতেছে—গঙ্গেশের অনুমানখণ্ডের ঈশ্বরানুমান অধ্যায়। এই মত যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, বৌদ্ধেরা ততই হঠিতে লাগিল। আত্মানাত্মবিবেকের নাম হইল বৌদ্ধ-ধিক্কার; একটু সাধু ভাষায় উহার নাম হইল বৌদ্ধাধিকার। এক শত বৎসর পূর্ব্বে অনেক নৈয়ায়িকই এই বই পড়িতেন ও পড়াইতেন। কিন্তু বৌদ্ধমত, বৌদ্ধদের পুথি হইতে, তাঁহাদের জানা না থাকায় বলিতেন, এ অতি কঠিন গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা যে ন্যায়-বৈশেষিক মতের প্রভাবেই হঠিয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। দেশে মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ। বৌদ্ধদের সঙ্গে যখন ন্যায়-বৈশেষিক-ওয়ালাদের বিচার হয়, সে সময় তর্কবিতর্কের যে সকল বই লেখা হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদের দুচারখানি আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াছি। একখানির নাম—'সামান্যদূষণদিক্-প্রসারিতা'। বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। তাহারা এক ক্ষণে একটিমাত্র পদার্থ দেখে, সুতরাং অনেক পদার্থ লইয়া যে সামান্য বা জাতি হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাহারা বলে, গাছ বুঝি, কিন্তু বন বুঝি না। তাহারা বলে, তোমার হাতে ত পাঁচটা আঙ্গুল আছে, সামান্য মানিলে ত ছয়টা মানিতে হয়; কিন্তু তোমরা ত সকলে ছ-আঙ্গুলে নও।

স্মৃতি

স্মৃতি বলিতে কি বুঝায়? শঙ্করাচার্য্য এক জায়গায় মহাভারতকে স্মৃতি বলিয়াছেন, আর এক জায়গায় গীতাকে স্মৃতি বলিয়াছেন। মনুস্মৃতিতে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, অর্থশাস্ত্র আছে, মোক্ষশাস্ত্রও আছে। ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি স্মৃতিতে আছে। তাঁহারা বলেন, অন্য অন্য জাতি আমাদের দেখিয়া শিখুক। বৌদ্ধদের বিনয়—সে বুদ্ধের হুকুম; পুরাণ ধার্ম্মিক লোকের স্মৃতি নহে। সে বিনয়ও ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নহে। তবে যে গৃহস্থ ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সকলের ত ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহারা কি করিবে? এ কথার এক উত্তর, তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মে স্মৃতির উল্লেখ বড় দেখা যায় না। রাজকার্য্য ব্রাহ্মণে করিতেন, ধর্ম্মকার্য্যও ব্রাহ্মণেই করিতেন। বিচার ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাই যখন বৌদ্ধেরা খুব প্রবল, তখনও ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণের স্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাজের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্মৃতি হইতে খসিয়া পড়িল, আবার অনেক জিনিষ তাহাতে আসিয়া জুটিতে লাগিল। দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা মনুতে দেখা যায় না। যখন শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা স্মৃতিভুক্ত হইয়া গেল। দীক্ষা বহুকাল স্মৃতির বাহিরে ছিল। বৈদিক দীক্ষা বেদে ও বৈদিক বইএ ছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা তন্ত্রে ছিল।

স্মার্ত দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন দীক্ষার উপর এক তত্ত্ব লিখিয়া গেলেন। বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই। কিন্তু ৯।১০ শতকে লেখা কয়েকখানি স্মৃতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা। তাহার ব্যাপার দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া (নাম—আদিকর্ম্ম), দিনের কাজ, বার-ব্রত ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল বইএর সংখ্যা বড় কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে ; তাহাতে মনে হয়, আরও ছিল—লোপ হইয়াছে। এ সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধ স্মৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন।

মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় রাখিবার জন্য যেখানে তাঁহাদের রাজক্ষমতা লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকারার্থ এরূপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশখানা আস্ত পাওয়া গিয়াছে। "আস্ত নিবন্ধ" বলিতে রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের মত বড় বড় নিবন্ধ। আর ১৫০ খানার খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এটা অমুক আস্ত নিবন্ধের খণ্ড। এ ছাড়া আবার স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও আছে।

এই যে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্য, ইহাতে বৌদ্ধদের স্মৃতি একেই ত কম, সব মিশিয়া গিয়াছে, আর বাকী লোপ হইয়াছে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, তান্ত্রিক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, এ সব আমরা লইয়াছি। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। বিনয়ে বৌদ্ধেরা যে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল লইয়াছিলেন এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ বাহির করিয়া একটা প্রকাণ্ড জিনিষ করিয়াছিলেন, তাহাকেও আমরা লই নাই। তাঁহাদের স্মৃতিতে জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্র

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা অথর্ব্ববেদের অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না, তাহাই অথর্ব্ববেদ। এ কথার কি মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দুখানি পুথি দেখিয়াছি। একখানিতে ঋচীক ও মতঙ্গ কথা কহিতেছেন নৈমিষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কি হইল ? আমরা ত বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটা কি দীক্ষা আইল ? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরাণ দীক্ষা—বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া ত এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একখানি পুথিও ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম 'কুলালিকাম্নায়' বা 'কুব্জিকা-মত'। ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন,—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।"
"যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে, কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস ত ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুথি দুখানিই ৮ম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কীস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা সে সকল ধর্ম্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন; তাঁহারাই তন্ত্র এ দেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্ব্বত, এই সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেই সব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র শব্দ ইহার পূর্ব্বে ছিল। বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্ট উৎপল নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম।

সকল তন্ত্রেই দেখিতে পাই, অন্য অন্য তন্ত্রের নাম করিয়াছে। কিন্তু আমার দুইখানি পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল আছে, "পূর্ব্বতন্ত্রে" কোনও তন্ত্রের নাম নাই। এই সকল কারণে আমার মনে হয়, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭।৮ শতকে আসে এবং ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধেরা তখন প্রবল; উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচার-কার্য্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মপ্রচার করিবেন না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল। শৈবেরা "তন্ত্র" বলিত আর বৈষ্ণবেরা বলিত "পঞ্চরাত্র"। ঐ বাহিরের আসা জিনিষ ভারতে আসিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালায় পঞ্চরাত্র বড় ছিল না; পঞ্চরাত্রের দুই শতের উপর বই আছে। বাঙ্গালায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। একখানি পঞ্চরাত্র এশিয়াটিক সোসাইটী বাঙ্গালা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিল —উহা 'নারদপঞ্চরাত্র'। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে—উহা জাল। শৈব তন্ত্রগুলি কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশী; উহাদেরও বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধ তন্ত্র ভাঙ্গা। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল বিহারে, (ভাগলপুরের কাছে) জগদ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র জমিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রেরই প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছিল।

শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; উহাঁরা বেদ স্মৃতি লইয়াই বেশী থাকিতেন। মুগড়াচার্য্যের বেদের টীকাই বোধ হয়, বেদের আদি টীকা। উহা লোপ পাইয়াছে। ভবদেব, নারায়ণ, হলায়ুধ, পশুপতি, জীমূতবাহন, ইঁহারা বেদ ও স্মৃতি লইয়াই থাকিতেন।

বৌদ্ধ তন্ত্রই বাঙ্গালায় খুব বেশী ছিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রে বেশী মন দিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না; যাইবার কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশী আরম্ভ হয়। তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি বেশী হয়। ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙ্গা পড়ে। মুসলমানেরাও বড় সুস্থির ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। তাহার পর প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সৈন্য মারা যায়। ফিরিয়া আসিবার পথে আসামীরা অবশিষ্ট সৈন্য জলে ভাসাইয়া দেয়। বক্তিয়ার ২০টি মাত্র সিপাহী লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন।

এবং ক্ষোভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর আলি মর্দ্দান নামক একজন বাঙ্গালার কর্ত্তা হন। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বেশী দিন থাকে নাই। তাঁহার পর হইতে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালায় আসে, সেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, আর দিল্লী হইতে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে বাঙ্গালার নাম "ঝগড়ার দেশ" হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়াসুদ্দীন বুলবন বাঙ্গালায় আসেন। তিনি সোনারগাঁএর 'রায়' বা রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক মারিয়া মুসলমান-বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড় ছেলেকে বাঙ্গালার কর্ত্তা করিয়া দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লী হইতে পৃথক্ হইতে চাও, তোমাকেও শূলে দিব। তিনি আবার বাঙ্গালাকে এত ভালবাসিতেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে বাঙ্গালায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে দিল্লীর সুলতানেরাও সুলতান বলিত। এই তিন পুরুষেই তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালউদ্দীন খিলিজি বাঙ্গালায় আসিয়া, বাঙ্গালা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান—সাতগাঁ, গৌড় ও সোনার গাঁ। এই তিন কর্ত্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান এবং শেষ ১৩৪৫ সালে শমসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ সমস্ত বাঙ্গালার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ইঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন পুরুষে বাঙ্গালায় কতক শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের পর রাজা গণেশ বাঙ্গালার কর্ত্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা আবার গজাইতে আরম্ভ করে। ইঁহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহা হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বাঙ্গালায় নব-জীবন লাভ করে। দুই শত বৎসর বাঙ্গালায় যে কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, বলা যায় না। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে, কোনও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত বই লেখা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন কি, কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা বই যে কপি করা হইয়াছিল, তাহাও পাই নাই। ইতিহাসের মধ্যে এই দুই শত বৎসর যেন সব শাদা।

বৃহস্পতি হইতে আবার বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের নব-জীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং 'স্মৃতিকণ্ঠহার' নামে একখানি স্মৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সময় কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। মিথিলায় বিদ্যাপতি এই সময়েই তাঁহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত্ত পুস্তকসকল রচনা করেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাঙ্গালায় একটা নূতন জাগরণ আনিয়া দেন। সুতরাং গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের জাগরণ হয়। এ সময়েও বৌদ্ধেরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাঙ্গালায় ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্দ্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আর একজন সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর এক ব্যক্তির পড়ার জন্য কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন।

১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন

আর বৌদ্ধেরাও স্বধর্ম্মের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ কাব্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বেও বৌদ্ধদের অনেক তন্ত্রের বই ছিল। কিন্তু ঐ অধিকারের পর হইতে আর বড় একটা তাঁহাদের বাঙ্গালাদেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না। বৃহস্পতি রায় মুকুটের সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য নামে একজন আবির্ভূত হইয়া তন্ত্র প্রচার আরম্ভ করেন। বড় শঙ্করাচার্য্য হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছে গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তিনি অনেক বই লেখেন। লোকে বলে, তাঁহার বংশধরেরা আজিও রাঢ়দেশে হুগলী জেলায় বাস করিতেছেন। তিনি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও লিখিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ৫।৬ খানা বই পাওয়া গিয়াছে। 'প্রপঞ্চসার' বড় শঙ্করাচার্য্যের নামে চলিতেছে। কিন্তু পড়িলে উহা একেবারে অদ্বৈতাচার্য্যের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কমলাকরের পুত্র শঙ্কর। তাঁহার অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমডাঙ্গার কালীবাড়ী তাঁহারই কোন চেলার তৈয়ারী। উহাতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ১৪টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি ঐ কালীবাড়ীর মোহান্তদিগের। পাঁজীতে এক শঙ্করাব্দ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে উহার আরম্ভ। উহা এই শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তন করেন। উনি বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইঁহার পুথিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব্ববাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন,—ত্রিগুণানন্দ, তাঁহার চেলা ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। সুতরাং তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইহাঁদের এক গাড়ী বই পওয়া যায়। রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাঁদের অনেকগুলি বই ছাপাইয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের 'তারারহস্য' একখানি। সেখানিতে বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে। তারা, পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের একজনের শক্তি। নেপালের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন যে, তারাই প্রজ্ঞা, বুদ্ধের শক্তিও ধর্ম্মের রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। 'তারারহস্য' পড়িয়া আমারও তাই বোধ হইয়াছিল। উহাতে যে সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা হিন্দুদের অকথ্য পঞ্চ মকারগুলির সকলেই উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও অহিন্দু ব্যবহারের কথা উহাতে আছে। লোকে বলে, ঢাকার রমণার কালীবাড়ী ব্রহ্মানন্দেরই স্থাপিত। উনি ঐ মূর্ত্তি কামাখ্যা হইতে আনিতে আনিতে ঐখানে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং ঐখানেই তাহাকে স্থাপন করেন। আমার সংস্কার, ইঁহারা তিন জনেই বৌদ্ধ তন্ত্রকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান। বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি লোপ পায়। আর ইহাঁদের শিষ্য-সেবক বেশী হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার তন্ত্রসারে স্থান দিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুটি আমার খুব মনে পড়ে—একটি ক্ষেত্রপাল, আর একটি মঞ্জুঘোষ—বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর অপভ্রংশ। রাঢ়দেশে শুনিয়া আসিয়াছি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও মঞ্জুঘোষের উপাসক আছেন। তন্ত্রের এই সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন ; না দেখিয়া না পড়িয়া তাঁহারা কিছুই লেখেন নাই। তন্ত্রসারের দেবতারা কৃষ্ণানন্দের সময়ে পূজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহাদের স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র যে 'আগমকল্পলতিকা' বলিয়া বই লেখেন, তাহাতে আরও অনেক

বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি দেওয়া আছে। এইরূপে আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আপন তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। কোন কোন বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন। এই সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পূজা নিজ গ্রন্থভুক্ত করিবার অর্থ কি? উহাঁদের উপাসক ও পূজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া।

অন্য কথা কি বলিব, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পাঁচটি শক্তি আছেন; তাঁহাদের নাম—রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইহাঁদের দুজনের—মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন—মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্রপ্রমর্দ্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী—দুর্গোৎসবের মধ্যে ইহাঁদেরও পূজা হইয়া থাকে।

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরূপ, আমাদেরও সেইরূপ। উদাহরণ—ক্ষেত্রপাল, উদাহরণ—কালী। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালায় বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দু তন্ত্রভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদের ত দেবতা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বৌদ্ধদর্শনও দেবতাদিগকে মানুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মনে করে। তাহারা ইন্দ্র চন্দ্রাদির, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজা করে না। তবে তাহাদের আর একরূপ দেবতা আছে; সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মায়—ধর্ম্মধাতু হইতে তাহার উৎপত্তি। অথবা তাহারা ধর্ম্মধাতুর বিবর্ত্তমাত্র। তাহাদের নামে প্রায়ই বজ্র শব্দ জোড়া থাকে, যেমন বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্রধাত্বীশ্বরী। ভক্ত আপনাকে সেই দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করে।

এই সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুর হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্ম অনেক সময় স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। ধর্ম্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্ম্মঘরে যোগী ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর এখনও বৌদ্ধই আছেন; কেন না, এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তাঁহার পূজা করেন, অন্ততঃ পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন।

সংঘ আর দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নায় একটা পুকুর খুঁড়িতে ধর্ম্মঠাকুরের একটা মূর্ত্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল গন্ধবণিক্ সংঘে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন। আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের সাংঘাতের মধ্যে আছেন। যেমন—'সই সাংঘাতিন নাতিন মিতিন।' সংঘ আর দেবতা নাই।

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি বটে, তাহাদের হিন্দু পোষাক পরাইবার যত্ন করিয়াছি বটে, তাহাদের অনেকটা রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছি বটে—কিন্তু তাহাদের বীজ এখনও ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। এই বীজ দিয়াই ধরা পড়ে—কে কাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের তান্ত্রিক দেবতার

বীজের আমরা অর্থ করিতে পারি না। কেন এই বীজে এই দেবতা হয়, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বৌদ্ধেরা ঠিক পারে। তাহাদের বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদরা আসে। আমাদের আসে না। তাই বোধ হয়, আমরাই ঋণী ও বৌদ্ধেরা মহাজন।

দেখুন না, আমরা যখন "ধ্যায়েন্নিত্যং," "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার ধ্যান করি, তখন আমরা হিন্দু। আর যখন "আত্মানং বিষ্ণুস্বরূপং বিভাব্য" বলিয়া পূজা করি, তখন আমরা বৌদ্ধ। যখন আমরা লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান করি, তাহার পর অনাহতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দেখি, হৃদয়ে তাহার হস্তপদ বাহির হয়, কণ্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমূর্ত্তি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মস্তকে সহস্রদল পদ্ম নিম্নাভিমুখ রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষীরধারা ভক্ষণ করি, তখন আমরা খাঁটি বৌদ্ধ। আমরা যখন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বলি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার যখন আমরা বলি,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখনও আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুত্বে আসিয়া দাঁড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু; বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করে, তাই তাহারা 'গুভাজু'। আর আমরা দেবতা ভজনা করি বলিয়া আমরা 'দেবভাজু'। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্দ্ধ-হিন্দু, অর্দ্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কাণে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচ জন বই ত আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বৌদ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোট ছিল; যাহারা অবৌদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি সমাজ ছিল। তাহার পর মুসলমান যখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা রাজার সাহায্য হারাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আমাদের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল।

এ সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে 'নব শাখ' বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্য্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্য্যাদা হারান নাই। কায়স্থদের কথা একটু বেশী করিয়া বলা ভাল। বাঙ্গালায় জমাজমী সম্বন্ধে কায়স্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল। ফরিদপুরের যে চারিখানি তাম্রশাসনকে রাখালবাবু জাল

বলিয়াছিলেন এবং পার্জিটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খৃ ৫০০ হইতে ৬০০ এর মধ্যে লেখা। তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমী গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না। তেঙ্গুরে যে সকল সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কায়স্থের রচিত। টঙ্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। 'চাঙ্গুকারিকা'গুলি কায়স্থ বৌদ্ধ চাঙ্গুদাসের লেখা। চাঙ্গুকারিকার টীকাকার বলেন, কায়স্থদের ইষ্টদেবতা বুদ্ধ। সুতরাং কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। কারণ, দেশের জমীর হাট-হদ্দ তাঁহারাই জানিতেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাঝে মাঝে আছে,—"নেড়ে জব্দ করবি যদি কায়েৎ ডেকে আন্"। ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত কায়স্থগণই বাঙ্গালায় বেশী পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। প্রথম, রাজা গণেশ, যিনি বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছিলেন, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ; দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই দৌহিত্রবংশ। তাহার পর চৈতন্য-পরিকরের মধ্যে বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ খুব প্রবল হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের ডান হাত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সাতগাঁ দখল করিয়া লইয়া, সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, কায়স্থরাই জমীদার, তাঁহাদের বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ও হাতী ঘোড়া ছিল।

কিন্তু তখনও কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ী তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বই নকল হইতেছিল। তখনও দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল হইতেছিল, তাহা কোন বিশেষ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, মহাযানের মর্ম্ম বোধের বই। সে বইখানা ইংরাজী ১৪৩৬ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে আরও বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রযানের অতি শুদ্ধ বাঙ্গালা অক্ষরের একখানি বই কেম্ব্রিজে আছে। কলাপব্যাকরণের টীকা টিপ্পনী শুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কপি করা হয়। সেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

এই সকল দৃষ্টে বেশ জানা যায় যে, ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশে চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা নাই। চৈতন্যদেব নিজে দক্ষিণদেশে বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল। এই সকল বই যদিও চৈতন্যের জীবনের ঘটনা লইয়া লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যদিগের অভ্যুত্থান। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, টীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন—এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় ন্যায় ও স্মৃতির প্রচার করেন। স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা। ইহাঁদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড় একটা নাই, কিন্তু ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকার শূলপাণি লিখিয়াছেন—বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৌদ্ধ যদি দেশে অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে

হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ মহাশয়েরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয় শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাজ শাসনে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সহায় হন। বার ভূক্তিয়ার মধ্যে যে কয়জন কায়স্থ ছিলেন, সবাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামত সমাজ শাসন করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত উপাধিধারী লোকেরাই বৌদ্ধদিগের জন্য স্মৃতির বই লিখিতেন, পূজা আদির বই লিখিতেন, ব্যবস্থার বই লিখিতেন, দীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উপর ভিক্ষুরা ছিল। ভিক্ষুরা মারা গেলে বা পলাইয়া গেলে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে চৈতন্যদেবের সময় অনেক গুপ্ত ও তাঁহাদের কুটুম্ব বৈদ্যগণ চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও গুরুগিরি করিতেছেন।

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্য্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনও কারণে বৌদ্ধধর্ম্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, 'বর্ণবিপ্র হয় মঠধারী' অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিগণের যাঁহারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী অর্থাৎ ভিক্ষু। আমরা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পৈতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। তাহার পর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব গাঞী গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল পতিত বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণদের গোড়া খুঁজিতে গেলে ৯ বা ১০ পুরুষের বেশী পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পূর্ব্বে বর্ণের যে সব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "মঠধারী"। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সুতরাং ইঁহারা এখন এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ণব্রাহ্মণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহারা যদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে আমরা একেবারে মারা যাইব। কারণ, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে রাজী নহেন। কেন নহেন, তাহার মূলতত্ত্ব একটি প্রধান রিসার্চের কথা। ঐ মূল কথাটি বাহির হইলে সমাজ সংস্কারের যে ঢেউ উঠিয়াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এবং জোরে সংস্কার চলিতে পারিবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী *

এককালে জগতের অনেকানেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। হিন্দু, গ্রীক্, ইহুদি, আরব প্রভৃতি সকল জাতিই ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির মধ্যে তাহার বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। টীকাকার মক্ষিভট্ট[১] তাহাকে 'অক্ষর-সংখ্যা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও সেই নাম স্বীকার করিয়া লইলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

হিন্দুপ্রণালী—আর্য্যভট

ভারতবর্ষে এককালে অক্ষর-সংখ্যার একাধিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাহার একটি ৪৯৯ খ্রীষ্ট সালে সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য আর্য্যভট কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ৪৭৬ সালে কুসুমপুরী নগরীতে (অপর নাম পাটলীপুত্র, বর্ত্তমান পাটনা) আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' প্রণয়ন করেন। তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বিবরণ সেই গ্রন্থে পাওয়া যায়[২]। ঐ প্রণালীতে সর্ব্বসমেত বিয়াল্লিশটি অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তেত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ, বাকী নয়টি স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণগুলি এই,—অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ। আ, ঈ, ঊ, ৠ ও ৡ—এই দীর্ঘ-স্বরবর্ণ সাধারণতঃ আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে ব্যবহৃত হয় না। কখন হইলেও তাহারা তত্তৎ হ্রস্ব-স্বরবর্ণেরই সমশক্তিক বলিয়া ধরা হয়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ণমালা নির্ব্বাচন বিষয়ে আর্য্যভট 'শিবসূত্রে'র অনুসরণ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের মতে বর্ণমালায় মোট বিয়াল্লিশটি অক্ষর—তেত্রিশটি ব্যঞ্জন ও নয়টি স্বর। বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনিও 'শিবসূত্রে'র অনুসরণ করিয়াছেন। 'শিক্ষা' ও 'বেদপ্রাতিশাখ্য' প্রভৃতির মতে বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশী। কাহারো কাহারো মতে অক্ষর ৬০ হইতে ৬৪টি।

আর্য্যভটের মতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্কখ্যাপন-শক্তি নিম্ন প্রকার[৩]।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
		য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
২১	২২	২৩	২৪	২৫					
প্	ফ্	ব	ভ্	ম্					

---

* ১৩৩৫। ৫ই ফাল্গুন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। ইনি শ্রীপতিকৃত 'সিদ্ধান্তশেখর' নামে বৃহৎ জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। মক্ষিভট্ট ১৩৭৭ খ্রীষ্টীয় সালে জীবিত ছিলেন। শ্রীপতি ১০৩৯ সালের লোক।

২। 'আর্য্যভটীয়', গীতিকাপাদ, ২ শ্লোক।

৩। বাঙ্গালা বর্ণমালায় বর্গীয় ব-কারে ও অবর্গীয় ব-কারে কোন ভেদ নাই। দেবনাগর বর্ণমালায় তাহাদের ভেদ আছে। সেই ভেদ বজায় রাখিবার জন্য আমরা অক্ষর-সংখ্যায় বর্গীয় ব-কারকে 'ব' এইরূপে লিখিলাম।

আর্য্যভটের প্রণালীতে অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণ কোন সংখ্যা খ্যাপন করে না। কিন্তু তাহারা অঙ্কস্থান নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় যে, সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি কোন্ অঙ্কস্থানে বসিবে। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু গণনাশাস্ত্রে একক, দশক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত আঠারটি অঙ্কস্থান স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যভট তাহাদিগকে দুই দুই করিয়া নয় যুগলে ভাগ করেন। পরে অ, ই, ক্রমে স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের চিহ্নিত করেন। যথা,—

ঌ ঋ উ ই অ

বৃন্দ অর্ব্বুদ কোটি নিযুত লক্ষ অযুত সহস্রক শতক দশক একক

ঔ ও এ

পরার্দ্ধ মধ্য অন্ত্য সমুদ্র শঙ্খ মহাপদ্ম নিখর্ব্ব খর্ব্ব

কোন ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পৃক্ত হইলে স্বরবর্ণটি তাহাকে স্বীয় যুগলে টানিয়া নেয়। কিন্তু ঐ যুগলের কোন্ স্থানে সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য আর্য্যভট আর এক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অঙ্কস্থানকে 'বর্গ' ও 'অবর্গ' এই দুই সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। একক, শতক, অযুত প্রভৃতি বর্গস্থান; আর দশক, সহস্রক, লক্ষ প্রভৃতি অবর্গস্থান। ফ্লীট প্রমুখ কেহ কেহ মনে করেন যে, একক, শতক প্রভৃতি স্থানের 'বর্গ' সংজ্ঞা করার কারণ এই যে, তাহাদিগকে বর্গরূপে প্রকাশ করা যায়। যথা,—

একক $= ১^২$, শতক $= ১০^২$, অযুত $= ১০০^২$, ইত্যাদি।

বর্ণমালার বর্গাবর্গ বিভাগ দেখিয়াও আর্য্যভট অঙ্কস্থানের ঐ প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ণমালার আদ্যক্ষর বর্গ, সুতরাং অঙ্কের ও আদ্যস্থানের বর্গ সংজ্ঞা করা উচিত। আর্য্যভট বলিয়াছেন, ঙ্-বোধিত অঙ্ক ও ম্-বোধিত অঙ্ক একত্রে য-বোধিত অঙ্কের সমান। অসম্পৃক্ত য্ ৩ অঙ্ক খ্যাপন করে; সুতরাং অ-যুগলের দশক স্থানে বসিলেই অকারসম্পৃক্ত য্ ৩০ সংখ্যা খ্যাপন করিতে পারে। য্ অবর্গাক্ষর; সুতরাং দশক স্থানেরও অবর্গ সংজ্ঞা হওয়া উচিত। হয়ত এই প্রকার বিচার করিয়াই আর্য্যভট অঙ্কস্থানগুলির বর্গ ও অবর্গরূপে ভেদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, এই প্রকারের বিভাগ-করণের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক যুগলেই একটি বর্গস্থান আর একটি অবর্গস্থান আছে। আর্য্যভট বলেন যে, বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র বর্গ-সংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে অবস্থান করিতে পারিবে এবং অবর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র অবর্গ-সংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে বসিতে পারিবে; কিছুতেই ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। সুতরাং স্বরসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি যদি বর্গীয় হয়, তাহা অর্থাৎ তদ্বোধিত অঙ্ক স্বরনির্দ্দিষ্ট যুগলের বর্গস্থানে বসিবে। আর যদি অবর্গীয় হয়, তবে তাহা ঐ যুগলের অবর্গস্থানে বসিবে। যথা,—'গু'; গ্ বর্গীয় ব্যঞ্জন, তাই উ সম্পৃক্ত হওয়াতে তদ্বোধিত অঙ্ক ৩কে উ-যুগলের বর্গস্থানে অর্থাৎ অযুত অঙ্ক স্থানে বসাইতে হইবে। আর্য্যভট লিখিয়াছেন,—"শূন্যোপলক্ষিত আঠার স্থান।" অর্থাৎ তিনি

কল্পনা করেন যে, আঠার অঙ্কস্থানের প্রত্যেকটাই শূন্য। কোন স্থানে কোন অঙ্ক রাখিলে মাত্র সেই স্থানই পূর্ণ হইল, অপরগুলি তখনও শূন্য থাকিবে। অঙ্কপাত কালে তাহা শূন্যচিহ্ন (০) দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইতে হয়। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'গু' = ৩০,০০০। কিন্তু যদিও য্ = ৩ = গ, 'যু' = ৩০০,০০০। কারণ, য্ অবর্গীয় ব্যঞ্জন। তাই উ বর্ণ তদ্‌খ্যাপিত অঙ্ক ৩কে উ-যুগলের অবর্গ স্থানে, অর্থাৎ লক্ষ স্থানে নিয়া বসাইবে। কোন সংযুক্ত বর্ণ অর্থাৎ দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইয়া যদি একই স্বরবর্ণ-সম্পৃক্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উভয় ব্যঞ্জনই ঐ স্বরনির্দ্দেশিত যুগলে স্থান পাইবে। আর্য্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে সূর্য্যের ভগণ 'খ্যুঘৃ'। ইহাতে ঘ্ খ্যাপিত অঙ্ক (৪ ঋ-যুগলে বসিবে ; ঘ বর্গীয় বর্ণ, ঋ-যুগলের বর্গস্থান নিযুত। সুতরাং ৪কে নিযুত স্থানে রাখিতে হইবে। খ্ (= ২) ও য্ (= ৩) উভয়ে উ-যুগলে যাইবে। খ্ বর্গীয় বর্ণ ; উ-যুগলের বর্গস্থান অযুত ; সুতরাং ২কে অযুত স্থানে বসাইতে হইবে। য্ অবর্গীয় বর্ণ ; উ-যুগলের অবর্গ-স্থান লক্ষ ; সুতরাং ৩কে লক্ষস্থানে রাখিতে হইবে।

এইরূপে পাওয়া যায় – 'খ্যুঘৃ' = ৪,৩২০,০০০। যদি কোন বর্ণ দ্বিস্থানাঙ্ক খ্যাপন করে, যেমন দ্ = ১৮, তবে তাহা স্বস্থানে ও স্বোপরিস্থানে স্থাপয়িতব্য। যথা, আর্য্যভটের মতে পৃথিবীর ব্যাস 'ঞিলা'। এই স্থলে ঞ্ বর্গীয় বর্ণ। সুতরাং তৎখ্যাপিত অঙ্ক ১০ ই-যুগলের বর্গস্থানে রাখিতে হইবে। কিন্তু ১০ দ্বিস্থানাঙ্ক। তাহাকে শতক-স্থানে রাখিতে গেলে ১ উপরিবর্ত্তী সহস্রক-স্থানে গিয়া পড়িবে। ল্ দশক-স্থানে বসিবে।

অতএব 'ঞিলা' = ১০৫০। আর্য্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে চন্দ্রপাতের ভগণ 'বৃফিনচ'।

সুতরাং 'বৃফিনচ' = ২৩২২২৬।

আর্য্যভট প্রণালীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী এই প্রকারের[১]—

ক=১	চ=৬	ট=১১	ত=১৬	প=২১	য=৩০	
খ=২	ছ=৭	ঠ=১২	থ=১৭	ফ=২২	র=৪০	ষ=৮০
গ=৩	জ=৮	ড=১৩	দ=১৮	ব=২৩	ল=৫০	স=৯০
ঘ=৪	ঝ=৯	ঢ=১৪	ধ=১৯	ভ=২৪	ব=৬০	হ=১০০
ঙ=৫	ঞ=১০	ণ=১৫	ন=২০	ম=২৫	শ=৭০	

অ=১	এ=১০
ই=১০০	ঐ=১০
উ=১০০০০	ও=১০
ঋ=১০	ঔ=১০
৯=১০	

এই প্রকারের ব্যাখ্যায়ও কাজ চলে। তাহাতেও আর্য্যভট-প্রদত্ত ভগণাদি ঠিক ঠিক অঙ্কে পাত করা যায়। যথা,—

'খ্যুঘৃ'=(খ+য)×উ+ঘ×ঋ

=(২+৩০)×১০০০০+৪×১০০০০০০

=৪,৩২০,০০০

কিন্তু উদ্ভাবয়িতার অভীপ্সিত তত্ত্ব যে, ঐ প্রকারের নহে, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। আর্য্যভট অঙ্কস্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গ হিসাবে ভাগ করিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন যে, "বর্গাক্ষর বর্গস্থানে ও অবর্গাক্ষর অবর্গস্থানে বসিবেক।" শেষোক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে এই বাক্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। কারণ, তাহাতে বর্ণের ও অঙ্কস্থানের বর্গাবর্গ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

১। অনেক খ্যাতনামা লেখকও আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই ভুল করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে কয়েক জনের নামোল্লেখ করিতেছি:—শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৮৯৬, ১৯১ পৃষ্ঠা। সুধাকর দ্বিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী।' শ্রীগৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা', ২য় সংস্করণ, ১৯১৮।

C. M. Whish, "On the Alphabetic Notation of the Hindus", *Transaction of the Literary Society of Madras*, Part I, 1827, pp. 55 ff. This paper was translated into French by E. Jacquet and published in the *Journal Asiatique*, 1835.

L. Rodet, "Sur la veritable significance de la Notation Numerique inventee par Aryabhata", *Journal Asiatique*, 1880, Part II, pp. 440 ff.

M. Cantor, *Geschichte der Mathematik*, Bd. I, Leipzig, 1907, p, 606.

G. R. Kaye—"Notes on Indian Mathematics—Arithmetical Notation", *Journal Asiat. Soc. Beng*, Vol. III, 1907, p. 478, *Indian Mathematics*, Calcutta, 1915, p. 30; *The Bakhshali Manuscript*, Calcutta, 1927 p. 81,

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, ২০২ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।

এই ব্যাখ্যার আরো একটী দোষ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অকারসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণই সংখ্যাজ্ঞাপন করে। কিন্তু তাহা ভুল। কারণ, অপর কোন স্বরবর্ণের সহিত যোগ করিতে গেলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহা অযাচিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে ; যথা— য+ই='যে' হইবে, 'যি' হইতে পারে না ; গ+ঋ='গৃ' হইতে পারে না, 'গর্' হইবে। ঐ প্রকারে ইষ্ট সংখ্যা লেখা যাইতে পারে না। সেই হেতু বলিতে হইবে যে, ব্যাকরণের নিয়ম অক্ষরসংখ্যার বেলায় খাটিবে না, অথবা মানিতে হইবে যে, কেবল অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনই সংখ্যা খ্যাপন করে। সুতরাং তখন বলিতে হইবে যে, য্=৩০, র্=৪০, ইত্যাদি। এই করিলে আবার অপর বিরোধ উপস্থিত হইবে।

এই সকল কারণ হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত।

বার্ণেল আর এক প্রকার ভুল করিয়াছেন[১]। তিনি বলেন যে, আর্য্যভটের প্রণালীতে অ=১, আ=১০, ই=১০০০, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যভট হ্রস্ব স্বরে ও দীর্ঘ স্বরে কোন প্রকার ভেদ করেন নাই। তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে অকার ও আকার, ইকার ও ঈকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে সমশক্তিক।

আর্য্যভটের শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা

আর্য্যভট যে শ্লোকে আপনার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই,—

"বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙ্মৌ যঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥"

"ক্ হইতে বর্গাক্ষর বর্গ (স্থানে), (য্ হইতে) অবর্গাক্ষর অবর্গ (স্থানে বসিবে, যাহাতে) ঙ্ ও ম্ মিলিয়া য (হইতে পারে)। নয় বর্গ ও নয় অবর্গ (মিলিয়া) শূন্যোপলক্ষিত আঠার স্থানে স্বরবর্ণ (থাকিবে)। পরবর্ত্তী স্থানসমূহেও সেই প্রকার।" আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কত ভ্রান্ত, তাহা আর্য্যভটের মূল শ্লোক দেখিয়া সহজে বোধগম্য হইবে। তাঁহার প্রাচীন টীকাকারগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, তাহা আমরা আরো বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিব।

প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা

'আর্য্যভটীয়' গ্রন্থের একাধিক টীকা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়[২]। কিন্তু তাহার সকলগুলি এখন পাওয়া যায় না। আমরা দুখানি টীকা দেখিয়াছি। একখানি সূর্য্যদেব যজ্বা প্রণীত, নাম 'ভটপ্রকাশিকা'। অপরখানি পরমেশ্বরকৃত, নাম 'ভটদীপিকা'। পরমেশ্বর খৃষ্টীয় ১৪৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১। A. C. Burnell, *Elements of South Indian Palæography*, 2nd edition, London, 1878, p. 62.

২। Vide Bibhutibhusan Datta, "Aryabhata, the author of the *Ganita*", *Bull. Cal. Math. Soc.*, XVIII, 1927, pp. 5--18.

সূর্য্যদেব যজ্বার জীবিতকাল এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তিনি যে পরমেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরমেশ্বর তাঁহার টীকায় স্থানে স্থানে 'ভটপ্রকাশিকা'র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, সূর্য্যদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

য-কার-বোধিত সংখ্যা সম্বন্ধে সূর্য্যদেব বলেন,—"বর্গস্থানাপেক্ষয়া ত্রিংশৎসংখ্যো যকারঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ত্রিসংখ্যঃ। এবং যকারস্য ত্রিত্ববিধানাৎ তদুত্তরেষাং রেফাদীনাং তু চতুরাদিসংখ্যাত্বং সিদ্ধং। তেন রেফঃ চতুঃসংখ্যঃ লকারঃ পঞ্চসংখ্যঃ ইত্যাদ্যবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ "বর্গস্থানাপেক্ষায় য-কার ৩০ সংখ্যা (খ্যাপন করে)। কিন্তু স্বস্থানাপেক্ষায় ৩ সংখ্যা। এইরূপে য্-কার ৩ বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে র্-কারাদিরও ৪ প্রভৃতি সংখ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সেই হেতু র্ = ৪, ল্ = ৫, এই প্রকার বুঝিতে হইবে।" পরমেশ্বরও এই প্রকারই বলিয়াছেন,—"অত্র প্রথমস্থানমঙ্গীকৃত্য ত্রিংশদিত্যুক্তং নতু দ্বিতীয়স্থানমঙ্গীকৃত্য। দ্বিতীয়স্থানে হি ত্রিসংখ্যো যকারঃ। ইত্যুক্তং ভবতি। রেফাদয়ঃ ক্রমেণ দ্বিতীয়স্থানে চতুরাদিসংখ্যাঃ স্যুঃ।"

স্বরবর্ণ বিষয়ে পরমেশ্বর স্পষ্টতই বলিয়াছেন,—"এতদুক্তং ভবতি ককারাদ্যক্ষরগতাঃ স্বরাঃ স্থানপ্রদর্শকা ভবন্তি ন সংখ্যাবিশেষপ্রদর্শকা ইতি" অর্থাৎ "ইহা বলা হয় যে, স্বরবর্ণ ককারাদি অক্ষরের স্থানপ্রদর্শক হয়, সংখ্যাবিশেষপ্রদর্শক হয় না ইতি"। সূর্য্যদেব এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কি করিয়া নয়টি স্বরবর্ণ অষ্টাদশ স্থানকে প্রদর্শন করিতে পারে। অতঃপর আর সংশয় থাকিতে পারে না যে, আর্য্যভটের অক্ষর-প্রণালী বিষয়ে প্রথমোল্লিখিত ব্যাখ্যাই আবিষ্কর্ত্তার অভীপ্সিত ও তাঁহার টীকাকারগণের অনুমোদিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কার্য্যকরী হইলেও প্রকৃত নহে।

ফ্লীটের মতের সমালোচনা

সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ফ্লীটই, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃতার্থ ধরিতে পারিয়াছিলেন[১]। তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য্যভটের মতে স্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি নাই, তাহারা অঙ্কস্থাননির্দ্দেশক মাত্র। কিন্তু তিনি দুএকটা ভুল করিয়াছেন। ফ্লীট আর্য্যভটের শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ বুঝেন নাই। তিনি মনে করেন যে, "নবান্ত্যবর্গে বা" পদে আর্য্যভট হয় ত পরার্দ্ধের পরে এক ঊনবিংশতিতম স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও পর্য্যটক আলবিরুণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের গণনাপদ্ধতিতে 'ভূরি' নামে এক ঊনবিংশতিতম স্থান আছে[২]। ইহা সত্য নহে। সে যাহা হউক, ফ্লীট স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বলেন যে, ঐ স্থান বৃন্দসংখ্যার বর্গতুল্য বলিয়া তাহাকে বর্গস্থান

১। J. F. Fleet, "Aryabhata's system of expressing numbers". *J.R.A.S.*, 1911, pp. 109 ff. অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলী ও পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীও আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃতার্থ করিয়াছেন। ইঁহাদের লেখার উল্লেখ পরে করা যাইবে।

২। *Alberuni's India*, trans. by E. C. Sachau, 2nd ed., London, 1910, vol I, p. 175.

বলা হইয়াছে। এই প্রকারে তিনি ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ করেন যে,—"নয়টি স্বরবর্ণ বর্গ ও অবর্গ দ্বিনবক স্থানে ও নয়ের ঠিক পরবর্ত্তী বর্গস্থানে (ব্যবহৃত হইবে)।" অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলি ফ্লীটের ব্যাখ্যার ভুল প্রদর্শন করিয়াছেন[১]। মাত্র এক স্থানে কি প্রকারে নয়টি স্বরবর্ণ রাখা যায়? আমরা আর্য্যভটের টীকাকারগণের অনুসরণ করিয়া ঐ স্থলের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতেছি। তাঁহারা বলেন যে, পরার্দ্ধ হইতেও বৃহৎ সংখ্যা নির্দ্দেশের সঙ্কেত আর্য্যভট ঐ পদে করিয়াছেন। প্রথম অষ্টাদশ স্থানের ন্যায় দ্বিতীয় অষ্টাদশ স্থানকেও বর্গাবর্গ হিসাবে নয় যুগলে ভাগ করিয়া, অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত করিয়া নয়টি স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে[২]।

ফ্লীটের দ্বিতীয় প্রমাদ এইখানে। তিনি বলেন, "কি ব্যঞ্জনবর্ণ, কি স্বরবর্ণ, একাকী কেহ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। উভয়ে সম্পৃক্ত হইলেই সংখ্যাজ্ঞাপন করিতে পারে।" ইহা সত্য নহে। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের যে সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি আছে, তাহা টীকাকারগণের কথাতেই বোঝা যায়। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন,—যকার, রকারাদি সম্পৃক্তাবস্থায় ৩০, ৪০ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অসম্পৃক্ত অবস্থায় ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। আর্য্যভটের মূল শ্লোকেও ইহার প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"ঙ্মৌ যঃ"। এখানে "ঙমৌ" পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। "ঙ্মৌ" পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অসম্পৃক্ত ঙ-কার দ্বারা আর্য্যভট ৫ সংখ্যা খ্যাপন করিয়াছেন।

ফ্লীট মনে করিতেন যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রভাব আছে। গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা তাহার উল্লেখ পরে করিব।

কে'র মত খণ্ডন

আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা বিষয়ে কে' যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অধুনা তাঁহার আরো দুইটা ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা যাইতেছে। কে বলেন যে,—(১) আর্য্যভট তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-নির্দ্দেশক বাক্যে ছোট সংখ্যাটি বৃহৎ সংখ্যার বামে রাখিতেন; (২) আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে

১। Sarada Kanta Ganguly, "Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers," *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. xvii, pp. 195 ff.

২। সূর্য্যদেব বলেন,—"যথা পুনস্তদধিকপ্রতিপাদ্যসংখ্যা কস্যচিৎ বিবক্ষিতা ভবতি তদা কথং কর্ত্তব্যঃ। তত্রাহ 'নবান্ত্যবর্গে বা' ।...তদ্যথা যস্তকারঃ প্রথমাষ্টাদশ শুদ্ধঃ প্রযুক্তঃ স দ্বিতীয়াষ্টাদশকে প্রথমবর্গাবর্গয়োরনুস্বারাদিযুক্তঃ প্রযোক্তব্যঃ, কং খং, যং, রং ইত্যেবং দ্বিতীয়বর্গাবর্গেষু হকারাদয়োঽপ্যনুস্বারোপযুক্তাঃ প্রযোক্তব্যাঃ, এবং তৃতীয়াষ্টাদশকে অন্যদুপলক্ষণং কর্ত্তব্যং, এবং যাবদিষ্টং যদন্তদন্তদুপলক্ষণং কৃত্বা সংখ্যোপদেষ্টব্যাঃ।"

পরমেশ্বর বলেন,—"যদা পুনস্ততোঽধিকাপি সংখ্যা কেনচিদ্বিবক্ষিতা তদা কথমিত্যত্রাহ 'নবান্ত্যবর্গে বা' ইতি। নবানাং বর্গস্থানানামন্ত্যে ঊর্দ্ধগতে বর্গস্থাননবকে তথা নবানামবর্গস্থানানামন্ত্যে ঊর্দ্ধগতে অবর্গস্থাননবকে চ এতে নব স্বরাঃ প্রযুজ্যন্তে বা। কেনচিদনুস্বারাদিবিশেষেণ সংযুক্তাঃ প্রযোজ্যা ইত্যর্থঃ।"

স্থানীয়-মানতত্ত্বের কোন পরিচিহ্ন নাই[১]। ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথমোল্লিখিত মত বস্তুতপক্ষে অপ্রণিধানতা-জনিত। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে দুইটা সংখ্যা-বাক্যের বিচার তিনি করিয়াছেন, 'খ্যুঘৃ' ও 'চয়গিয়িঙুশুছৢল্ৃ' তাহাদের দুইটাতেই স্বরবর্ণ শ্রেণীর নিম্নতন স্বর ঊর্দ্ধতন স্বরের বামে রহিয়াছে বটে। কিন্তু আর্য্যভটের ব্যবহৃত অপরাপর সংখ্যাবাক্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সর্ব্বত্র ঐ ক্রম অনুসৃত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, 'জুষ্‌খিধ', 'বুফিনচ' ও 'চুঙ্খিঘৃ' প্রভৃতি সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে স্বরসংস্থানক্রম কে'র কথিত ক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার 'খ্রিচ্যুভ' ও 'স্থগুশিথৃন'তে কোন প্রকারের বিশিষ্ট ক্রম নাই। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীমতে সংখ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া স্বরসংস্থান বিষয়ে কোন বিশিষ্ট ক্রমের অনুসরণ করার আবশ্যকও নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্থানীয়-মানতত্ত্বের অবতারণা নাই বলিয়া, কে আর্য্যভট প্রণালীর প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝি সত্য। হিন্দু-দশমিক-প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যায় কোন অঙ্কচিহ্ন স্থান পরিবর্ত্তন করিলেই সংখ্যাটি বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু আর্য্যভটপ্রণালীতে লিখিত সংখ্যাবাক্যে এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরসম্পৃক্ত থাকিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্যের সংখ্যাখ্যাপন-শক্তি অবিকৃত থাকিয়া যায়। যথা—'গকি' ও 'কিগ' একই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু ২৩ ও ৩২ এক নহে। কিন্তু আরো বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধগম্য হইবে যে, আর্য্যভটের সংখ্যা-প্রণালীতেও একপ্রকারের স্থানীয়-মান আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়-মানের মূলতত্ত্বের উপরই তাহা সম্যক্ প্রতিস্থাপিত। কারণ, বিভিন্ন স্বরসম্পৃক্ত হইয়া একই ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন সংখ্যা জ্ঞাপন করে। স্বরগুলি আবার অঙ্কস্থানেরই পরিচায়ক। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বিভিন্ন অঙ্কস্থানে বসিয়া একই অঙ্ক (ব্যঞ্জন-বোধিত) বিভিন্ন সংখ্যা খ্যাপন করে।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী ও হিন্দু-দশমিক-প্রণালী

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ তাহার প্রতি প্রণিধান করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক হিন্দু-দশমিক-প্রণালী হইতে আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়? সমস্ত সভ্যজগতে এখন যে সংখ্যা-প্রণালী অবলম্বিত হয়, তাহা হিন্দু কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। কোন্ হিন্দু ঋষি, কোন্ অতীত যুগে, কোন্ তীর্থস্থানে থাকিয়া এই প্রকারে সংখ্যা লিখিবার অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রণালী প্রথম পরিকল্পনা করেন,

---

১। G. R. Kaye, *Indian Mathematics*, p. 30; *The Bakhshali Manuscript*, p. 81.

কে'র এই দুইটি লেখা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণে প্রচার হইয়াছিল। ফ্লীটের তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ যে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার *Indian Mathematics*এর ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি ফ্লীটের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি যে কেন তিনি তাঁহার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়-মানের ব্যবহার নাই বলিয়া বার্ণেলও ভুল করিয়াছেন ('*South Indian Palæography*' p. 62 fn.)

আরমা তাহার কিছুই জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাহা আর্য্যভটের জন্মের (৪৭৬ সাল) কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে[১]। আর্য্যভট যে তাহার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে[২]। তথাপি তিনি এক উৎকট অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনা করিলেন কেন, তাহা জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। উভয় প্রণালীই স্থানীয়-মানতত্ত্বের উপর সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যামধ্যে তাহার অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে হয়, এবং তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য সময় সময় কোন 'স্বপ্রকাশ' অঙ্কের সঙ্গে 'পরপ্রকাশ' শূন্য চিহ্ন (০) জুড়িয়া দিতে হয়[৩]। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা খ্যাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থানীয়মান নির্ণয় করে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অঙ্কটি কোন্ সংখ্যা খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ-সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয়মান অপরোক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার জন্য অপর কোন চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান দৃঢ় নিবদ্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যা-বাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয়মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই, সংখ্যাবাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করা যায় না। ফলে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক প্রণালী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক প্রণালী মতে ছয়টি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে ৮০০০০০। কিন্তু আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে তাহা মাত্র একটা চিহ্নের দ্বারা লেখা যায়—'ঝৃ'।

আপাত-প্রতীয়মান দোষ

বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর একটা বিশেষ দোষ দেখা যায়। সংস্কৃতভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে আর্য্যভটের গ্রন্থ লেখা। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অক্ষরে ঌ-কারের রূপ এই প্রকার ऌ। ঋ-সম্পৃক্ত ল-কারের রূপও ঠিক ঐ প্রকারের। সুতরাং ऌ রূপ দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, উহা ঌ-কার, না ঋ-কারান্ত ল-কার। এই

১। Bibhutibhusan Datta, "A Note on the Hindu-Arabic Numerals," *American Math. Monthly*, vol. 33, 1926, pp. 220—1; 'Early Literary Evidence of the Zero in India,' *Ibid*, pp, 449—53.

২। Sarada Kanta Ganguly, "The Elder Aryabhata and the modern arithmetical notation," *Amer. Math. Month.* 1927, pp. 409—15.

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয় যে, আর্য্যভট সংখ্যাবিশেষের বর্গমূল ও ঘনমূল নিষ্কাশিত করিবার যে পন্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যায় তাহার প্রয়োগ করা যায় না।

৩। যে সকল অঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা 'স্বপ্রকাশ' অঙ্ক বলিব, যথা ১ হইতে ৯। যেটি নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন সংখ্যা বোঝায় না, কিন্তু অন্য অঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইলে উভয়ে একত্রে সংখ্যা বুঝাইতে পারে, তাহাকে 'পরপ্রকাশ' বলিব।

হেতু সংখ্যাখ্যাপনে কি দোষ হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছি। মনে কর, क्लृज একটা সংখ্যাখ্যাপক বাক্য। উহাকে 'ক৯জ'ও মনে করা যাইতে পারে, অথবা 'ক্লৃজ'ও মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার মনে করিলে ঐ বাক্যবোধিত সংখ্যা হইবে ১০০,০০০,০০৮। আর দ্বিতীয় প্রকার মনে করিলে হইবে ৩১,০০০,০০৮। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতেই আমরা ইহার উদাহরণ দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে এক যুগে চন্দ্রের ভগণসংখ্যা चयगियिङुशुछ्लृ এবং পৃথিবীর ভগণসংখ্যা ङिशिबुण्लृष्खृ। প্রথম বাক্যে लृ চিহ্নকে ঋ-কারান্ত ল-কার বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়টাতে উহাকে ৯-কার মনে করিতে হইবে। বঙ্গীয় বর্ণমালায় ঐ দুই বাক্যকে যথাক্রমে 'চযগিযিশুছ্লৃ' ও 'ঙিশিবুণ৯ষ্খৃ' লিখিতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যদ্বয়-বোধিত সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ও ১৫৮২২৩৭৫০০। ঐ বাক্যদ্বয়ের ভিন্নার্থ করিলে অন্য সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা দৃগ্‌জ্যোতিষের সঙ্গে ঐক্য হয় না বলিয়া পরিত্যাজ্য। উপরিলিখিত প্রকার অর্থই গ্রন্থকারের অভীপ্সিত ছিল। কিন্তু যাঁহারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় জানেন না বা দৃগ্‌জ্যোতিষের খবর রাখেন না, উপরি উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় যে তাঁহাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর "অভিনব" সিদ্ধান্ত

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা বিষয়ে যে দোষের বিচার এখন করা হইল, তাহার উৎপত্তির একমাত্র কারণ, দেবনাগর অক্ষরে ৯-কার ও ঋ-কারান্ত ল-কারের রূপ অভিন্ন বলিয়া। বঙ্গীয় বর্ণমালায় উহাদের রূপ ভিন্ন। সুতরাং সংখ্যাবোধক বাক্যগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত থাকিলে সেই দোষের উৎপত্তি হইতে পারে না। একমাত্র এই কারণ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তিনটি "অভিনব" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে[১],—

১। "আর্য্যভটের সময় বঙ্গীয় বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল।

২। "আর্য্যভট বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

৩। "বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, বাঙ্গালী আর্য্যভটই বীজগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা।"

তাহার খণ্ডন

পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয়ের ঐ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। বরং বিচক্ষণতার অভাবেরই পরিচায়ক। সকল দিক্ বিশেষভাবে তলাইয়া না দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর্য্যভটের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ হইতে এইমাত্র সঙ্কেত পাওয়া যায়[২],—

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্য্যভটস্থিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥"

১। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, 'পৃথিবীর ইতিহাস,' ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয় ঐ বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায়ও এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সন, তারিখ দেওয়া না থাকাতে আমি উহার সন্ধান করিতে পারি নাই; তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই।

২। আর্য্যভটীয়, গণিতপাদ, ১ম শ্লোক।

অর্থাৎ "পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রাধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে প্রণিপাত করিয়া আর্য্যভট এই গ্রন্থে কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন।" ইহাতে মনে হয় যে, আর্য্যভট কুসুমপুরের লোক ছিলেন। তাঁহার টীকাকার পরমেশ্বর স্পষ্টতঃ সেই কথাই বলিয়াছেন,—"কুসুমপুরে কুসুমপুরাখ্যেঽস্মিন্ দেশে।" সুতরাং আর্য্যভট বাঙ্গালী ছিলেন না। সেই পাটলীপুত্রে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল কি না, থাকিলেও তাঁহারা বাংলা অক্ষরে লিখিতেন কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনা জল্পনা করা বৃথা মনে করি। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণের ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়া, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমর্থনের চেষ্টা করা যাইতে পারে,—"আর্য্যভট কুসুমপুর (নগরী) হইতে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞানের আহরণ করিয়া, অন্যত্র বসিয়া তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন।" এই প্রকার ব্যাখ্যাও সঙ্গত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্লোকের ঐ স্থলটি দ্ব্যর্থ-বোধক। যাঁহার যেই প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেই প্রকার অর্থ করিতে পারেন। তথাপিও লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত টিকে না। কারণ, আর্য্যভটের জন্মস্থান ঐ প্রকারে অনিশ্চিত থাকিলেও তিনি যে, বঙ্গীয় বর্ণমালা ব্যবহার করেন নাই, তাহা সত্য। বাঙ্গালা অক্ষরে ঌ-কার ও লৃ-কারের রূপ ভিন্ন হইলেও বর্গীয় বকার ও অন্তস্থ বকারের রূপ অভিন্ন। অথচ অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী মতে তাহাদের বোধিত সংখ্যা ভিন্ন। বাংলা অক্ষরে লিখিত কোন সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে ব-কার থাকিলে, তাহাকে বর্গীয় বকার, কি অন্তস্থ বকার বুঝিতে হইবে, তাহা লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে মতদ্বৈধতা হইতে পারে। আর্য্যভটের গ্রন্থেই এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে, পূর্ব্বে যেই উদাহরণ দ্বারা আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যায় দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহারই একটি এই দোষ-দুষ্ট। যথা, ঙিশিবুণ্লৃষ্খৃ। ইহাকে বাংলা অক্ষরে লিখিলে হইবে 'ঙিশিবুণ্ঌখ্ষৃ'। সুতরাং তদ্বোধিত সংখ্যা ১৫৮২২৩৭৫০০ও হইতে পারে, ১৫৮২৬০৭৫০০ও হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধেয় লাহিড়ী মহাশয় এক দোষ ক্ষালন করিতে গিয়া অন্য দোষাগমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার সিদ্ধান্তের অপর দোষও আছে। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আর্য্যভটের সময়ে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। আর্য্যভটের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান অনিশ্চিত দোষ-দুষ্ট হইলেও তাঁহার জন্মকাল সর্ব্বপ্রকার দোষবিনির্মুক্ত। তিনি বলিয়াছেন,[১]—

ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মতোঽতীতাঃ॥

"(সাতাইশ মন্বন্তর ও) তিন যুগ অতীতের পর আরো ৩৬০০ বর্ষ গত হইলে বর্ত্তমান সময়ে আমার জন্ম হইতে ২৩ বৎসর গিয়াছে।" শককালারম্ভের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভট ৪২১ (=৩৬০০—৩১৭৯) শকে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ পার হইয়া গিয়াছে লিখিয়াছেন।

---

১ আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক।

সুতরাং ৩৯৮ শকে (=৪৭৫ বা ৪৭৬ খৃষ্ট সালে) তাঁহার জন্ম। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সেই কালে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই[১]।

লাহিড়ী মহাশয়ের যুক্তির অপর দুর্ব্বলতা এই,—বাংলা বর্ণমালাতে ৯-কার ও ঋকারান্ত ল-কারের ভিন্ন রূপ আছে বলিয়াই যদি আর্য্যভটকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করা যায়, তবে ভারতবর্ষের অপরাপর যে সকল প্রদেশের বর্ণমালাতে ঐ দুটা অক্ষরের রূপ ভিন্ন, সেই সকল প্রদেশবাসীও সমভাবে তাঁহাকে তদ্দেশবাসী ছিলেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে কোন কোনটাতে ৯-কারের পৃথক্ রূপ ছিল বলিয়া জানা যায়।

এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথৈব ভ্রান্ত। এখানে এ কথারও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আর্য্যভট-প্রণীত জ্যোতিঃশাস্ত্রের দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে, বহুল প্রচার দেখিয়া, কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে, হয় ত আর্য্যভট দাক্ষিণাত্যের কোন নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[২]। তবে সাধারণতঃ তাঁহাকে পাটলীপুত্রবাসী বলিয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে।

আর্য্যভটের দোষক্ষালন

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের সমকালে উত্তর-ভারতবর্ষে তিন প্রকারের বর্ণমালা প্রচলিত ছিল—প্রাচ্য বর্ণমালা, প্রতীচ্য বর্ণমালা ও মধ্যদেশীয় বর্ণমালা। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রদেশকে, আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার বলা হয়, ঐ সকল প্রদেশে সেই কালে প্রাচ্য বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বাংশেও ঐ বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত। বাংলা, আসামী, মৈথিলী ও উড়িয়া বর্ণমালার উৎপত্তি ঐ প্রাচ্য বর্ণমালা হইতে। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে প্রাচ্য বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ঐ সকল দেশে কায়েতী বর্ণমালা প্রচলিত হয়। তখনো দেবনাগরী বর্ণমালার জন্ম হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, আর্য্যভট আপনার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে প্রাচ্য বর্ণমালার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ঐ বর্ণমালাতেই আপনার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমাংশে ঐ বর্ণমালাতে লিখিত 'উষ্ণীষবিজয়ধারিণী' নামে একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি জাপানদেশের হোরুজীর দেবমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ৯-কারের পৃথক্ ও বিশিষ্ট রূপ আছে দৃষ্ট হয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার সময়ে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে কোন দোষ ছিল না। কালের আবর্ত্তনে বর্ণমালার পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়াতে তাহাতে যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আর্য্যভট দায়ী নহেন।

১। বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

Rakhaldas Banerjee. *The Origin of the Bengali Scripts*, Calcutta, 1919.

Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part I, Calcutta, 1926.

২। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৯৯ পৃষ্ঠা।

কটপযাদি প্রণালী

ভারতবর্ষে আরো এক প্রকার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাকে সাধারণতঃ "কটপযাদি প্রণালী" বলা হইত। ঐ প্রণালীতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা-খ্যাপিকা শক্তি নিম্ন প্রকার,—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্					
য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্	ळ्	

প্রত্যেক শ্রেণীর আত্মক্ষরের সমাহার হইতে "কটপযাদি" নামের উৎপত্তি।

স্বরবর্ণের ও সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি, এবং সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিবার ক্রম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লইয়া কটপযাদি প্রণালীতে কয়েকটি অন্তর্ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল দেখা যায়। আমরা তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিতেছি।

প্রথম বিভেদ

কটপযাদি প্রণালীর প্রথম অন্তর্ব্বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণের অঙ্কখ্যাপিকা বা অঙ্কস্থাননির্দ্দেশিকা কোন প্রকারের শক্তি নাই। তাহারা ব্যঞ্জনসম্পৃক্ত হইয়া ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান করিতে পারে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষের স্বনিহিত অঙ্কজ্ঞাপিকা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং গ্, গ, গা, গি, গী, ইত্যাদি সকলে একই অঙ্ক ৩ জ্ঞাপন করে।

২। সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেকটিই স্বনির্দ্দিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে।

৩। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই ক্রমে সজ্জিত আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিও সেই ক্রমে সাজাইতে হয়।

উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, 'কসধগসনমঘচসিয়া,—১৭৯৩৭০৫৪৬৭১, 'ক্লপুভিধু-লটীরদমনৈ'—১৩১৪৯৩১২৮৫০০; 'ঢজহেকুনহেৎসভা'=৪৮৮১০৮৬৭৪, 'প্রগিলিনিথিলিস্ম-কুনিনিধি'—১২৭৭০২৩৭৫১০০৯।

দ্বিতীয় আর্য্যভট

এই প্রণালীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয় আর্য্যভট-প্রণীত 'মহার্য্যসিদ্ধান্তে'। এই গ্রন্থকে সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'ও বলা হয়[১]। এই আর্য্যভটের জন্মস্থান অজ্ঞাত। খৃষ্টীয় ৯৫০ সালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। আর্য্যভট বলেন[২]—

১। ১৯১০ সালে বেনারস হইতে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী 'মহাসিদ্ধান্ত' মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন।

২। 'মহাসিদ্ধান্ত,' মধ্যমাধ্যায়, ২য় শ্লোক।

"রূপাৎ কটপযপূর্বা বর্ণা বর্ণক্রমাদ্ভবন্ত্যঙ্কাঃ।
ঞ-নৌ শূন্যং প্রথমার্থে আ ছেদে ঐ তৃতীয়ার্থে॥"

"ক, ট, প, য হইতে আরম্ভ বর্ণ ক্রমে ১ হইতে (উর্দ্ধতন) অঙ্ক হয়। ঞ ও ন শূন্য। পদবিগ্রহে প্রথমা বিভক্তিতে আ ও তৃতীয়া বিভক্তিতে ঐ (হইবে)।"

বিভক্তির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে বাক্যে 'আঃ' ও 'ঐঃ' প্রত্যয় হয়। তাহাতে সংখ্যাবোধক বাক্যে অনর্থ ঘটিতে পারে। তাই বিসর্গলোপের বিধি করা হইয়াছে। যথা—"ততরামা' 'চরণ' দ্বারা গুণিত হইয়া..."ইত্যাদি প্রকার বাক্য থাকিলে তাহাকে সংস্কৃতে বলিতে হইবে, "ততরামা চরণৈ গুণিতা।" বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিলে সন্ধিবশতঃ ঐ বাক্যটি এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে,—"ততরামাশ্চরণৈর্গুণিতা"। তাহাতে 'শ' ও 'র'এর আগম হইয়া অনর্থ ঘটাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় বিভেদ

কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থায় শূন্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের কোন প্রকার শক্তিই থাকে না।

২। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যাখ্যাপন করিতে পারে, অপরগুলি নিরর্থক।

৩। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্কখ্যাপনশক্তি থাকে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবিশেষের অঙ্কখ্যাপনশক্তি অবিকৃত থাকে। অনুস্বার ও বিসর্গের যে অঙ্কখ্যাপিকা কোন শক্তি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

৪। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে বামাগতি অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই ক্রমে সজ্জিত আছে, তদ্বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিকে তাহার বিপরীত ক্রমে সাজাইতে হয়।

আমরা এই প্রণালীর একটা প্রাচীন উদাহরণ দিতেছি। ষড়্‌গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের 'খগোন্ত্যান্মেষাপ' দিন গত হইবার পর তিনি তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' নামক গ্রন্থরচনা শেষ করেন[১]। এই বাক্যে ন্‌ ও ত্‌ নিরর্থক। খ=২, গ=৩, য= , ম=৫, ষ=৬, ম=৫, প=১। সুতরাং কলির ১,৫৬৫,১৩২ দিন গতে গ্রন্থরচনা শেষ হয়। খৃষ্টীয় সালের হিসাবে ঐ দিন ১১৮৪ সালের ৪ঠা মার্চ্চ। মক্ষিভট্ট লিখিয়াছেন যে, তাঁহার টীকা রচনার সময়ে কলির 'হংসোভব' অব্দ গত হইয়াছিল। 'হংসোভব'=৪৪৭৮। সুতরাং ৪৪৭৮ কল্যব্দে বা ১৩৭৭ খৃষ্টীয় সালে মক্ষিভট্ট জীবিত ছিলেন।

এই প্রণালীর ব্যাখ্যাকালে ফ্লীট[২] বলেন যে, বাক্যের আদিতে অবস্থিত স্বরবর্ণই শূন্য জ্ঞাপন করে। তাঁহার ঐ মন্তব্য ভিত্তিহীন।

সূর্য্যদেব যজ্বা কখন কখন সংখ্যাবোধক বাক্যে অনাবশ্যক অক্ষরও যোগ করিয়া

১। *Indian Antiquary*, xxi, p. 49

২। J. F. Fleet, "The Katapayadi System of Expressing Numbers," *J.R.A.S.* 1911, pp. 788—794.

দিয়াছেন। যথা, ৪৪৯ সংখ্যার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—'ধীভবন' (=০৪৪৯)। এ স্থলে শেষের নকার অনাবশ্যক। সেই প্রকার, 'নৃত্তীজন'=৮৯০।[১]

এই মতের মূল ও তাহার পাঠ-ভেদ

কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের মূল যে কোথায়, তাহা জানা যায় নাই। 'সদ্‌রত্নমালা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়[২],—

"নঞাবচশ্চ শূন্যানি সঙ্খ্যা কটপযাদয়ঃ।
মিশ্রে তূপান্ত্যহল্ সঙ্খ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ॥"

"ন, ঞ ও স্বরবর্ণ শূন্য; ক, ট, প, য আদি করিয়া সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সঙ্খ্যা; অস্বর ব্যঞ্জন চিন্তনীয় নহে।"

১৮২৭ সালে হুইষ[৩] এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই ফ্লীট উহা উদ্ধৃত করেন। তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোকে সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। সেই শ্লোকের তৃতীয় চরণ এই প্রকার,—"মিশ্রে ত্ববান্ত্যহল্ সংখ্যা।" কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য বিকৃত হয় না। ঐ শ্লোকের আরো দু এক প্রকার পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৭ সালে নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ স্বপ্রণীত 'জৈমিনীয় সূত্রে'র টীকায় 'প্রাচ্যকারিকা' নামক গ্রন্থ হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৪]—

"কটপযবর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্ত্যৈরক্ষরৈরঙ্কাঃ।
নঞি চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতম্॥"

তৃতীয় বিভেদ—পালী প্রণালী

এই বিভেদ বিশেষভাবে পালী গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় সকার একটি, সংস্কৃতের মত তিনটি (শ, ষ, স) নহে। সেই হেতু কটপযাদি প্রণালীর য-বর্গ অক্ষরের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যথা,—

য্=১, র্=২, ল্=৩, ব=৪, স্=৫, হ্=৬, ळ=৭

অন্যান্য বিষয়ে এই বিভেদ দ্বিতীয় বিভেদেরই অনুরূপ।

আধুনিক কালে ডাক্তার এল্. ডি. বার্ণেট পালি প্রণালীর খবর প্রচার করেন[৫]। বর্ম্মা দেশ হইতে সংগৃহীত পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থবিশেষের পাণ্ডুলিপি হইতে তিনি কয়েকটি সংখ্যাজ্ঞাপক পদ সংগ্রহ করেন,—

১। 'আর্য্যভটীয়', গণিতপাদ, ১০ম শ্লোক (টীকা)।

২। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে আমি 'সদ্‌রত্নমালা'র এক পাণ্ডুলিপি আনাইয়াছি। তাহাতে এই শ্লোক আছে।

৩। C. M. Whish, loc cit হুইষের প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ করিতে গিয়া জেকে লিখিয়াছেন।—

"নঞো বাচশ্চ শূন্যানি সংখ্যাঃ কটপযাদয়ঃ।
মিশ্রে তু বন্ধ্যা হল্ সংখ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ॥"

এই পাঠে ভুল আছে।

৪। 'জৈমিনীয়সূত্রম্,' পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ-সম্পাদিত, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম শ্লোক [টীকা]।

৫। *JRAS*, 1907, p. 121 f.

অনুপ্লবং = ১১৭০ গন্ধখক্কে = ১২৫৩
গুণগ্ গরং = ২৩৫৩ ভানুবকৃথং = ২৪০৪
রট্ঠকৃথয়ম্ = ১২২২

চতুর্থ বিভেদ—কেরল প্রণালী

ইহাতে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হয়। অপরাপর সকল বিষয়েই ইহা দ্বিতীয় বিভেদেরই অনুরূপ। এই প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী বিশেষভাবে কেরলদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাকে কেরল প্রণালী বলে।

কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল—সূর্য্যদেবের মত

কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল এখনো নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাহার প্রথম বিভেদ খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় আর্য্যভটের মহাসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার 'জৈমিনিসূত্রে' আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ যে কখনকার লেখা, তাহা জানা নাই। সূত্রাকারে লেখা বলিয়া ও সুপ্রাচীন জৈমিনি ঋষির নামে পরিচিত বলিয়া, তাহাকে প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন।[১] টীকাকার নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ যে 'প্রাচ্যকারিকা' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল অজ্ঞাত। তিনি দুই এক স্থলে "বৃদ্ধৈরুক্তা" বলিয়া কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] তাহাতেও কটপযাদি প্রণালী (২য় বিভেদ) মতে অক্ষরসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, 'শিবতাণ্ডব' প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ প্রণালীর ব্যবহার ছিল।[৩] উহাদের সময়ও জানা নাই।

সূর্য্যদেব যজ্বার লেখা দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি কটপযাদি প্রণালী প্রথম আর্য্যভটের সময়ে (৪৯৯) ও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ঐ ধারণার মূল কোথায়, জানি না। আমরা তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি। সূর্য্যদেব লিখিয়াছেন,—

"বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটপাদিত্বং নঞোশ্চ শূন্যত্বমপি প্রসিদ্ধং, তন্নিরাসার্থং কাৎ গ্রহণং। কাৎ প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যা ন টকারাৎ পকারাচ্চ প্রভৃতি। কাৎ প্রভৃত্যেব সর্ব্বাণি সংখ্যা প্রতিপাদয়ন্তি ন তু ঞকারনকারয়োশ্চ শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। অবর্গাক্ষরাণাং তু লোকেঽপি যকারস্যৈবাদিত্বাৎ তদাদিত্বনিয়মস্যাপ্রয়োজনাদ্‌যকারাদিত্বং নোক্তং। কিন্তু তেষামপি লোকপ্রসিদ্ধৈনৈকাদিসংখ্যা প্রাপ্তা তদপবাদার্থমাহ 'ঙ্‌মৌ যঃ'।"

অপরাপর ভারতীয় প্রণালী

ভারতবর্ষে আরো কয়েক প্রকারে বর্ণমালার দ্বারা সংখ্যা জ্ঞাপিত হইত। আমরা এখন সেগুলিরই বিবরণ দিতেছি। তাহাদের কোনটাই বৃহৎ সংখ্যা লিখনের উপযোগী নহে।

১। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ৪৮৪ পৃষ্ঠা। বরাহমিহির ও ভট্টোৎপল 'জৈমিনীয়সূত্রে'র উল্লেখ করেন নাই।

২। 'জৈমিনীয় সূত্র' ১।১।৮; ১।৩।১৪

৩। ঐ, ১।১।৩২

(ক) চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোলটি স্বরবর্ণ সহযোগে এই প্রণালী গঠিত। ক হইতে হ পর্য্যন্ত মোট ৩৩শটি ব্যঞ্জনবর্ণ। তার সঙ্গে ळ অথবা ক্ষ যোগ করিলে চৌত্রিশ হইবে। স্বরবর্ণ— অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও ঔ, অং অঃ। এই প্রণালীতে কি স্বরবর্ণ, কি ব্যঞ্জনবর্ণ, অসম্পৃক্ত অবস্থায় কোন বর্ণই সংখ্যা খ্যাপন করিতে পারে না। কিন্তু উভয়ে সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির আগম হয়। অকার-সম্পৃক্ত হইয়া চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যা খ্যাপন করে। আকার-সম্পৃক্ত হইলে তাহারা ৩৫ হইতে ৬৮ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এই প্রকারে ইকার, ঈকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এই প্রণালীকে সাঙ্কেতিক উপায়ে অতি সহজে লেখা যায়। যদি N চিহ্ন কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে, তবে—

$$N = ৩৪ (x - ১) + y$$

যথায় x ও y চিহ্ন নিম্নলিখিত কোন সংখ্যা হইতে পারে,

$$x = ১, ২, ৩, \ldots ১৬$$

$$y = ১, ২, ৩, \ldots ৩৪$$

প্রকৃতপক্ষে x এবং y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমিক সংখ্যা। উদাহরণ স্বরূপে আমরা বিচার করিব যে, 'দী' কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। ঈকার চতুর্থ স্বর ও দকার অষ্টাদশ ব্যঞ্জন। সুতরাং

$$\text{'দী'} = ৩৪ (৪ - ১) + ১৮ = ১২০$$

(খ) ইহাতেও উপরে কথিত চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোড়শ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্পৃক্ত হইলে তাহাতে ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তির আবির্ভাব হয়। উপরের প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাব মুখ্য, স্বরবর্ণের প্রভাব গৌণ। কিন্তু এই প্রণালীতে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বরবর্ণেরই মুখ্য স্থান। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ষোলটি স্বরবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে; খকার সম্পৃক্ত হইয়া তাহারা ১৭ হইতে ৩২ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। গকার, ঘকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ঐ ষোলটি স্বর এই প্রকারে ক্রমে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বেকার মত সাঙ্কেতিক উপায়ে লিখিলে,

$$N = ১৬ (y - ১) + x$$

যথায় আগের মতনই x এবং y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেরই ক্রমিক সংখ্যা বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা-চিহ্ন 'দী' এই প্রণালী মতে ২৭৬ সংখ্যা বুঝাইবে। কারণ—

$$\text{'দী'} = ১৬ (১৮ - ১) + ৪ = ২৭৬$$

(গ) কখন কখন দেখা যায় যে, ঋ, ৠ, ঌ এবং ৡ সংখ্যার্থে পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং স্বরবর্ণ-সংখ্যা তখন ১২ হইবে। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ঐ বারটি স্বর যথাক্রমে ১ হইতে ১২ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে; খকার সম্পৃক্ত হইয়া ১৩ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করে; ইত্যাদি। সাঙ্কেতিক মতে—

$$N = ১২ (y - ১) + x$$

যথায় $x = ১, ২, ৩, \ldots ১২$

$y = ১, ২, ৩, \ldots ৩৪.$

উপরে যে তিন প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর বর্ণনা করা হইল, তাহারা বিশেষভাবে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিতেই ব্যবহৃত হইত। (ক) প্রণালীর ব্যবহার মালাবার ও তেলেগু প্রদেশের এবং সিংহল, বর্ম্মা ও শ্যাম দেশে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। (খ) প্রণালী সিংহলের পালী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। (গ) প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়—ভিয়েনা সহরের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পালী গ্রন্থবিশেষের পাণ্ডুলিপিতে।[১]

এতদ্ব্যতীত আরো দুইটি সাধারণ রকমের অক্ষরসংখ্যার পরিচয় ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ পাণিনি (প্রায় ৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতক)ও বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা প্রকাশ করিতেন। তিনি শিবসূত্রানুযায়ী নয়টি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের সহযোগে ক্রমানুসারে ১ হইতে ৪২ সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেন দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার মতে অ = ১, ই = ২, উ = ৩, ইত্যাদি। বিয়াল্লিশের ঊর্দ্ধতন সংখ্যা তিনি নির্দ্দেশ করিতে জানিতেন না।[২]

এ দেশে বর্ণমালা সহায়ে জপের সংখ্যা রাখার একটা প্রণালীও ছিল। ইহাতে ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ হইত। মন্ত্রের প্রতিবার জপের শেষে পর পর এক একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া গেলে, ৫০ পর্য্যন্ত জপের সংখ্যা গণনা করা যায়। তৎপর চন্দ্রবিন্দু সম্পৃক্ত করিয়া ঐ বর্ণের দ্বারা ৫১ হইতে ১০০ সংখ্যার হিসাব রাখা যায়। আবার অনুস্বার যোগে অষ্ট অন্তিম বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ব, স, ক্ষ) ১০১ হইতে ১০৮ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এইরূপে বর্ণ সহায়ে ১০৮ বার জপের সংখ্যা রাখা যায়। তদূর্দ্ধ সংখ্যার জন্য ইহার প্রয়োগ হয় না। 'সনৎকুমারসংহিতা' ও তন্ত্রাদিতে এই প্রকারে জপের সংখ্যা রাখার বিধির বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

ভারতবর্ষে জ্যোতিষগণনাদিতে আর একপ্রকার অক্ষরসংখ্যার প্রচলন ছিল দেখা যায়। 'স্বরোদয়' শাস্ত্রে 'জীবস্বর' গণনার নিয়ম আছে,[৩]—

"ষোড়শাক্ষরকোঽবর্গঃ স্যাৎ কাদিবর্গস্তু পঞ্চকাঃ।
চতুর্ব্বর্ণৌ যশৌ বর্গৌ সংখ্যা বর্গেষু কীর্ত্তিতাঃ॥
নাম্নো বর্ণাঃ স্বরগ্রাহ্যা বর্গাণাং বর্ণসংখ্যয়া।
পিণ্ডিতা পঞ্চভির্ভক্তা শেষং জীবস্বরং বিদুঃ॥"

এ স্থলে অ, আ,.. ...অং, অঃ যথাক্রমে ১, ২,...১৫,১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এবং—

১। Bühler, *Indian Palæography*; Burnell, *South Indian Palæography*, বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

২। Goldstücker, *Panini*, p. 53. পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের এক একটি সূত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন। 'বার্ত্তিক'কার কাত্যায়ন (৪০০ খ্রীঃ পূঃ) ও 'মহাভাষ্য'কার পতঞ্জলি (১৫০ খৃঃ পূঃ) বলেন যে, যখন কোন সূত্রবিশেষের অধিকারগত সূত্রের সংখ্যা মোট বর্ণসংখ্যার অধিক হইত, তখন পাণিনি 'প্রাক্' শব্দ ব্যবহার করিয়া অধিকার নির্দ্দেশ করিতেন। অর্থাৎ তখন তাঁহাকে সঙ্কেত ব্যবহার ছাড়িয়া খোলা ভাবেই বলিতে হইত যে, অমুক সূত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রবিশেষের অধিকার চলিবে। ইহাতেই বোঝা যায় যে, পাণিনি ৪২ এর চেয়ে বড় সংখ্যা অক্ষর দ্বারা সূচিত করিতে পারিতেন না। (Goldstücker, loc. cit., pp. 50 ff.)

৩। 'বিশ্বকোষে' ধৃত বচন; 'বর্ণস্বরোদয়' দেখ।

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	

মনে কর, 'রসিকমোহন' এই নামের জীবস্বর বাহির করিতে হইবে। 'রসিকমোহন' =র+স+ই+ক+ম+ও+হ+ন=২×৩+৩+১+৫+১৩+৪+৫=৩৬। উহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং জীবস্বর ১।

গ্রীক প্রণালী

গ্রীস দেশেও এককালে বর্ণমালা দ্বারা সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন ছিল। তখন সেই দেশের সর্ব্বপ্রকার গণনা অক্ষরসংখ্যার দ্বারা করা হইত। গ্রীক প্রণালী হিন্দু প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। গ্রীক ভাষার বর্ণ-সংখ্যা মোট চব্বিশটি। সংখ্যা-প্রণালী গঠনোদ্দেশে গ্রীকেরা আরো তিনটি বর্ণ সংগ্রহ করে। তাহার দুইটি (ϙ ও ϡ) ফিনীশীয় জাতি হইতে ধার করা হয়।[১] অপর একটা (ϛ) নিজের দেশেরই অপ্রচলিত প্রাচীন অক্ষর। ঐ ২৭টি অক্ষরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্রীকগণ তদ্দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত,—

α=১	ι=১০	ρ=১০০
β=২	κ=২০	σ=২০০
γ=৩	λ=৩০	τ=৩০০
δ=৪	μ=৪০	υ=৪০০
ϵ=৫	ν=৫০	ϕ=৫০০
ϛ=৬	ξ=৬০	χ=৬০০
ζ=৭	o=৭০	ψ=৭০০
η=৮	π=৮০	ω=৮০০
θ=৯	ϙ=৯০	ϡ=৯০০

ঐ সকল অক্ষরের সমাহার দ্বারা ১ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করা যায়। হাজার বা ততোধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ ঐ সকল অক্ষরের পশ্চাদ্ভাগে একটা দাগ কাটিয়া দিত। কোন অক্ষরের পশ্চাদ্ভাগ ঐরূপে চিহ্নিত করিয়া দিলে তাহার সংখ্যাজ্ঞাপক শক্তি হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। যথা—

$/\alpha$=১০০০, $/\beta$=২০০১, $/\gamma$=৩০০০, ...

দশ হাজার বা ততোধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ আর একটি উপায় অবলম্বন করে। যে কোন অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে M যুক্ত করিয়া দিলে তাহার শক্তি দশ হাজার গুণ

১। গ্রীকবর্ণমালা সর্ব্বাংশে ফিনীশীয় জাতি হইতে প্রাপ্ত, কিন্তু গ্রীকগণ কালে তাহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে। এই প্রকারে কালক্রমে দুই জাতির বর্ণমালার রূপ ও সংখ্যা ভিন্ন হইয়া যায়।

বৃদ্ধি পাইত। ঐ অক্ষর M এর সম্মুখে, পশ্চাতে বা শীর্ষে যে কোন স্থলে থাকিতে পারিত।

M = 10,000; γM, Mγ, বা $\overset{\prime}{M}$ = ৩০,০০০, ইত্যাদি।

সাধারণ বাক্য হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য গ্রীকগণ সময় সময় সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যের মাথার উপরে একটা দাগ কাটিয়া দিত। যথা—

$\overline{\delta M/\gamma\chi o\eta}$ = ৪৩,৬৭৮

M/ϛορε ‚εωοε = ৬১,৭৫৫,৮৭৫

গ্রীক অক্ষরসংখ্যার প্রথমাবস্থা

প্রাচীন গ্রীকগণ সংখ্যাজ্ঞাপনার্থ বর্ণমালার ব্যবহার যখন প্রথম আরম্ভ করে, তখন তাহারা উপরি উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিত না। ওটা পরবর্ত্তী কালে কল্পিত। আদিতে তাহারা পাণিনির পদ্ধতিই অনুসরণ করিত। গ্রীকবর্ণমালার চব্বিশটি অক্ষর তখন ১ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করিত। দুই বা ততোধিক সংখ্যার সমাহার দ্বারা ও আবশ্যক মত অক্ষরবিশেষের একাধিক বার প্রয়োগ দ্বারা চব্বিশের উর্দ্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইত। কখন কখন গ্রীকগণ উর্দ্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য আর একটা নিয়ম অনুসরণ করিত। বর্ণমালার আদ্যক্ষর αকে ২৪এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করিত। সুতরাং এই মতে αθ = ২৪ + ৯ = ৩৩। এই নিয়ম যে বিশেষ দোষদুষ্ট, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কারণ, αθ যে ১ + ৯ = ১০ নহে, তাহা কে বলিবে? ভারতবর্ষের তৃতীয় (ক) ও (খ) প্রণালীও কতকাংশে এইরূপ হইলেও তাহারা গ্রীক আদিম প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বরবর্ণ সহায়ে হিন্দুগণ অতি সহজে এই দোষ কাটাইতে পারিত। যেমন ভারতবর্ষে, তেমন গ্রীসেও সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সাধারণ কাজে আদিম পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

সেমিটিক প্রণালী

প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায় হিব্রু, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতিগণও বর্ণমালা দ্বারা সংখ্যা খ্যাপন করিত। তাহাদের অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বাংশে গ্রীক প্রণালীরই অনুরূপ। যথা, বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর ১ হইতে যথাক্রমে ৯ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত; পরবর্ত্তী নয় অক্ষর যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত এবং তৎপরবর্ত্তী অক্ষর উহাদের শতগুণ সংখ্যা খ্যাপন করিত। প্রত্যেক জাতির বর্ণমালার রূপ পৃথক্ ছিল মাত্র। তাই আমরা তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না।[১] আরবী বর্ণমালায় অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য হিব্রু অক্ষর হইতে পৃথক্ হইলেও সংখ্যানির্দ্দেশের সময়ে আরবেরা হিব্রু পৌর্ব্বাপর্য্যই অনুসরণ করিত। তাহাতে বোঝা যায়, আরবেরা অক্ষরসংখ্যার প্রথা হিব্রুদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। আল্‌বিরুণীও সেই কথা বলিয়াছেন।[২]

১। আরবী অক্ষরসংখ্যার পরিচয় ও হিব্রু অক্ষরসংখ্যার সহিত তাহার তুলনা জন টেলর কৃত 'লীলাবতী'র অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে।

২। *Alberuni's India*, vol. I, p. 174.

অক্ষরসংখ্যা ও স্থানীয়মান

আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে আছে। কটপযাদি প্রণালীতে ঐ তত্ত্ব হিন্দু-দশমিক-প্রণালীর মতনই প্রত্যক্ষ। অপরাপর হিন্দু প্রণালীতে ঐ তত্ত্বের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। তাহাদের ব্যবহার এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য প্রণালী বলাও যায় না। গ্রীক ও সেমিটিক প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ত্বের কোন প্রকার চিহ্ন নাই। এইটা বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।

অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি

কোন্ জাতি কোন্ কালে যে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রচলন করে, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। গণিতৈতিহাসিকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, সর্ব্বপ্রথমে কোন না কোন সেমিটিক জাতি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ফিনীশীয় জাতি সর্ব্বপ্রথমে বর্ণমালার আবিষ্কার করে। তাহাদের এবং ব্যাবিলন, কাল্ডী ও আসুর প্রভৃতি সেমিটিক জাতি হইতে পরিস্থিত প্রাচীন জাতিগণ শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে। গ্রীক বর্ণমালাও ফিনীশীয় জাতি হইতে পাওয়া। এই সকল কারণ হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, অক্ষরসংখ্যাও কোন সেমিটিক জাতি কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহাদের নিকট হইতে গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা পাইয়া থাকিবে। এই মতের সমর্থনে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে তিনটা ফিনীশীয় অক্ষর রহিয়াছে। ক্যাণ্টর, নেসেলমান প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ গণিতৈতিহাসিকগণ এই অনুমানে বিশ্বাস করেন।[১] অপরে ইহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, ফিনীশীয় বা অপর কোন সুপ্রাচীন সেমিটিক জাতি অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। ইহুদীগণও সেমিটিক বটে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে তাহারা অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত জানা যায়। সুতরাং ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে তাহার প্রচলন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কত পূর্ব্বে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অপর পক্ষে গ্রীকেরা তাহার বহু পূর্ব্বে অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত বলিয়া বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এই কারণে গাউ ও হীদ প্রমুখ গ্রীক গণিতের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গ্রীকগণই সর্ব্বপ্রথমে সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে।[২]

খৃষ্টীয় সালের চারি শত বৎসর পূর্ব্বের হলিকর্ণসাস নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালেখে সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছিল দেখা যায়।[৩] উহাই গ্রীস দেশে

১। Cantor, *Geschichte der Mathematik*, Bd. I, Leipzig, 1907, pp. 121 ff.
Nesselmann, *Die Alegebra der Griechen*, pp. 74 ff.
Robbins and Karpinski, *Nicomachus of Gerasa*, New York, 1926, p. 69.

২। Gow, *Short History of Greek Mathematics*, Cambridge, 1884, pp. 43 ff.
Heath, *History of Greek Mathematics*, vol. I, Oxford, 1921, pp. 32 f.

৩। গাউ বলেন যে, হলিকর্ণসাসে প্রাপ্ত শিলালেখের কাল ১৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের কাছাকাছি। (গাউ, 'গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ৪৭ পৃষ্ঠা।)

অক্ষরসংখ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহারও আগেকার কোন নিদর্শন এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লার্ফিল্ড অনুমান করেন যে, তাহারো বহু পূর্ব্বে, হয়ত খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের শেষভাগে, মিলেটাস প্রদেশে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। কিন্তু কীল বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০—৪২৫ সালের মধ্যে হলিকর্ণসাসেই অক্ষর-সংখ্যার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কীল লার্ফিল্ডের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করেন এবং ঐ বিষয়ে উভয় পণ্ডিতে বাদানুবাদও হয়। গ্রীক সভ্যতার জয়প্রচারক হীদ অবশ্য লার্ফিল্ডের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।[১] ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র বর্ণমালাস্থ অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য সমাবেশের বিচার করিয়াই লার্ফিল্ড প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐ প্রকারের অনুমান করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই প্রকৃত অক্ষরসংখ্যার অস্তিত্বের অপর কোন প্রকার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। গাউ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে আলেকজান্দ্রিয়াতেই যে অক্ষরসংখ্যার সৃষ্টি হয়, ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মনে করেন যে, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার যতগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেই একযোগে এই পক্ষ সমর্থন করে।[২] যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার উৎপত্তিকাল এখনো নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারে প্রাচীন হিন্দুগণেরও যে দাবী থাকিতে পারে, এ কথা এ পর্য্যন্ত কাহারো মনে পড়ে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, পাণিনি অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিতেন। পাণিনির কাল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ মতভেদ আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকারের মতে পাণিনি খৃষ্টের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। অপরে তাঁহাকে দুই এক শত বৎসরের পরের লোক মনে করেন। পাণিনি ব্যাকরণে যখন অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রথম আবিষ্কার আরো পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অক্ষরসংখ্যা ব্যবহারের প্রকৃত নিদর্শন ভারতবর্ষে গ্রীসেরও পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কার হিন্দুরাই প্রথম করিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, ঐ বিষয়ে হিন্দুর দাবী কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা

কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৮৯২ সালে স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এই মত প্রথম প্রকাশ করেন[৩]। ১৯০৭ সালে কে[৪] ও ১৯১১ সালে ফ্লীট[৫] ঐ মতের পুনরুল্লেখ করেন। অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত ইঁহাদের মতের সমালোচনা

১। হীদ-প্রণীত 'গ্রীকগণিতের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। গ্রীক অক্ষরসংখ্যার বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে আমরা হীদ ও গাউএর গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

· হলিকর্ণসাস ও মিলেটাস গ্রীক অধিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের দুইটি সমীপবর্ত্তী প্রাচীন নগরী।

২। গাউ, 'গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। সুধাকর দ্বিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী', ৫ পৃষ্ঠা।

৪। G. R. Kaye, *J.A.S.B*, III (1907), p. 478

৫। J. F. Fleet, loc. cit, p. 125.

ও খণ্ডন করিয়াছেন।[১] দ্বিবেদী ও কে তাঁহাদের ঐ প্রকার মতের সমর্থনে কোন যুক্তি দেন নাই। ফ্লীট বলেন যে, "আর্য্যভটীয়ে নিহিত জ্যোতিস্তত্ত্বের অধিকাংশ ভাগই গ্রীকদের নিকট হইতে পাওয়া বলিয়া যখন দেখিতে পাই, তখন তাঁহার গণনা-প্রণালীও সেই উপায়ে পাওয়ার সম্ভাবনা স্বতঃই মনে আসে।" আর্য্যভট তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্বের জন্ম গ্রীকদের নিকট ঋণী কি না, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ঐ বিষয়ের গভীর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, আর্য্যভটের জ্যোতিষে গ্রীক জ্যোতিষের কোন প্রভাব নাই[২]। সে যাহা হউক, একমাত্র ঐ কারণেই আর্য্যভট অক্ষরসংখ্যা গ্রীকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন মনে করা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর্য্যভটের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বৈয়াকরণ পাণিনি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর্য্যভট তাঁহার নিকট হইতেই সেই সঙ্কেত পাইয়া থাকিবেন। ঐ প্রকার মনে করিবার আরো বিশেষ কারণ এই যে, বর্ণমালা বিষয়ে আর্য্যভট সর্ব্বাংশে পাণিনিরই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য উভয়েই মূলে 'শিবসূত্রে'র নিকট ঋণী। তারপর আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর তত্ত্ব গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীকেরা স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। আর্য্যভটপ্রণালী ঐ তত্ত্ব অবলম্বনেই বিবৃত। গ্রীকেরা যেমন বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর দ্বারা ১ হইতে ৯ সংখ্যা, তৎপরের নয় অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা, এবং পরের নয় অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে উহাদের শতগুণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন, আর্য্যভট সেই প্রকার করেন নাই। ইহা বুঝিতে পারিয়া ফ্লীট স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও হিন্দু প্রণালীর সাদৃশ্য ঐ স্থলে নহে, অন্যত্র। তিনি বলেন যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যায় যেমন—

$\beta, \gamma, \delta =$ ২, ৩, ৪

এবং $\beta M, \gamma M, \delta M =$ ২ × ১০০০০, ৩ × ১০০০০, ৪ × ১০০০০

সেইরূপ আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতেও—

খ্, গ্, ঘ্ = ২, ৩, ৪

এবং খু, গু, ঘু = খ্‌উ, গ্‌উ, ঘ্‌উ = ২ × ১০০০০, ৩ × ১০০০০, ৪ × ১০০০০

উভয় প্রণালীতে এই সাদৃশ্য আছে মনে করিয়া ফ্লীট কল্পনা করেন যে, আর্য্যভট তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী হইতে কোন কোন সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এই যুক্তির অসারতা সহজে প্রতিপাদন করা যায়। প্রথমতঃ, আর্য্যভটের প্রণালীতে স্বরবর্ণের কোন প্রকার সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি ছিল না। তাহারা অঙ্কস্থান নির্দ্দেশ করিত মাত্র—ফ্লীট নিজেও যে এ কথা জানিতেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত সাদৃশ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি আছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গ্রীকপ্রভাব প্রদর্শনের পূর্ব্বকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ফ্লীট

১। Sarada Kanta Ganguli, loc. cit.

২। Prabodh Chandra Sen Gupta, *Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy* (reprinted from the Journal of the Department of Letters, Calcutta University, 1928).

অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সাদৃশ্য প্রকৃত নহে, একমাত্র বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিলে কতকটা সাদৃশ্য আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু বর্গীয় ও অবর্গীয় উভয় প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেখিলে ঐ সাদৃশ্য দূরীভূত হয়। যথা,—

খ্, য্, ঘ্ = ২,৩, ৪

কিন্তু খু. যু, ঘু = ২০০০০, ৩০০০০০, ৪০০০০।

এই সকল কারণে আমরা ফ্লীটের মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যাভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় কোন প্রকারের বিদেশী প্রভাব ছিল না।

অক্ষর-সংখ্যার প্রসার—গ্রীসে

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গ্রীক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, কি সপ্তম শতকে গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার হইলেও তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের আদিতে হলিকর্ণসাস নামক স্থানে। তৎপরবর্ত্তী নিদর্শন ঐ শতকের মধ্য সময়ের। তাহার কোন কোনটা হলিকর্ণসাসে, একটা এথেন্সের। কিন্তু সাধারণের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার প্রচার হইতে কয়েক শ' বছর লাগিয়াছিল। রাজকীয় তরফ হইতে উহার ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় টলেমির (ফিলাডেল্ফাস) নামাঙ্কিত মুদ্রায়। ইনি ২৬৬ খৃষ্টপূর্ব্ব সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় রাজত্ব করিতেন। এথেন্স নগরীতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকেও লোকে প্রাচীন এট্টিক প্রণালী মতে সংখ্যা লিখিত দেখা যায়। ঐ শতকের মধ্যভাগে তথাকার রাজা অগষ্টাস সর্ব্বপ্রথমে অক্ষর-সংখ্যার প্রচলন আরম্ভ করেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক উহা স্বীকার করিয়া লইতে এক শ বছর লাগিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে এট্টিক প্রণালীর ব্যবহার এথেন্সের জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। গ্রীসের বোয়েসিয়া প্রদেশে ২০০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালে উভয় প্রণালীই সমভাবে ব্যবহৃত হইত দেখা যায়। এতৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সকলে আদিম প্রণালীর পরিত্যাগ সহজে করে নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের গোড়ায় বিশেষভাবে হস্তলিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আদিম প্রণালীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ প্রথম প্রথম পাটীগণিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন না বোধ হয়। কিন্তু পরে গণিতেও তাহার ব্যবহার হইত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইয়ুটোসিয়াস নামক জনৈক বিখ্যাত টীকাকার যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ প্রভৃতি সকল পরিকর্ম্মই অক্ষর-সংখ্যার সহায়ে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে

ভারতবর্ষে বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালেরও আগে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পরে অপর কেহ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। অপর পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি লিখিয়াছেন যে, ঐ প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রণালী পাণিনিরই বৈশিষ্ট্য। অতঃপর অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ দেখা

যায় প্রথম আর্য্যভটের গ্রন্থে,—৪৯৯ সালে। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ সাল) যে সকল শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে সংখ্যা-বাক্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন পরবর্ত্তী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। এমন কি, লল্ল, ভাস্কর (আদি) প্রভৃতি আর্য্যভটের শিষ্যমণ্ডলীও তাহা গ্রহণ করেন নাই। টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ত কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রকার কটপযাদি প্রণালীর প্রথম বিভেদের ব্যবহারও 'মহাসিদ্ধান্ত' ছাড়া অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ১৬৩৫ সালে মুনীশ্বর 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র স্বকৃত 'মরীচি' নামক টীকায় দ্বিতীয় আর্য্যভটের মূল শ্লোক ও তাঁহার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু উহার ব্যবহার কুত্রাপি করেন নাই। ঐ প্রণালীর অপরাপর বিভেদের ব্যবহার অল্পবহুল অন্যত্র দৃষ্ট হয়। মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও দক্ষিণ-তামিল প্রদেশে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণও অর্ব্বাচীন কালের। আরো একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে হস্তলিখিত গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার বহুল প্রচার থাকিলেও তাহাদের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের[১]। জ্যোতিষ-গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আরো একটা বিশেষ কথা এই যে, হিন্দুর পাটীগণিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার কখনো হয় নাই। কোন আর্য্যভটই তাঁহাদের গ্রন্থের পাটীগণিত ভাগে অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ করেন নাই; জ্যোতিষ-ভাগে করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে অনুমিত হয় যে, সংখ্যাজ্ঞাপনের সরল ও সহজ অপর কোন পদ্ধতি তাঁহাদের জানা ছিল। গ্রীসদেশে অক্ষর-সংখ্যার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে নব নব প্রণালীর আবিষ্কার হইলেও কোন প্রণালীই বেশী কাল প্রচলিত ছিল না। কোন কোনটা ত আবিষ্কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র কটপযাদি দ্বিতীয় বিভেদের প্রচলন কিছুকাল ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতক হইতে পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ সংখ্যায় অতি অল্প। ইহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার সংখ্যা নির্দ্দেশের সহজ ও সুদৃঢ় প্রণালীর অভাব হেতু হয় নাই, অন্য কারণে হইয়াছিল[২]।

প্রাচীন লেখাদিতে কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

'রাঘবায়' = ১৪৪২ (এপিঃ ইণ্ডিঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)।
'তত্ত্বালোক' = ১৩৪৬ (ঐ, ৩।৪০)
'শক্ত্যালোক' = ১১১৫ (ঐ, ৩।২২৯)

১। সঙ্কুচিততম উপায়ে সংখ্যা নির্দ্দেশ ঐ সকল প্রণালী মতে হইতে পারে। উহাতে একাক্ষর দ্বারা বৃহৎ সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু আর্য্যভট-প্রণালী বা কটপযাদি-প্রণালী মতে সেই সকল সংখ্যা দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইত। অবশ্য এই দুইটির অন্য অনেক উপযোগিতা আছে, যাহা ঐ সকল প্রণালীতে নাই।

২। পরে দ্রষ্টব্য।

'ভবতি' =৬৪৪ (ইণ্ডিঃ এণ্টিঃ, ২।৩৬০)
'রাকালোক' =১৩১২ (ঐ ২।৩৬১)
'বিশতি' =৬৫৪ (ঐ, ঐ)

এ সকল খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতকের প্রমাণ। তাহারও আগেকার কোন শিলালেখে বা তাম্রলেখে এই পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সংখ্যাপ্রণালী বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত

অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি, তাহার ক্রমবিবর্ত্তন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহার ক্রম-বিস্তার সম্বন্ধে আমরা, গ্রীসে ও ভারতবর্ষে, যে সকল বিষয় উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, অপর যে কোন সংখ্যাপ্রণালী সম্পর্কেও তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষে শব্দসংখ্যা-প্রণালী সম্পর্কে তাহা বস্তুতই ঘটিয়াছিল[১]। শব্দসংখ্যার প্রকৃত উৎপত্তি বৈদিক কালে হইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে তাহাতে স্থানীয়-মানের অবতারণা হয় নাই। তখনও লোকসমাজে তাহার প্রচলন খুবই কম ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বিশেষতঃ জ্যোতিষ-গ্রন্থাদিতে তাহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এবং পরবর্ত্তী কালেও তাহা সমভাবে চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন শিলালেখে তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। এই সকল বিষয়ে গভীর বিচার করিয়া আমরা সংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে দুইটি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। প্রথমতঃ কোন দেশের অংশবিশেষে কোন কালে কোন বিশিষ্ট প্রকার সংখ্যালিখন-প্রণালীর প্রয়োগ দেখিয়া, সেই দেশের সর্ব্বাংশে সেই কালে সেই প্রকার সংখ্যা-প্রণালী ব্যবহার হইত মনে করা ভুল। দ্বিতীয়তঃ শিলালেখ ও তাম্রলেখ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশিষ্ট সংখ্যাপ্রণালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্ত্তনপ্রথা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। গাউ সত্যই বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের জন্য প্রচারিত লেখগুলিতে বিদ্বজ্জনবোধ্য কোন নবাবিষ্কৃত সংখ্যাপ্রণালীর প্রথম ব্যবহার কিছুতেই হইতে পারে না।[২] দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায় যে, গ্রীস দেশে ≠ (৯০০) চিহ্নের প্রয়োগ খৃষ্টীয় ১৩শ, কি ১৪শ শতকের আগেকার লেখে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে আমরা আরো একটা তত্ত্ব লক্ষ্য করি। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাপ্রণালীর প্রয়োগ হইত। এমন কি, একই পুস্তকের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারও দেখা যায়। অবশ্য অঙ্কের রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি বিচার করিতে গেলে প্রাচীন লেখ প্রভৃতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দেশের বিভিন্ন অংশে একই কালে অঙ্কের রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আলবিরুণী লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের

১। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, 'শব্দসংখ্যালিখন-প্রণালী', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

২। গাউ, 'গ্রীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ৪৬ পৃষ্ঠা।

বর্ণমালা যেমন পৃথক্, অঙ্কের রূপও তেমন পৃথক্।[১] সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, হিন্দু-দশমিক-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও প্রসারের বিচার করিতে গিয়া যাঁহারা একমাত্র প্রাচীন লেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিছুতেই প্রকৃত তথ্য ধরিতে পারিবেন না। ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অর্থযুক্ত সংখ্যাবাক্য

আমরা এই পর্য্যন্ত যেই সকল সংখ্যাবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, কি ভারতীয়, কি গ্রীক, ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, তাহারা অর্থহীন। কিন্তু সময় সময় দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে অর্থযুক্ত ও নীতিপূর্ণ বাক্যও সংখ্যা-খ্যাপনার্থ প্রযুক্ত হইত। এই প্রকারে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চলা কম কৃতিত্বের কথা নহে। মক্কিভট্টের গ্রন্থ (১৩৭৭ সাল) হইতে আমরা ঐ প্রকারের কতগুলি উদাহরণ দিতেছি[২],—

'জ্ঞানেন শ্রীলাভ' = ৪৩২০০০

জ্ঞানিনো বিত্তদা = ৮৬৪০০০

জ্ঞানী নীতিধারক = ১২৯৬০০০

জ্ঞানী নির্জ্জরৈ সেব্য = ১৭২৮০০০

অন্নজ্ঞো ভাবুক = ১৪৪০০০

জ্ঞানী মুনং ভীষ্মক = ১৫৪০০০০

জ্ঞানী মুনং শ্রীধর্ম্মরাড্ = ২৫৯২০০০০

জ্ঞানী মুনং শিবস্তর্কধীসামর্থ্যমান্য = ১৫৮২২৩৬৪৫০০০

দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী সহরে অরুতলপেরুমল দেবমন্দিরে প্রাপ্ত একখানি খোদিত লিপিতে আছে যে, কেরলরাজ সংগ্রামধীর রবিবর্ম্মা 'দেহব্যাপ্য' অর্থাৎ ১১৮৮ শকে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন[৩]। 'জৈমিনীয় সূত্রে'ও এই প্রকারের বহু বাক্য আছে। যথা 'দার' = ২৮; 'ভাগ্য' = ১৪, 'শূল' = ৩৫; 'কাম' = ৫১; 'শান্ত' = ৬৫; ইত্যাদি। সূর্য্যদেব যজ্বার প্রযুক্ত কোন কোন সংখ্যাবাক্যেও এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।[৪] যথা—'শরীর' = ২২৫, 'পুত্রবল' = ৩৩২১, 'শূরক্ষমীশঙ্কর' = ২১৫৫৬২৫, 'মিত্রকুলধাবকলোক' = ১৩১৪৮৩১২৫, ইত্যাদি।

গিমাত্রিয়

ইহুদীগণের মধ্যে অক্ষরসংখ্যার আর এক প্রকার ব্যবহার হইত। তাহাকে 'গিমাত্রিয়' বলে। কোন বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার যোগ করিলে, ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইত, তাহাকে ঐ বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হইত। লোকে রহস্য গোপন বা যাদুর জন্য ইহার বিশেষ ব্যবহার করিত। বাইবেলে প্রত্যেক উপাসনার পর 'আমেন' (amen) উচ্চারণ করার বিধি আছে।[৫] উহাকে

১। *Alberuni's India* I, p. 174.

২। শ্রীপতির 'সিদ্ধান্তশেখরে'র উপর মক্কিভট্টের টীকা। ১ম অধ্যায়, ১৬-৪০ শ্লোক।

৩। *Epigraphia Indica*, vii. Appendix, p. 939.

৪। ভটপ্রকাশিকা, ২।১০,৩২

গ্রীক্ অক্ষরে লিখিয়া তাহার সংখ্যা গণনা করিলে ৯৯ হয় ($a\mu\eta\nu$ = ১ + ৪০ + ৮ + ৫০ = ৯৯)। তাই কোন কোন খৃষ্টীয় পাণ্ডুলিপিতে 'আমেনে'র পরিবর্ত্তে ৯৯ লেখা থাকিত দেখা যায়। কোন একটা সংখ্যা দেখিয়া তদ্বোধিত বাক্যের রহস্যোদ্ঘাটন করা সহজ নয়। কখন কখন তাহা অসম্ভব হইত। আবার উহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদও হইত। বাইবেলের এক স্থলে আছে, "এখানেই বুদ্ধি। যাহার বোধশক্তি আছে, সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কারণ, উহা লোকবিশেষের সংখ্যার সমান, এবং তাহার সংখ্যা ছয় শত তিন কুড়ি আর ছয়।"[১] এ স্থলে ৬৬৬ সংখ্যার দ্বারা যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিবার জন্য দু হাজার বছর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিভিন্ন লোকে উহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছে।[২] দুইটা বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তির সংখ্যা গণনা করিলে যদি একই ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ দুইটা বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তি সমান বলিয়া ধরা হইত এবং তাহাদের একটার পরিবর্ত্তে অপরটা ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল স্থলে আপাতপ্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করিলে যে প্রমাদ ঘটিবে, তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আল্‌-বেরুণী তাঁহার 'অথার-উল-বাকির' নামক গ্রন্থে এই প্রকারের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] তাহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রকারের রহস্যপূর্ণ লিখনপ্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল।

গণনাবর্ত্তলিপি

হিন্দুদিগের মধ্যে 'গিমাত্রিয়' প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। কখন কখন মনে হয় যে, উহার কিছু না কিছু থাকিবার সম্ভাবনা। 'ললিতবিস্তরে'[৪] যে চৌষট্টি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, তাহার একটার নাম 'গণনাবর্ত্তলিপি'। গণনার ভিতর দিয়া আবর্ত্তন করিয়া যাহার অর্থসঙ্গতি করিতে হয়, তাহাই গণনাবর্ত্তলিপিতে লেখা বাক্য।

অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা

অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা কি? উহা নিশ্চয়ই সংখ্যা লিখিবার জন্য হিন্দু দশমিক প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্বল্পতমসংখ্যক চিহ্ন দ্বারা যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশের এমন সহজ ও সুন্দর উপায় আর নাই। আর্য্যভট বা অপর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি যখন তাঁহাদের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখনও দশমিক প্রণালী ও স্থানীয়মান-তত্ত্ব হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল। তবুও কেন তাঁহারা এই অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই জাগে। মনে হয় যে, কোন বিশেষ উপযোগী কারণবশতঃই নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শব্দসংখ্যার উপযোগিতা বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়া-

---

১। *Revelation* xiii. 18

২। See D. E. Smith, *History of Mathematics*, II, p. 54.

৩। এই গ্রন্থের আরবী মূল (Edward Sachau, *Chronologie Orientalischer Volker von Alberuni*, Leipzig, 1878) and ইংরাজী ভাষান্তর (C. Edward Sachau, *The Chronology of Ancient Nations*, London, 1879) দুইই ছাপা হইয়াছে। ভাষান্তরের ১৮ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

৪। ললিতবিস্তর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত, ১০ম অধ্যায়।

ছিলাম,[১] অক্ষর-সংখ্যার পক্ষেও তাহা খাটে। প্রথমতঃ অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এ বিষয়ে আর্য্যভটপ্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। গাউ[২] মনে করেন, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার সৃষ্টিরও উহাই একমাত্র কারণ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতকের তৃতীয় ভাগে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রীকগণের মধ্যে সঙ্কুচিত ভাবে সংখ্যালিখনের উপায় উদ্ভাবনের একটা বিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ঐ সময়েই আর্কিমিডিস ও এপোলোনিয়স তাঁহাদের অভিনব সংখ্যালিখন-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আরো একটা উপযোগিতা ছিল। একই সংখ্যাকে ইচ্ছামত বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করিতে পারিলে ছন্দোবন্ধন খুবই সুন্দর হয়। এই বিষয়ে কটপযাদি প্রণালী যে আর্য্যভট-প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রহস্য ও সাঙ্কেতিক লেখার জন্যও অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ হইত দেখা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮—৯ পৃষ্ঠা।

২। Gow, *Short History of Greek Mathematics*, pp. 48, 60 ff.

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল*

ভারতের কথা-সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও প্রাচীন। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্দু ও জৈন পুরাণগুলি এইরূপ উপাখ্যানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যান প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে গ্রামবৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এই উদয়নের গল্প আলোচনায় মুগ্ধ ও ব্যস্ত থাকিতেন। তারপর প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মাণিকচন্দ্র রাজার গানগুলি এক সময় সমস্ত ভারতের জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কথা-সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও নানা দেবদেবী পূজার মধ্য দিয়া এই কথাসাহিত্য মধ্যযুগে একসঙ্গে বাঙ্গালীর তৃপ্তি-সাধন ও ধর্ম্মোন্নতি-বিধান করিত। বেহুলা, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির মনোহর উপাখ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনতা ও বিস্তার

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানেরই আলোচনা করিব। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাখ্যান নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবল ভাষার প্রমাণে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। একাধিক বাঙ্গালা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগেও সংস্কৃতকাব্য রচিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ দুর্লভ নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজের অধ্যাপক ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ মহাশয় বেহুলা লখিন্দরের উপাখ্যান লইয়া এক চম্পূকাব্য রচনা করেন। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানকে নাটকাকারে পরিণত করেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগেও যে এইরূপ হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ২।৩ স্থলে সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে—সেই সকলগুলির রচয়িতা বা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে[১]। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগৃহীত (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দরের এক খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দর

---

* ১৩৩৬, ৯ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। History of Bengali Language and Literature—পৃ: ৬৫৪; তবে বোম্বাই Venkateswar Steam Machine Press হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংস্করণে এই উপাখ্যানটী পাওয়া যায় না।

কর্ত্তৃক বিদ্যার অনুরোধ, উপভোগ ও সুন্দরের দণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাত্র ৫৪টী শ্লোক আছে। এইটী স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) রামদাস সেন লিখিত বররুচির সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহিত বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বররুচিকৃত গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে পুথির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল[১]। ইহার কতকগুলি শ্লোক কাব্যসংগ্রহে প্রকাশিত বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া, অন্য কোন কোনও ভাষায়ও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানমূলক নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন,—'বহু প্রাচীন ফার্সীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি। উহা ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল[২]।' ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর উর্দ্দুতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীনাথ নামে এক কবি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মৈথিল ভাষায় 'বিদ্যাবিলাপ' নামে এক নাটক লেখেন[৩]। নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা ঠিক সেই ধরণে লেখা নহে। তবে ইহাতে অঙ্কভাগ আছে। এক একজন পাত্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচয় ও বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন—এই ধরণে পুস্তকখানি লেখা। ইহার মধ্যে দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম—ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের গৃহে যাতায়াতের সুড়ঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ—গ্রন্থের প্রারম্ভে পূজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চণ্ডিকা প্রবেশ করিতেছেন এবং স্পষ্টই বলিতেছেন,—

পরকট ভয় হমে পুরাওব কামে।
পূজাবলি লেব মোয় জায় ওহি থানে ॥—(পৃঃ ৪)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোটাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সুন্দর যখন বীরসিংহের সমীপে নীত হইল, তখন সে কালিকার স্তুতি আরম্ভ না করিয়া নারায়ণের নিকট এই প্রার্থনা করিল :—

১। The Long-lost Sanskrit Vidyasundara—Proceedings of the Second Oriental Conference—পৃঃ - ২১৫ – ২২০।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৫ম সংস্করণ—পৃঃ ৪৭৭।

৩। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থমালা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিলাপকে বাঙ্গালা বলিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহার মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে একমাত্র রামচরিতখানি বাঙ্গালা।

লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তকপৃষ্ঠচারিন্
দেবারিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিশ্ববন্দ্য।
মামন্থ পাহি শরণাগতদীনবন্ধো
দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ ॥—(পৃঃ ৩০)

একাধিক বঙ্গীয় কবি এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলগুলিই যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং জনসাধারণের সুপরিচিত বা সমাদৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া এই উপাখ্যান কালক্রমে কোন অংশে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহা কিরূপ—এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য এই কাব্যসমূহের সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রকার অনুসরণ করিবার জন্যও এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বাঙ্গালায় যতগুলি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ভারতচন্দ্রের পুস্তক। কিছু দিন পূর্ব্বেও এই গ্রন্থ সাদরে পঠিত হইত। অনেক স্থল গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে নানা কবি এই উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল কবির রচিত বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

(১) **কঙ্ক**—চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী। ইনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন[১]।

(২) **গোবিন্দদাস**—ইনি চট্টগ্রামের লোক। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার কালিকা-মঙ্গল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রহিয়াছে[২]।

(৩) **কৃষ্ণরামদাস**—[৩] নিমতাগ্রামবাসী কৃষ্ণরামদাস ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যা-সুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (সাহিত্য ১৩০০)

(৪) **মধুসূদন কবীন্দ্র**[৩]—(৫) **ক্ষেমানন্দ**[৩]—এই দুই জনের রচিত গ্রন্থের সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

(৬) **বলরাম কবিশেখর**—ইঁহার কাব্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ আলোচিত হইবে। ইঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় জানা না গেলেও ইঁহার ভাষা ও রচনা দৃষ্টে ইঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

(৭) **রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন**-সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের রচয়িতা, বিখ্যাত কালীভক্ত রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন[৪]।

(৮) **ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর**—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৯। ২। ঐ ঐ।

৩। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত—*History of Bengali Language and Literature*—পৃঃ ৬৫৬।

৪। প্রাচীন কবি-গ্রন্থাবলী—বসুমতী কার্য্যালয়।

বঙ্গের বৃদ্ধসম্প্রদায়ে আজ পর্য্যন্ত সুপরিচিত ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন। তাহারই মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে[১]।

(৯) **প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী**—ইনি ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কৃষ্ণরামদাস, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে[২]।

(১০) **বিশ্বেশ্বর দাস**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীতে আছে।

(১১) **গোপাল উড়ে**—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কালক্রমে যাত্রার আকার ধারণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে গোপাল উড়ের পুস্তকই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে[৩]।

কবিশেখরের সময় ও পরিচয়

গ্রন্থের মধ্যে ভণিতায় শ্রীকবিশেখর (৬২খ, ৬১ক, ৫৭খ, ৫১খ, ১৮ক, ১৯ক), অথবা দ্বিজ বলরাম (৬১খ, ৫৩খ, ৪৩খ, ৩৪ক, ৩২ক, ৩৬ক, ইত্যাদি) এই নাম পাওয়া যায়। এক স্থলে বলরাম চক্রবর্ত্তী, এই পূর্ণ নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

বলরাম চক্রবর্ত্তি মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন।—(২ক)

সুতরাং ইঁহার পূর্ণ নাম বলরাম চক্রবর্ত্তী এবং উপাধি কবিশেখর ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ইঁহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পুরিল যার আস॥—(৫২ক)

এই সামান্য পরিচয় হইতে ইঁহার কালনির্ণয় করিবার কোনও সুবিধা হয় না। কবিশেখর উপাধিটী অপরিচিত নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-সাহিত্যে এই উপাধি-ধারী আরও কয়েকজন কবির নাম ও গ্রন্থ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কবিশেখর উপাধি ছিল। তাঁহার কোন কোন গানের ভণিতায় কবিশেখর অথবা নব-কবিশেখর, এই নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 'শঠভাবোদয়' নামক প্রহসনের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঐ গ্রন্থখানি কৃষ্ণানন্দাচার্য্য কবিশেখর-রচিত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে

১। প্রাচীন কবি-গ্রন্থাবলী—বসুমতী কার্য্যালয়।
২। *History of Bengali Language and Literature*—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—পৃ: ৬৭৮।
৩। ১৯ বৃন্দাবন বসাকের লেন হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক প্রকাশিত।

গোপাল-বিজয় নামে একখানি বাঙ্গালা পুথি আছে। ইহার রচয়িতা চতুর্ভুজনাথের পুত্র কবিশেখর। এই গোপাল-বিজয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইহার রচিত গোপালচরিত মহাকাব্য ও গোপীনাথবিজয় নাটকের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের অনুবাদকদিগের মধ্যে এক কবিশেখরের নাম পাওয়া যায়[১]।

সুতরাং এই কবিশেখর উপাধি হইতেও বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সময় সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিতান্ত আধুনিক নহেন। তাঁহার উপাখ্যানাংশেও কিছু কিছু প্রাচীনত্ব আছে। আপাততঃ তাঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অবশ্য ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যে যে প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতার নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিশেখরের নাম নাই। কিন্তু তাহা হইতে কবিশেখরের সময় সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মনে হয়, প্রাণারাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিই জানিতেন এবং তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই, তাঁহার গ্রন্থে মৈমনসিংহের কঙ্ক ও চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসের কাব্যেরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমাদের কবিশেখরকেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিকামঙ্গলের পুথি

ইহার একখানি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছুদিন পরে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অন্যান্য বাঙ্গালা পুথির সহিত ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২২৫—২৬) প্রকাশ করি। পুথিখানি জীর্ণ, সাদা দেশী কাগজে বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে এক পৃষ্ঠে লেখা। দুইখানি পাতা এক সঙ্গে জোড়া—মাঝখানে ভাজ করা। পুথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের দিকে বোধ হয় একখানা পাতা নাই। সর্ব্বসমেত ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩। হস্তাক্ষর খুব প্রাচীন না হইলেও খুব আধুনিক নহে—অনেকগুলি অধুনা অপ্রচলিত 'ছাঁদের অক্ষর' দেখিতে পাওয়া যায়। মু, যু, কু, ক্ক, জ্ঞ, পু, ক,—প্রভৃতি অক্ষরের রূপ উল্লেখযোগ্য। লেখার একটী বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলা উচিত। এই পুথিতে 'ড' ও 'ঢ'এর নীচে কোন স্থলে বিন্দু ব্যবহৃত হয় নাই। বানান সম্বন্ধে কোনও নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শব্দের আদি য-কার সকল স্থলেই জকার-রূপ ধারণ করিয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, শ, ষ, স—ইহাদের কোনও পার্থক্য অনুসৃত হয় নাই। প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত অংশগুলির বানান অনেক স্থলে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কবিশেখরকৃত কালিকা-মঙ্গলের বিবরণ

গ্রন্থের প্রারম্ভেই 'অবিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনায়' গণেশ, দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা। তাহার পর চৈতন্যদেবের বন্দনা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।

১। *History of Bengali Language and Literature*—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ২২৪।

সুইরাগ।

নবদ্বীপে বন্দো হরি দ্বিজরূপে অবতারি
চৈতন্য চৈতন্য দিলা নরে।
অনাথ জনেরে ধরি সঘনে বলায় হরি
পার কৈল এ ভবসাগরে ॥
কনক গউর দেহা কপট সন্ন্যাসী নেহা
নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী।
অনেক ভকত সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে
প্রেমে তনু অভিলাসি ॥
ঘন বলে হরি বোল বাজান কর্ত্তাল খোল
সঘনে নাচএ বাহু তুলি।
কমললোচনে ঘন প্রেমজল বরিসন
হরিরসে হইয়া আকুলি ॥—(পত্র ৩ক)

'চৈতন্যচরণপদ্ম চিত্তেতে করিয়া সদ্ম' কবি কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর দিগ্‌বন্দনা প্রসঙ্গে তিনি পর পর 'কামরূপে কামিক্ষ্যা', 'তিলটকোণায় দেবী সিদ্ধেশ্বরী বিক্রমআদিত্য যথা নিত্য পূজা করি', 'আম্বুয়া মুলুকের ভদ্রকালী,' 'কালীঘাটে ভদ্রকালী', 'বাণিডাঙ্গায় দেবী রাড়েশ্বরী', 'ভাস্তাড়া ধামেতে চামুণ্ডাসুন্দরী,' 'খিরগ্রামে যোগাস্থা', 'পাড়া আম্বুয়ায় কামারবুড়ি', 'মৌলায় রঙ্কিণী', 'ভাণ্ডারহাটে সাবিত্রী', 'বিক্রমপুরে বিশালাক্ষী', 'রাজবলহাটে রাজবল্লভি', 'জরূড়ের ভগবতী', 'আমতার মেলাই,' 'দাধার চণ্ডিকা', 'বালিয়ায় জয়সিংহবাহিনী', 'ঘুরাণ্যে মাখাল পুরাসের ঘাটু', 'তানপুরে ষষ্ঠী', 'হাসনানের বটু', 'কালীঘাটে দেবী ভদ্রকালী ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিলা অঙ্গবলি', 'শ্রীকৃষ্ণনগরে দেবী সিদ্ধেশ্বরী', 'চম্পানগরে দেবী বিষহরী' বন্দনা করেন। এই অপরিহার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য মাঙ্গলিক প্রারম্ভের অবসানে কবি দেবীর আদেশে উপাখ্যান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

'সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি।
উরহ আসরমাঝে কঙ্কালমালিনি ॥
সপনে কহিলে মোরে দেবি কাত্যায়নী।
স্মরণ করিলে মাত্র আসিবে আপনি।—(পত্র ৪খ)

একদিন নিশীথে এক নৃপতিনন্দন দেবী ভদ্রকালীর যথাবিহিত পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল।

কামের নন্দন হৈয়া একমন
তোমারে করিল স্তুতি।
তোমার চরণ করিয়া পূজন
তবে সে পাইল উসাবতি ॥

তোমার চরণ করিল পূজন
অর্জ্জুন একমন হৈয়া।
সেই সে কারণ প্রভু নারায়ণ
সুভদ্রা তারে দিল বিয়া॥—(পত্র ৫ক)

এই স্তবে নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কাত্যায়নীর 'কপালে টঙ্কার পড়িল।' তিনি 'প্রিয়ো দাসী' বিমলার নিকট কে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—

মাণিকানগরে রাজা শ্রীগুণসাগর।
স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যা সতী।
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ।
তেঞি সে সুন্দর করে তোমারে স্মরণ॥—(পত্র ৬ক)

স্থানান্তরে এই মাণিকানগরের অবস্থান 'উৎকল-দ্রাবিড় দেশে' (১৭ক) ও 'দক্ষিণ-দ্রাবিড় দেশে' (২০খ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

বিমলার নিকট সুন্দরের কথা শুনিয়া কালী তৎক্ষণাৎ সুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বর দিতে চাহিলে সুন্দর 'করাঞ্জলি হৈয়া' এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন,—

তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন॥—(৬খ)

কালিকা অমনি প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার।
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে।
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত।
প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত॥
কার্য্য সিদ্ধি হব পুত্র করহ গমন।
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অনুক্ষণ॥—(৬খ)

তারপর একদিন সুন্দর, মাতা গুণবতী বা পিতা গুণসাগর, কাহাকেও কিছু না বলিয়া পড়ুয়া-বেশে কালীদত্ত শুক পক্ষী লইয়া উত্তরমুখে যাত্রা করিল।

স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর।
বহুমূল্য ধন রাখে খুঙ্গির ভিতর॥—(৬খ)

১। ভারতচন্দ্রাদিবর্ণিত সুন্দরের দেশ কাঞ্চীর অনতিদূরবর্ত্তী বর্ত্তমান মানিকাপটম্ বা মানিকপত্তনের সহিত এই মানিকানগরের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না। স্বর্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎকল দেশীয় কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে মাণিকাপত্তন নামের উৎপত্তির এক উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

খুরদা এড়ায়্যা গেল শ্বেতরাজার পুর।
চড়ুই পর্ব্বত বালা পশ্চাত করিয়া ॥—(৭ক)

সুন্দর চলিতে লাগিল এবং নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিল। এই প্রসঙ্গে পুরীর দারুমূর্ত্তির উদ্ভবের কারণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হরির মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য যথাক্রমে স্বর্ণ,তাম্র ও প্রস্তরের পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া দেবীর আরাধনা করেন। তাহারই ফলে 'দারুরূপে নীলাচলে অবতারি হৈলা নারায়ণ'। অতঃপর সুন্দর নীলগিরি-শিখরে মরকত-গঠিত মহেশ্বরমূর্ত্তি দেখিয়া শ্বেতগিরি অতিক্রম করিল এবং জঙ্গম পর্ব্বতে উপনীত হইল। সেখানে 'কাঞ্চনে রচিত' ভগবতীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বনমধ্যে এক সরোবরে সুন্দর মন্দির দেখিতে পাইল। শুক বলিল,—এই সরোবরেই জল লইবার জন্য আসিয়া পাণ্ডবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে যুধিষ্ঠির আসিলে ধর্ম্মের বরে পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চলিতে চলিতে 'সাত দিন মনুষ্যের সনে দেখা নাঞি।' ক্রমে 'শিব নৃপতির স্থান' অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপুর দিয়া সুন্দর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানে পৌছিলে সুয়া বিদ্যার বিষয় জানিবার জন্য;—

উধা করি চলি গেলা গগনমণ্ডল।—(১২ক)
দেখিল রাজার রাণী খেলে পাসাসারি।—(১২ক)

অন্তঃপুরে যাইয়া সুয়া বিদ্যাকে দেখিতে পাইল।

দেখিল বিদ্যার রূপে পুরি আলো করে।
সুয়া বলে এত রূপ না দেখি সংসারে ॥
চারি দিগে সখিগণ করয়ে বাতাস।
বিরহিণী বিদ্যা ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে খাটের উপরে।
হাস পরিহাস খেনে সখি সনে করে ॥—(১২ক)
বিদ্যা বলে সুয়া তুমি ফির তিন লোকে।
রূপে গুণে বিদ্যায় দেখিলে ভাল কাকে ॥—(১৩খ)

এই প্রসঙ্গে সুয়া সুন্দরের অলৌকিক গুণবত্তার কথা বর্ণনা করিলে—

বিদ্যা বলে সেই দেশ হয় কত দূর।
মোর দূত হৈয়া তুমি চল সেই পুর ॥
সোনায় বান্ধাব পাথ পায়ের নূপুর।
আমার মনের তাপ যদি কর দূর ॥ (১৩খ)

শুক সুন্দরের নিকট বিদ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বিদায় লইল। সুন্দর নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কক্ষতলে খুঞ্জি পুথি কান্ধে শোভে দিব্য ছাতি
রতন জড়িত জুতা পায়।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন সার গলায় রত্নের হার
সামলি গামছা দিয়া গায় ॥

পরিল খিরোদ বাস মুখে মৃদু মন্দ হাস
দুই করে রতন-বলয়া।
মানিক অঙ্গুরি পরে অতিশয় শোভা করে
মন্দ মন্দ চলিল নিলয়া ॥—(১৪ক)

জল আনিতে যাইবার সময় এইরূপ বেশে সুশ্রী সুন্দরকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া বর্দ্ধমানের রমণীকুল মুগ্ধ হইয়া গেল,—

না রহে কাহার কাখে কুম্ভ পড়ে খসি।
না হয় নিমিক কার দেখি মুখশশি ॥—(১৫ক)

নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে এক মালিনী ফুল বেচিতেছিল। তাহার সহিত সুন্দরের পরিচয় হইল। তাহারই গৃহে সুন্দরের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল।

কথাপ্রসঙ্গে মালিনী বীরসিংহরাজার কন্যা 'পুরুষ-বিদুষী পরমরূপসী শাস্ত্রে যেন সরস্বতী' বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যার বিবাহ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"পাটরাণী কুন্তীর বহু অনুরোধে বীরসিংহ বরের অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘটক পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু—

যত যত নৃপসুত ঘটকেত আনে।
কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ॥—(১৮খ)

বিদ্যা মাতার নিকট বলিল,—

যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব।
আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব ॥—(১৮খ)

ইহার পর হরগৌরী স্বপ্নে বিদ্যাকে বলিয়াছেন,—দক্ষিণদেশের গুণসাগর রাজার সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুত্র তাহার বর হইবে। তদনুসারে রাজা গুণসাগরের নিকট এক মাস হইল, মাধব ভাটকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দূর দেশ বলিয়া সে এখনও ফিরিতে পারে নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুন্দরের প্রবল আগ্রহ হইল। কিন্তু কি ভাবে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করিবে—কি করিলে বিদ্যা তাহাকে নির্বোধ বলিয়া ভাবিবে না, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে স্থির করিল,—

মালিনী যাইব আজি পুষ্প যোগাইতে।
আপনার নিদর্শন পাঠাইব তাতে ॥
লিখন করিয়া রাখি কুসুমের সনে।
অবশ্য পাইব বিদ্যা পড়িব লিখনে ॥—(১৯ খ)

মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া সুন্দর পুষ্প চয়ন করিল এবং বহু যত্নে একগাছি মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে—

দিব্য তালের পাতে লিখন করিলা তাতে
ভাবিয়া কুমার মনে মনে ॥—(২০খ)

পত্রের মধ্যে নিজের পরিচয়—মাধব ভাটের মানিকানগরে গমন—গুণসাগরের নিকট বিদ্যার বিবাহের প্রস্তাব—গুণসাগরের এখানে আসিয়া বিবাহ দিতে অনভিমত প্রভৃতি কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিল[১]।

এতেক লিখিয়া তবে কুমার সুন্দর।
গুড়াইয়া থুইল পাতি কুসুম ভিতর ॥ -(২১খ)

পত্র পড়িয়া বিদ্যা মালিনীর নিকট সুন্দরের পরিচয় ও সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল,—

ভাগিনা তোমার কি বয় তাহার
এ মালা গাঁথিল যেই।—(২৩ক)

তাহার নিকট সুন্দরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া বিদ্যা মালিনীকে গলার হার পুরস্কার দিলেন এবং তাহার সহিত দেখা করাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সরোবরে স্নান আমি করিব যখন।
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥—(২৪ক)

পরদিন দুই জনেই স্নানব্যপদেশে সরোবরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। তারপর,—

অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ।
অন্য ছলে কহে কথা কুমারী কুমার তথা
দুহাকার সঙ্কেত বচন ॥ -(২৬ক)

কমলে খঞ্জন বসিতে দেখিয়া, বিদ্যা তাহা লক্ষ্য করিয়া সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইঙ্গিতে সুন্দরকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল। সুন্দর তাহার উত্তররূপে কমলের উপর উপবিষ্টা ভ্রমরীকে সম্বোধন করিয়া অপর একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইহারই মধ্যে ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেই দিনই সে বিদ্যার সহিত মিলিত হইবে। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় পুনরায় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সুন্দর কি উপায়ে বিদ্যার গৃহে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন[২]। কালিকা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে
হইবেক সুলঙ্গি সরণী।

১। ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গে সুন্দরকে দিয়া একটী চিত্রকাব্যাত্মক সংস্কৃত শ্লোক লিখাইয়াছেন এবং বিদ্যাকে দিয়া তাহার উত্তরপ্রসঙ্গে আর একটী শ্লোক লিখাইয়াছেন।

২। এই স্তবে এক একটী পয়ারে যথাক্রমে ককারাদি বর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা চৌত্রিশা নামে অভিহিত হয় নাই।

পুরিবেক মনোরথে চলহ সুলঙ্গি পথে
যথা বিদ্যা নৃপতি-কুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে সুলঙ্গ হইব বরে ॥—(৩১ক)

এই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরিহাসের পর বিদ্যা সুন্দরের কবিত্ব ও বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে ময়ূরশিঞ্জন বর্ণন করিতে বলিলে তিনি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিলেন। তখন দুই জনের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল।

হরিসে কুমারী লাজ পরিহরি
মাল্য দিল তার গলে।
হরিসে কুমার নিজ কণ্ঠহার
বদল করিল রঙ্গে ॥
দুঁহে বলে বাণী শুন দিনমণি
আমার গন্ধর্ব্ববেহা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত তোমা অনুগত
দোস গুণ প্রেমলেহা ॥—(৩৩খ)

প্রতি রজনীতে সুন্দর এইরূপে বিদ্যার গৃহে আগমন করিয়া রতিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

দিবস হইল রাত্রি রাত্রি হইল দিন।
অনঙ্গ সনঙ্গ রঙ্গে দুজনে প্রবীণ ॥—(৩৫ক)

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে একদিন কালী ও বিমলার মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হইল,—

কালিকা বলেন প্রিয়ে বিমলা কিঙ্করি।
উপায় বল না ঝিয়ে কোন্ বুদ্ধি করি ॥
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার।
কহনা কেমতে পূজা হইব প্রচার ॥
বিমলা বলেন মাতা কঙ্কালমালিনি।
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী ॥
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে।
বিপত্যে রাখিলে পূজা হইব সংসারে ॥—(৩৫খ)

ইহার পর কালিকা পাতাল হইতে এক দৈত্যকে ডাকিয়া বিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার জন্ম আদেশ করিলেন। এ দিকে কিছু দিন পরে বিদ্যার গর্ভের কথা তাহার সখীদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিকটমুখী নামে এক সখী 'ত্রাসে অধমুখী হইয়া' রাণীর নিকট এই গর্ভসংবাদ বলিয়া দিল। বিদ্যা গর্ভের কথা অস্বীকার করিয়া অসুখের অছিলা করিল[১]—

১। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই অছিলার কথা বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৫৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

জ্বর হৈল পূর্ব্বে তেঞি দেখ গর্ব্বে
না জানি কেমন ব্যাধি।—(৩৭ ক)

রাণী এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালদিগকে তিরস্কার করিলেন; তাহারা দশ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও চোরের সন্ধান পাইল না।

ধরিয়া যোগীর সাজ ভ্রময়ে সহর মাঝ
স্থানে স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে।
আর যত সঙ্গিগণ নানা বেশে অনুক্ষণ
ফিরে তারা নগরে নগরে॥
কোটালের যত নারী নাপিতানী বেশ ধরি
ফিরিল লোকের নিকেতনে॥
যতেক নারীর মেলে কথা কহে নানা ছলে
না পাইল চোরের উদ্দিস॥—(৩৯ক-খ)

তখন তাহারা চোর ধরিবার জন্য এক অভিনব যুক্তি করিল। তাহারা সিন্দুর দিয়া বিদ্যার সমস্ত গৃহ মণ্ডিত করিল[১]। বিদ্যার গৃহে আসিয়া সুন্দরের বস্ত্রাদি সিন্দুর-রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কোটালগণ রজকের কথামত মালিনীর নিকট আসিয়া সেই বস্ত্রের অধিকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু গৃহমধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা চোর পাইল না—দেখিতে পাইল একটী সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথে তাহাদের কয়েকজন বিদ্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দিকে সুন্দর ইতোমধ্যেই বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিদ্যার উপদেশমত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিল। তাই কোটালগণ সেখানেও সহসা চোর ধরিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা গৃহসম্মুখে একটী গর্ত্ত খনন করিল[২] এবং উহা পার হইবার জন্য গৃহস্থিত সকলকে অনুরোধ করিয়া বলিল,—

নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন করিব লঙ্ঘন।
নরকের কুণ্ডে তার হইব বন্ধন॥—(৪২খ)

একে একে সকল সখী পার হইল। ক্রমে সুন্দরের পালা আসিল। সুন্দর ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া,—

পার হৈতে বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥
হরি শব্দ করি তারে কোটাল ধরিল।
গোপনে আছিল চোর প্রকাশ হইল॥

১। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই উপায় বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৬২)।
২। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এইরূপ গর্ত্ত খননের কথা আছে (শ্লোক ৩৮০)

অঙ্গের ভূষণ যত নিলেক কাড়িয়া।
পিছ মোড়া করি বান্ধে পাটদড়ি দিয়া ॥—(৪৩ক)

কোটালের পায়ে ধরিয়া বিদ্যা প্রাণনাথের প্রাণ ভিক্ষা করিল,—

শুন দুরবার লহ অলঙ্কার
নাহি মার প্রাণনাথে।
পাপ দুরবার আগেতে আমার
মাথা হান অসিঘাতে ॥
নাহি বান্ধ হাত মোর প্রাণনাথ
কনক কমল জিনি।
জিউক অধিক পিউ প্রাণনাথ
অতসি কুসুমমালি ॥—(৪৩ক)

চোরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথাপি—

লোকলাজে বীরসিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরার ॥ - (৪৪খ)

তখন সুন্দর বিদ্যার সহিত তাহার অনুরাগ ও রতিসুখের উল্লেখ করিয়া বিহ্লনকৃত প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশৎ কাব্যের চৌদ্দটী শ্লোক পাঠ করিল।

এই সময় সুন্দরকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কালী ভীষণ-সাজে সজ্জিত হইলেন। প্রলয়ের আশঙ্কায় দেবগণ শঙ্কিত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—

কোন ছার মনুষ্যেরে এতেক সাজনি ॥
মাছির পর্ব্বতঘাত কোথাহ না শুনি।
পতঙ্গে মাতঙ্গে সাজে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥—(৫০খ)

ইন্দ্রের কথামত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে মাধব ভাটরূপে বীরসিংহ রাজার সভায় পাঠান হইল। মাধব সুন্দরের ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিল। সুন্দর নিজের পরিচয় এবং বীরসিংহ অপেক্ষা গুণসাগরের মহত্ত্বের আধিক্যের উল্লেখ করিয়া বলিল,—কালিকার আদেশেই সে এইরূপ গোপনে বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন,—

যদি কালী দেখাইতে পার বিদ্যমান।
নিশ্চয় আমার কন্যা দিব তোরে দান ॥
যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন।
দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন ॥—(৫২ক)

সুন্দরের ব্যাকুলতায় দেবী বীরসিংহকে দেখা দিয়া সুন্দরের নিকট কন্যা সমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা যথাশাস্ত্র কালীর সাক্ষাতে কন্যা দান করিয়া,—

ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি।
পরিবার সমেত পূজিল ভদ্রকালী ॥
পূজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান ॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝারি।
দুই শত দাসী দিল পরমসুন্দরী ॥—(৫৩ক-খ)

ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে বিদ্যা একটী পুত্র প্রসব করিল; তাহার নাম রাখা হইল 'সদানন্দ'। পুথির লিখিত একটী পুষ্পিকা (colophon) অনুসারে এইখানেই কালিকাজাগরণ সমাপ্ত। তবে ইহার পরেও কালিকার পূজাপ্রচারের ও স্বপ্রাধান্যখ্যাপনের চেষ্টার বিবরণ আছে।

পুত্রের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে গুণবতী ও তাঁহার স্বামী গভীর শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন। গুণবতী কালিকার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে কালিকা মাতৃবেশে সুন্দরকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। মায়ের কথা মনে পড়ায় সুন্দর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিদ্যা বৰ্দ্ধমানে বার মাসের সুখ বর্ণন করিয়া সুন্দরকে সেই স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুন্দর দেশে যাইতে কৃতনিশ্চয়। বীরসিংহ হর্ষবিষাদ-পূর্ণ মনে লোকজন সঙ্গে দিলেন। সুন্দর গৃহে ফিরিলে সকলেই আনন্দিত হইল।

অন্তঃপুরে বার্ত্তা পায় গুণবতী রাণি।
মৃত শরীরে যেন সঞ্চরে পরাণি ॥—(৫৭খ)

কিছু দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। পূজা না পাইয়া কালিকা ক্রুদ্ধ হইলেন। বিমলা বলিল,—

তৃতীয় কালের শেষে কলি হইল পরবেশে
কলিকালে নর মূঢ়মতি।
তবে পূজে ভদ্রকালী ছাগ মেষ দিয়া বলি
যদি কিছু হয় ত দুর্গতি ॥—(৫৭ক)

কালিকার আদেশে এক রাক্ষসী সদানন্দকে খাইয়া ফেলিল। পুত্রের জীবন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুন্দর শাস্ত্রানুসারে দেবীর অর্চ্চনা করিল। সুন্দরের অর্চ্চনায় দেবী প্রসন্ন হইয়া সদানন্দকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন গুণসাগর মহাসমারোহে কালিকার পূজা করিলেন। পূজান্তে দেবী গুণবতীর নিকট স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনাদিকাল হইতে দেবতা ও মানুষকর্ত্তৃক নিজের পূজার কথা বলিলেন। তারপর কালীরূপসেবক-সেবিকা সুন্দর ও বিদ্যাকে লইয়া রথে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যমদূত আসিয়া তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

দূত বলে রথে চড়ি পাপী লৈয়া যাহ বুড়ি
মরণ জীবন নাহি মনে।

পাপী জন লৈয়া রথে চল্যাছ বৈকুণ্ঠ-পথে
কোন্ পুণ্য কৈল কোন্ দান ॥—(৬২ক)

ভদ্রকালীর বিক্রমে একে একে যমদূতগণ, স্বয়ং যম, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব—সকলেই পরাভূত হইলেন। এইখানে গ্রন্থ খণ্ডিত। বোধ হয়, ইহার পরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে দেবীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইবার কথা ছিল।

কবিশেখর-কৃত কালিকা-মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য

প্রধানতঃ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে ইহার ঐক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে ইহার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল—অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের বাহুল্য বা দীর্ঘ সমাসপ্রাচুর্য্য ইহাকে সাধারণের অবোধ্য করিয়া তুলে নাই। অস্থানে অযথা স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কবি ইহার রসাভিব্যক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই। নিন্দনীয় গ্রাম্যতাদোষ ইহাকে সাধারণের অপাঠ্য করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকৃত বিদ্যাসুন্দরের রতিসুখভোগের দীর্ঘ ও অশ্লীলতাপূর্ণ বর্ণনা বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট তেমন সুরুচিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এই মনোহর উপাখ্যান—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অতি উপাদেয় ও অন্যতম প্রধান romance—তাই আজ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত—অবজ্ঞাত। কিন্তু কবিশেখরের গ্রন্থে এই দোষের লেশমাত্র নাই। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের এই অংশের বর্ণনা অপেক্ষাও কবিশেখরের বর্ণনা অনেক মার্জ্জিত। কালিকার নিজপূজা প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের এক উদার ভাব এই কাব্যমধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

উপাখ্যানাংশেও ইহাতে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকার বিমলা-নাম্নী কিঙ্করী[১] অথবা কালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুক পক্ষী দ্বারা সুন্দরের কার্য্যে সাহায্যের উল্লেখ বোধ হয় অন্যত্র নাই। কবিশেখর গুণসাগরকে দক্ষিণ দেশের মাণিকানগরের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নাম বররুচি ও কাশীনাথের রত্নাবতী ও রত্নপুরীর আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।[২] বররুচি, কাশীনাথ ও কবিশেখরের গুণসাগর, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের হাতে গুণসিন্ধু আকার ধারণ করিয়াছেন। গুণসাগরের স্ত্রীর নাম বররুচি ও কাশীনাথের মতে কলাবতী; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ইহার কোনও নাম উল্লেখ করেন নাই। কবিশেখর ইঁহার নাম দিয়াছেন—গুণবতী। বীরসিংহের স্ত্রীকে কবিশেখর কুন্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথ ইঁহার শীলাবতী, এই নাম দিয়াছেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে ইঁহার কোনও নামের উল্লেখ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের মাধব ভাট ভারতচন্দ্রে গঙ্গাভাট রূপ ধারণ করিয়াছে। কোটালগণ চোর

১। কৃষ্ণরামের গ্রন্থে মালিনীর নাম বিমলা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৫০৪)।

২। গোবিন্দদাসের মতে সুন্দরের বাড়ী কাঞ্চননগর; তবে দক্ষিণদেশে নহে—গৌড়ে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৪৮৯)। কাঞ্চননগরের সহিতও রত্নপুরী ও মাণিকানগরের সাদৃশ্য আছে। এই কাঞ্চননগর হইতেই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র কাঞ্চী নাম কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন।

ধরিবার জন্য সুন্দরের গৃহ সিন্দুর-রঞ্জিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়া কবিশেখর বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রীবেশধারণের কথা লিখিয়াছেন। কবিশেখরোক্ত কৌশল বররুচি, কাশীনাথ ও রামপ্রসাদের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর ও রামপ্রসাদ বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছেন স্নানব্যপদেশে সরোবরের তীরে। ভারতচন্দ্র বিদ্যার গৃহেই উভয়ের প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকালে বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সঙ্কেত আলাপে উভয়ের মুখে কবিশেখর যে দুইটী সংস্কৃত শ্লোক দিয়াছেন, তাহা রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে নাই। বররুচিকৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই শ্লোক দুইটী পাওয়া গেল না[১]। তবে মোটের উপর, বররুচির গ্রন্থের সহিত কবিশেখরের গ্রন্থের মিল খুব বেশী—স্থানে স্থানে ভাষাগত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিশেখরের ভাষা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবিশেখরের ভাষা অযথা সংস্কৃতভারাক্রান্ত নহে। সংস্কৃত শব্দ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু দীর্ঘ সমাস এবং ভাষায় অল্পপ্রচলিত অভিধান-দৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ ইহাকে দুর্বোধ করিয়া তোলে নাই। কেবল এক স্থলে মৈথিল ও পুরাণ বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন ভাষা কবি প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেই অংশটী সমস্তই অবিকল এখানে তুলিয়া দিলাম। সুন্দরকে যখন আসামীরূপে কোটালগণ রাজা বীরসিংহের নিকট উপস্থাপিত করিল—ইহা সেই সময়ের বিষয় বর্ণনা করিতেছে।

> চৌর বিরাজসি যে পুরে   কে তোবেন আনিল মোরে
> কহ বিচারি।
> হাকি হালইযে মুণ্ড কোটয়াল জন্ন নাহি কহ কিয়ে ছরি
> ঠাড ভাই কাহে মন দুরবার হাকি ঝিকে কেষে দিয়ে দড়ি।
> এই ধ্বনি যুনি মুখঠি ভাসত চিত্তাক পুত্তলী রহ খেড়ি॥
> যুনি সুন্দর বোলতযুনেন নবরাজ কহে ফিকায় মুড মেরি।
> কনক চম্পক রায়ত দেহকান্তি অহো পুত্র তেরি॥
> ... ... (৪৫ক)

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর মশানে নীত হইলে মাধব ভাট আসিয়া যে ভাষায় কোটালগণকে সুন্দরকে ছাড়িয়া দিতে বলে, তাহার সহিত এই ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে।

পুস্তকের মধ্যে অনেক শব্দের প্রাচীন রূপ ও প্রাচীন বানান দেখিতে পাঁওয়া যায়। প্রাচীন উচ্চারণ-সূচক 'ঙ' ও 'ঞ':—ছিলাঙ (২৯ক)—ছিলাম; দিলাঙ—দিলাম (৩১ক),

---

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পুথির মধ্যে শ্লোক দুইটী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পুথি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সুঙরিয়া=স্মরিয়া, সুমরিয়া (৪০ক), সুঙরে=স্মরে, সুমরে (১১ক)। তেঞ্রি=তেঁই, সেই হেতু (৬ক). সুনিঞা (৬ক), নাঞি=নাই (১১খ), ঠাঞি=ঠাঁই (১৯খ) [কিন্তু কহি তব ঠাই—.৯খ, এইরূপ প্রয়োগও আছে।]

চ্ছ এই সংযুক্ত বর্ণের স্থলে ত্স:—ইৎসা=ইচ্ছা (২৯ক), আৎসা (২৫খ)। বর্ত্তমানেও চলিত ভাষায় 'ত্স' স্থানে 'চ্ছ' দৃষ্ট হয়। যথা—মৎস্য=মচ্ছ; চিকিৎসা=চিকিচ্ছে, তিকিচ্ছা।

নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলিও লক্ষ্য করা দরকার। যথা—হকু=হউক (১১খ), জিকু =জিউক (১১খ), আস্য=আইস (১২খ), করা=করিও (১২খ)।

ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি দ্রষ্টব্য—'অহ্' প্রত্যয়ান্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়া —যথা—খসাহ=খোল—(৪৩ক)।

অতীত ও ভবিষ্যৎকালের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি:—হইব=হইবে (৩৫খ), লাগিব =লাগিবে (৩৯খ), হইব=হইবে (৩৭ক), দেখিল=দেখিলাম (৩৭খ), দিল=দিলাম (৪০ক), কহিল=কহিলাম (৪২খ)। ভবিষ্যদর্থে উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ বর্ত্তমান কালেও পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বনামের মধ্যে—তুয়া=তোমার (৪০ক), তুহ=তুমি (৩৭ক), তুঞি=তুমি (৪৩খ) উল্লেখযোগ্য।

'কে' প্রত্যয়দ্বারা এক স্থলে ষষ্ঠীর অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিউকে=জীবনের (৪৩ক)। এইরূপ 'য়' প্রত্যয় দ্বারা কর্ম্মপদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—চোরায়—চোরকে, চোরাকে (৪৬ক)।

পরিশেষে এই পুস্তকে প্রাপ্ত অধুনা অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও তাহার রূপের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

তেঞ্রি—তেঁই (৪৩খ)
তুঞি—তুমি (৪৩খ)
জাকু—যাউক } (৫০খ)
দেকু—দিউক }
রড়—দৌড় (৬২খ)
বার‍্যায় রা—শব্দ বাহির হয় (৬২খ)
হকু—হউক (১১খ)
জিকু—জিউক, জীবিত হউক (১১খ)
সান—পাথর (১৪খ)
পসারি—দোকান (১৫খ)
আঙ্গার—অঙ্গার (১৭ক)
নিন্দ—নিদ্রা (৩৭খ)

প্রস্থাপ—প্রস্রাব (৩৯ক)
পীঠিল—পাঠাইল (৩৯খ)
তুয়া—তোমার (৪০ক)
গোড়ায়, গুড়ায়— (৪১ক)
পিচমোড়া বান্দে—হাত পিছনের দিকে দিয়া বান্ধে (৪১ক)
জিউকে—জীবনের (৪০ক)
পিউ—প্রিয় (৪৩ক)
উলে—নামে (৫২ক)
এক সাত—এক সঙ্গে (৫৫ক)
প্রিয়া—প্রিয়
উছুর—অধিক (১৯খ) [উছুর হইলে বেলা

ঝাট—সত্বর
বাসে— ভালবাসে (৩৫খ)
তুহ—তুমি (৩৭ক)
অপ্ছরী—অপ্সরী, অপ্সরা (১৪ক)
সুয়া – শুক (৬খ)
ভাগিনা— বোনপো (২৪ক)
লাগ—খোজ, নাগাল (২৯খ)
বালা—বালক (৭ক)
গোড়ায়—কাছে (৪০ক)
[পশ্চাৎ গোড়ায়]
অশ্বমুখ—ঘোড়ার মত উর্দ্ধমুখে, উদ্গ্রীব ভাবে (৩৯ক)
মেল—সমূহ (৩৯খ)
ঘটকেত—ঘটকে (১৮খ)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গোবিন্দদাস-কবিরাজ*

[১]

কবি-পরিচয়

পদকল্পতরুতে তিন হাজার এক শত একটি পদ আছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় এবং অপরগুলি মিশ্র মৈথিল-বাঙ্গালা বা ব্রজবুলী ভাষায় বিরচিত। ইহার মধ্যে মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতির রচিত যে পদগুলি আছে সেগুলিও ঠিক মৈথিল ভাষার আকারে নাই—তাহাদের ভাষাও ব্রজবুলীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পদকল্পতরুর মধ্যে **গোবিন্দদাস**-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদের সংখ্যা চারি শত পঁচিশটী মাত্র। পদামৃতসমুদ্রে গোবিন্দ-দাস'-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ত্রিশটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত নাই। ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি পদ আছে, যাহার ভণিতা পদকল্পতরুতে বাদ দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এইগুলির মধ্যে কতকগুলির ভণিতা পদরসসার প্রভৃতি অপর সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১] গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত পদগুলির মধ্যে আবার অন্য কবির ভণিতা-যুক্ত কতকগুলি পদও দৃষ্ট হয়।[২]

গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত এই চারি শতাধিক পদ অবশ্য কোন একটী কবির রচনা নহে। বৈষ্ণবসাহিত্যে গোবিন্দদাস নামে বহু কবি ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর স্বীয় পদসংগ্রহগ্রন্থ পদামৃতসমুদ্রের টীকায় কতকগুলি পদের প্রকৃত পদকর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যত-গুলিই গোবিন্দদাস থাকুক না কেন—**গোবিন্দদাস-কবিরাজ** নামে একজন মাত্র কবি ছিলেন এবং তিনিই যে গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ এবং শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং এ যাবৎ ছিলও না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এবং কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বহু বহু সুললিত পদ রচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ইঁহার কবিত্বের সমুচিত সমাদর করিয়া ইঁহাকে অনন্যসাধারণ **কবিরাজ** উপাধিতে ভূষিত করেন।

এমন যিনি—

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

* সন ১৩৩৩ সাল ১৯এ শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। পদকল্পতরু; পদসংখ্যা ৪২৮, ৯৯৫, ১৩৮২, ১৬৩৯, ১২৯৬। ইহা ছাড়া গোবিন্দদাসের একটী পদ প্রক্ষিপ্ত আছে (পদকল্পতরু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭)।

২। 'বিদ্যাপতি' + 'গোবিন্দদাস',—ছয়টী; 'রায় বসন্ত' + 'গোবিন্দদাস', তিনটী; 'রায় সন্তোষ' + 'গোবিন্দদাস', একটী; 'রায় চম্পতি' + 'গোবিন্দদাস', দুইটী; 'নরসিংহ রূপনারায়ণ' + 'গোবিন্দদাস', একটী; 'রূপ-নারায়ণ' + 'গোবিন্দদাস'—একটী। বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতার পদ আরও দুইটী পাওয়া যায়।

সেই মহাকবি গোবিন্দদাস-কবিরাজ—যাঁহার মাতামহ কবি দামোদর সেন, যাঁহার পিতা চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত চিরঞ্জীব সেন, যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ, যাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য, যাঁহার জন্মস্থান শ্রীখণ্ড—তাঁহাকে এত দিন আমরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াই জানিতাম। সম্প্রতি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের আসরে[১] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই গোবিন্দদাস-কবিরাজকে মিথিলাদেশবাসী অন্য এক কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-রচয়িতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহাকে কবিরাজ অথবা কবীন্দ্র বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্প লোকই জানে।

"কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপর গোবিন্দদাস বৈদ্যজাতীয় অনুমান করিয়া অনেকে ইঁহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস সেন নামক কোন বৈষ্ণব কবি ছিলেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫, পৃঃ ৭১]

"——এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।" [প্রবাসী, ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৯৮]।

নগেন্দ্রবাবু শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজের মৈথিলত্ব প্রতিপাদন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী বাঙ্গালী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিরাজের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন। শ্রীখণ্ডবাসী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিরাজের পরিচয় ও তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এবং গোবিন্দদাস-কবিরাজ নিজকৃত সঙ্গীত-মাধব নাটকে নিজের এবং ভ্রাতা রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন[২]। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিকত্ব এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।" বৈষ্ণবসাহিত্যে যাঁহার কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি জানেন যে, শ্রীখণ্ডবাসী গোবিন্দদাস, অধিকাংশ

১। "কবিরাজ গোবিন্দদাস", বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা (পৃঃ ৭১-৭৬); "বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা", প্রবাসী. ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ, (পৃঃ ১৯৬-২০৬), আষাঢ় (পৃঃ ৩৪৩-৩৫২)।

২। যথু ভাগীরথ্যুমৌ সরজনিনগরে (?) গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্
ব্রহ্মণ্যাদ্ বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদভিন্নঃ।—(ভক্তিরত্নাকর, পৃষ্ঠা ১৮,১৯)।

'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র'র মত স্বয়ংসিদ্ধ উপাধিধারী ছিলেন না। ইঁহার কবিত্বশক্তি ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব-প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব গোস্বামি-সমাজ ইঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।—

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব-লোকনাথ-আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

—(ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩১)।

এই স্থানে গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবিন্দদাস খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন[১]। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্য-দেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহার আদিম বাসস্থান ছিল ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কুমারনগর গ্রাম। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেন। তথায় ইঁহার দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন—রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র অতিশয় সুপুরুষ, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এবং উত্তরকালে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজ বা শুধু কবিরাজ নামে খ্যাত হন। রামচন্দ্র যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গ্রামোপান্তে পুষ্করিণীতীরে আসীন সানুচর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দেখিয়া তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ইনি অভিন্নাত্মা বন্ধু ছিলেন।[২]

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যখন শিশু, তখনই তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহের আশ্রয়ে পালিত হইয়া, পরে তাঁহারা পৈতৃক স্থান কুমারনগরে বাস করেন, এবং আরও পরে তেলিয়া বুধরী গ্রামে উঠিয়া যান। মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র এবং গোবিন্দও শক্তি-উপাসক হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের বৈষ্ণবতা দেখিয়া পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইতে বাসনা করিলেন।[৩] আচার্য্য খেতরী যাইবার পথে বুধরীতে আগমন করেন। তখন গোবিন্দ কঠিন গ্রহণী রোগে ভুগিতেছেন। আচার্য্য তাঁহাকে সুস্থ করাইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও সেই সঙ্গে বৈষ্ণব-দীক্ষা লাভ করেন।[৪]

গোবিন্দের কবিত্বশক্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে

১। গোবিন্দদাস সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খেতরীর মহোৎসবে (১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন।

২। ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

৩। ঐ, নবম তরঙ্গ।

৪। ঐ, দশম তরঙ্গ ; প্রেমবিলাস, বিংশ বিলাস।

আদেশ করেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দকে গৌরলীলা বর্ণনা করিতে নিষেধ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার কবিতা পাঠে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ গীত লিখিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন।[১] তাঁহাদের উচ্চ প্রশংসাসূচক এই শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে,—

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥

—(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৩১)।

এইবার নগেন্দ্র বাবুর উত্থাপিত গোবিন্দদাসের মৈথিলত্ব প্রতিপাদক যুক্তিগুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাক, সেগুলি কতদূর বিচারসহ।

(১) গোবিন্দদাসের রচিত একটী রামচন্দ্রের বন্দনাপদ আছে (পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪০৭)। তাহার ভণিতা এইরূপ,—

ভকত-আনন্দন মারুত-নন্দন চরণ-কমল করু সেবা।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারণ হরিনারায়ণ দেবা॥

এই পদটী ভক্তিরত্নাকরে কিছু কিছু পাঠান্তর সহিত পাওয়া যায়। তাহার ভণিতাটী এইরূপ,—

হৃদয়ে আনন্দিত মারুতনন্দন ভরত চরণ করু সেবা।
গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল হরিনারায়ণ অদিদেবা॥

—(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৩০)

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিতেছেন যে, এই হরিনারায়ণ একজন মিথিলার রাজা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি 'রায় চম্পতি' হইতে অভিন্ন! রায় চম্পতির সহিত গোবিন্দদাসের মিলিত ভণিতার পদ দুইটী পাওয়া যায় (পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৫৩১,৫৩৮)। নগেন্দ্র বাবুর মতে চম্পতি=চম্পারণ্যপতি; অতএব এই হরিনারায়ণ (অথবা অপর এক রাজা নরসিংহ) মিথিলার এবং চম্পারণের রাজা ছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই নামের কোন মিথিলাধিপ বা চম্পারণপতির সঠিক সন্ধান অদ্যাপিও ইতিহাসে মিলে নাই।

এই হরিনারায়ণ কে ছিলেন? এই হরিনারায়ণ শিখরভূমির (বর্ত্তমান নাম পঞ্চকোট) রাজা বা জমিদার ছিলেন। ইনি গোবিন্দদাস-কবিরাজের বন্ধু ছিলেন, এবং রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে নিজে মন্ত্র না দিয়া, ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা রাজাকে

১। "তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবমঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি।" (পত্রিকা ৩)। "সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে. তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যম্।" (গোবিন্দকবিরাজের প্রতি শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র ; পত্রিকা ৪)—[ভক্তিরত্নাকর, চতুর্দ্দশ তরঙ্গ]।

রামমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করান।[১] এই রামভক্ত রাজার অনুরোধেই গোবিন্দদাস উক্ত রামবন্দনাটী রচনা করেন।[২] নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, যেহেতু পদকল্পতরুতে অন্য দেবদেবীর বন্দনা নাই, অতএব বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা অন্য দেবদেবীর বন্দনা লিখিতেন না ; এবং যেহেতু পদকল্পতরুতে এই একমাত্র রামচন্দ্র-বর্ণনা পাওয়া যায়, অতএব নিশ্চয়ই ইহা কোন মৈথিল কবির রচনা !

যেমন রাজা হরিনারায়ণের অনুরোধে গোবিন্দদাস রামচরিত্র-গীত লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত বা সন্তোষ রায়ের অনুরোধে তিনি সঙ্গীতমাধব নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।[৩] তিনি একটী কবিতায় স্বীয় সুহৃৎ সন্তোষ রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেটী এই,—

মরকত-মঞ্জু মুকুর-মুখ-মণ্ডল-মুখরিত-মুরলি-সুতান।
শুনি পশু-পাখি-শাখিকুল পুলকিত কালিন্দি বহই উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর-চন্দ।
কামিনি-মনহি মুরতিময়-মনসিজ জগ-জন-নয়ন-আনন্দ ॥ধ্রু॥
তনু-তনু অনুলেপন ঘন-চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম-পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত অবনি-বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার-চরণ-তল শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
রায়-সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত দাস-গোবিন্দ॥

—(পদসংখ্যা, ২৪১৫)॥

রাধামোহন ঠাকুরও পদামৃতসমুদ্রে এই পদটীর টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"শ্রীনরোত্তমঠক্কুরস্য ভ্রাতা শ্রীসন্তোষরায়নামাসীৎ। তেন শ্রীরাধাকান্তনাম্নাঃ শ্রীমূর্ত্তেরেতদ্রূপদর্শনং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজঠক্কুরায় তদ্বর্ণয়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতস্তন্নাম দত্তম্।"

(২) গোবিন্দদাস-কবিরাজের অপর দুইটী পদে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়,—

কমলা-লালিত-চরণ-কমল-মধু পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥

—(পদসংখ্যা ২৪১৬)।

এবং—গোবিন্দদাস ভণ রসিক-রসায়ন।
বসয়তু[৪] ভূপতি রূপনারায়ণ॥—(পদসংখ্যা ২৪২০)।

১। শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।—ইত্যাদি (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৫৮৩)।

২। হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণবপ্রধান। রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন॥
তিঁহ যৈছে শিষ্য হইলা যে শিষ্য করিল। সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা॥—(ঐ, পৃঃ ৩২)।

৩। ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিল॥
রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে। শুনিয়া সন্তোষদত্ত পরমানন্দ চিতে॥—(ঐ, ৩২)।
এবং—গোবিন্দ-কবিরাজ শ্রীসন্তোষ রায়ের রীতি। গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাঞা প্রীতি॥
—(প্রেমবিলাস, ২০ বিলাস)।

৪। 'রসময়' নগেন্দ্রবাবুর অনুমত পাঠ।

কেবল এই ভণিতা দুটী এবং স্বীয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, —'নরসিংহ-রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা' (সা-প-প, পৃঃ ৭৩)। প্রকৃত পক্ষে এই দুই ভণিতায় 'নরসিংহ, রূপনারায়ণ' এবং 'ভূপতি, রূপনারায়ণ' দুই জনকে বুঝাইতেছে। প্রেমবিলাস (২০ বিলাস) হইতে জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কবি ও সুগায়ক রূপনারায়ণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। রূপনারায়ণ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই আদেশে নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'পক্কপল্লীর' রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিত রূপনারায়ণ (ইনিই কি পদকর্ত্তা রূপনারায়ণ ?) গোবিন্দদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যই গোবিন্দদাস এই দুই জনের প্রতি প্রীতি জানাইবার জন্য ভণিতার মধ্যে ইহাঁদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে কবি তাঁহার বন্ধু পদকর্ত্তা রায় বসন্ত বা বসন্ত রায়—যিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন[১] —তাঁহার নামও কতিপয় পদের ভণিতায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।[২]

নগেন্দ্র বাবু শুধু 'রূপনারায়ণ', 'নরসিংহ' ও 'রূপনারায়ণ' ভণিতাযুক্ত পদ তিনটী লইয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ বাঙ্গালী নাম বলিয়া 'রায় সন্তোষ' এবং 'রায় বসন্ত' ভণিতাযুক্ত পদ চারিটীর[৩] উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই। অথচ এই পদগুলি সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে কোন ক্রমেই যে গোবিন্দদাস-কবিরাজের লেখনীর অযোগ্য, তাহা কিছুতেই বলা চলে না।

(৩) নগেন্দ্রবাবু বলেন, "কিন্তু কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের ভাষা এমন মার্জ্জিত, তাঁহার শব্দের ঐশ্বর্য্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (সা-প-প, পৃঃ ৭৪)।

যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত অসার ও মূল্যহীন, তথাপি আমি এই স্থানে যথেচ্ছ কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী অনেক কবি গোবিন্দদাসের মতই মার্জ্জিত ও সুললিত ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরু হইতে যদৃচ্ছা কয়েকটী উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

> বিকচ-সরোজ-ভান-মুখ-মণ্ডল দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
> কিয়ে মৃদু-মাধুরি-হাস উগারই পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥
> বরণি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া।
> কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনিলমণিয়া ॥

১। শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥—(ভক্তিরত্নাকর, পৃষ্ঠা, ২৮) ॥

২। প্রেমবিলাস (২০ বিলাস) দ্রষ্টব্য।

৩। গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায়-বসন্ত ॥ (পদসংখ্যা ১০৫০) ॥
তো বিনু কিসলয়-শয়ন বীজন বিকল ভেল মতিমন্ত।
দাস-গোবিন্দ এ রস গাহক ভাওয়ে রায়-বসন্ত ॥ (পদসংখ্যা ১৭২০) ॥
কামিনি-কর-কিসলয়-বলয়াঙ্কিত-রাতুল-পদ-অরবিন্দ।
রায়-বসন্ত-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত দাস-গোবিন্দ ॥—(পদসংখ্যা ২৫২২)॥

অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল চরণে নুপুর কটি-কিঙ্কিণি-কলনা।
অভরণ-বরণ-কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর কালিন্দি জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিতকেশ বেশ কুসুমাবলি শির পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
অনন্তদাস-পহু অপরূপ-লাবণি সকল-যুবতিমন পড়ি গেও ফান্দে॥
---(পদসংখ্যা ২৬৮)॥

কাজর-রুচিহর রয়নি বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ-পথ-গতি চললিহ থোর॥

* * * * *

যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা। শেখর আভরণ ভেল বহন্তা॥(পদসংখ্যা ২৭০৬)
কৈছে চরণে করপল্লব ঠেললি মীললি মানভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি দেখব ইহ রঙ্গে॥

* * * * *

অবিরোধি-প্রেমপন্থ তুহুঁ রোধলি দোষলেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি হামারি ওরে নাহি চাহ॥ (পদসংখ্যা ৪৬৮)।

জয় নাগর-বর-মানস-হংসী। অখিল-রমণি-হৃদি-মদ-বিধ্বংসী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু-কুমারী। মদন-মোহন-মন-পঞ্জর-শারী॥
জয় যুবরাজ-হৃদয়-বন-হরিণী। শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জর-করিণী॥
কুঞ্জ-ভুবন-সিংহাসন-রাণী। রচয়তি মাধব কাতরবাণী॥ (পদসংখ্যা ২৬৬৫)।

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলন রঙ্গভূমে ঐছন কয়ল পুছেরি।

* * * * *

হাম সব নিজজন কহসি রাতি দিন সো সব বুঝনুঁ আজ কাজে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ রাই পায়ল বহু লাজে॥ (পদসংখ্যা ২৩০)।

প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যায় বলিয়া আর অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না। গোবিন্দদাস মহাকবি; তাঁহার মত অতগুলি ভাল ভাল পদ সকল বৈষ্ণব পদকর্ত্তা রচনা করিতে পারেন নাই--এ কথা ঠিক। সকলে সমান কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়াই যে গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইতে পারেন না—এই যুক্তি অতীব তুচ্ছ। গোবিন্দদাসের লেখা যেমন বেশী রকম মৈথিলঘেঁষা দেখা যায়, তেমনি শিবরাম, নরহরিদাস (ঘনশ্যাম), জ্ঞানদাস ও রাধামোহন ঠাকুরের রচনার মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। তবে গোবিন্দদাসের মত অন্যান্য পদকর্ত্তারা বিদ্যাপতিকে বিশেষরূপে অনুকরণ করেন নাই; তাঁহারা ব্রজবুলী অপেক্ষা খাস বাঙ্গালাতেই বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। সেই কারণ তাঁহাদের রচিত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাষার বাঙ্গালা রীতি কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কোন ভাল গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া যায় না ; ইহার কারণ, তাঁহার মতে, "মিথিলার কবি কৃষ্ণ ও রাধাবিষয়ক পদ রচনা করেন, চৈতন্যদেবের বিষয়ে একটীও পদ রচনা করেন নাই।" (সা-প-প, পৃঃ ৭৪)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবসমাজ গোবিন্দদাসকে গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিতে নিষেধ করিয়া, কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার কারণ, গোবিন্দদাসের অনেক পূর্ব্বেই চৈতন্যদেবের ভক্ত ও অনুচর বাসুদেব ঘোষ মহাশয় গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া উত্তম উত্তম পদ প্রচুর লিখিয়াছেন।[১] এই হেতু গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচিত গৌরলীলাবর্ণনার বিশেষ কোন পদ পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দদাস-কবিরাজ-রচিত উৎকৃষ্ট গৌরবন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকার পদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, বেড়ল ভকত-নখতরন্দ,
অখিল-ভুবন-উজরকারি, কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছল রসক সিন্ধু,
হৃদয়-কুহর-তিমিরহারি, উদিত দিনহি রাতিয়া ॥

ইত্যাদি (পদসংখ্যা ১০৬৩)।

দেখ দেখ নাগর গৌর-সুধাকর জগত-আহ্লাদন-কারী।
নদীয়া-পুরবর-রমণী-মণ্ডল-মণ্ডন-গুণমণি-ধারী। ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২১৩৫

নিরুপম-হেম-জ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গিত-রঙ্গি তরঙ্গিত-চরণা ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২০৭৫)।

শ্রীপদকমল-সুধারস-পানে। শ্রীবিগ্রহগুণগণ করি গানে ॥ ইত্যাদি পদসংখ্যা ২৭)

যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন জপতহি যদুপতি-নাম।
যাম যামযুগ যৈছন জানত জর জর জীবন মান ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ১৮৮৭)।

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব জগমনমোহন ভাঙনী রে[২] ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ৩)।

ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া এই কবিতাগুলি গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

(৫) নগেন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"যে সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ-

১। গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়।
স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণলীলা। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে লিখিলা ॥—(প্রেমবিলাস, ২০ বিলাস)।

২। নগেন্দ্র বাবু এই চমৎকার কবিতাটীকে গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচিত বলিয়া মনে করেন না (প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০০), কিন্তু কোন উপযুক্ত কারণ দেখান নাই।

দাস উভয়ের নাম আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি।" (প্রবাসী, ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০২)।

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে! গোবিন্দদাসের সহিত রায় বসন্ত, রায় সন্তোষ ইত্যাদি বাঙ্গালী কবি ও রসজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তখন কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত আসিতে পারে? সত্য বটে যে, বিদ্যাপতির কবিতার সহিত গোবিন্দদাসের কবিতার ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে। ইহার কারণ, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদাবলী আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা গোবিন্দদাসের রচিত অন্যতম বিদ্যাপতি-বন্দনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সেই পদটী এই,—

বিদ্যাপতি-পদ-যুগল-সরোরুহ-নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস-মাতল-মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি-নাগর-নাগরী-লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ধ্রু॥
জমু বাওন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহিঁ ভকতনখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ-ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত-কৃপা বলবান॥—(পদসংখ্যা ১২)।

এই পদের—বিশেষতঃ ধ্রুবপদটীর ভাব শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কোন কবি ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা একেবারেই অসম্ভব। কবি গোবিন্দদাস গুরু-সমাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিদ্যাপতির অনুসরণে[১] কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেন। তাই কবি পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ কবির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যেন রাধাকৃষ্ণের লীলা তাঁহার নিকট স্ফূর্ত্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোবিন্দদাস-কবিরাজের আটটী কবিতায় 'বিদ্যাপতি' ভণিতা দৃষ্ট হয়। যথা,—

বিদ্যাপতি কহে মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তাহে সাখি॥—(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৩)।

এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি পূরল ইহ রস ওর॥
—(ঐ, পদসংখ্যা ২৬১)।

[এই পদের ভাষাও তো মিশ্র বাঙ্গালা ও মৈথিল; তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত খাটে কি করিয়া?]

১। গোবিন্দদাস নিজকৃত অপর বিদ্যাপতি-বন্দনায় বলিতেছেন,—

গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত সুখ-সম্পদ রহইতে আনমন বৈছন বামন শশধহি চন্দে।
—(পদসংখ্যা ২৬৩)।

বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভাণ॥—(প-ক-ত, পদসংখ্যা ৪০০)।
বিদ্যাপতি কবি ভাষ।
কহতহি হেরত গোবিন্দদাস॥—(ঐ, পদসংখ্যা ১২৯৬)[১]।

পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রস-পূর॥—(ঐ, পদসংখ্যা ১৬৪০)।

বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত। গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥
—(ঐ, পদসংখ্যা ১৬৭১)।

বিদ্যাপতি-পদ মোহে উপদেশল রাধা-রসময়-কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরল সো হেরি লাগয়ে ধন্দা॥
—(পদামৃতসমুদ্র, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৭)।

তাকর অন্তর জ্বলই নিরন্তর বিদ্যাপতি ভালে জান।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই গোবিন্দদাস পরমাণ॥
—(ঐ, পৃষ্ঠা ১০৯)।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই ভণিতাগুলির সর্ব্বত্রই বিদ্যাপতির নাম অগ্রে এবং গোবিন্দদাসের নাম পরে দেওয়া আছে।

এই যুক্ত-ভণিতা দেওয়ার কারণ কি? বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের তো সমসাময়িক বা বন্ধু ছিলেন না, যে বন্ধুত্বের খাতিরে গোবিন্দদাস এইরূপ করিয়াছেন। ইহার কারণ দুইটী হইতে পারে। এক—বিদ্যাপতিকে সম্মান জ্ঞাপন করিবার জন্য গোবিন্দদাস স্বীয় ভণিতায় তাঁহার নাম লইয়াছেন। অথবা, ইহা খুবই সম্ভব যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং কবিতাগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না করিয়া যুক্ত-ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরও একটী পদের [প-ক-ত ৯৩] ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"পক্ষে বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাসকবিরাজ-কৃতমিতি গম্যতে।" এবং পদামৃতসমুদ্রের (পৃঃ ৯৭) উল্লিখিত প্রথম কবিতাটীর টীকায়ও লিখিয়াছেন,—"পক্ষে, বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

নগেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, গোবিন্দদাস-কবিরাজকে কোন ক্রমেই মৈথিল প্রতিপন্ন করা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহাশয় শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজকে গোবিন্দদাস ঝা বানাইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস-কবিরাজকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমাদের দেশে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন সকল কবিকেই আলোচনাকারীর ইচ্ছামত স্বদেশ বা স্বগ্রামবাসী, এমন কি, স্বজাতীয় প্রতিপন্ন করিবার এক প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল। এখন

১। পদকল্পতরুতে এই পদটী ভণিতাহীন দৃষ্ট হয়।

দেখিতেছি যে, বিদেশবাসী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। যুক্তিহীন অথবা সত্যহীন হইলে উভয় চেষ্টাই তুল্যরূপে গর্হিত।[১]

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই প্রবন্ধমধ্যে আমি যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুতে যেরূপ ভাবে মুদ্রিত আছে, প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি। 'ঐসন'কে 'অইসন', 'আয়ল'কে 'আএল' করিয়া 'মৈথিল' রূপান্তর দিতে চেষ্টা করি নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যে আর যাহা কিছুর অভাব থাকুক না কেন, সৎকবির অসদ্ভাব কোন কালেই ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যের আদর চিরকালই আছে বটে; কিন্তু কবিদের জীবন-চরিত ও জীবন-কাল সম্বন্ধে বাঙ্গালী চিরকালই অতিমাত্রায় উদাসীন। আধুনিক-পূর্ব্ব বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁহার আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কি জানি? শুধু কতকগুলি গল্প মাত্র; এবং তাঁহার আবির্ভাব সময় লইয়া আলোচনাকারীর রুচি, ইচ্ছা এবং সুবিধামত পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টানা-হিঁচড়া চলিতেছিল। শুধু শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হওয়াতে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের সাহায্যে একটা মোটামুটি সময়ের ধারণা হইয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা ছিল ও আছে। সে সকলের এ যাবৎ কোন মীমাংসা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও মূল্যবান্ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Artsএ বিদ্যাপতির সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটী খুব মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু কবিশেখর, কবিরঞ্জন, রায় চম্পতি, সিংহভূপতি প্রভৃতি সম্ভব-অসম্ভব ভণিতার পদ যথেচ্ছ বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিতে চাহেন। "ভাবিয়া দেখিয়া গণিয়া দেখিলে" বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা এক শতটীর উর্দ্ধে যাইবে কি না—ঘোরতর সন্দেহ। কৃত্তিবাস অত বড় কবি, তাঁহার উল্লিখিত "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" লইয়া দ্বন্দ্ব এখনও তুমুল চলিতেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লইয়া আলোচনার সম্বল তো কেবল "ডিহিদার মামুদ সরিপ" ও "ধন্য রাজা মানসিংহ"! পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বিজয়-গুপ্তের বর্ত্তমান বংশধর তাঁহা হইতে পাঁচ পুরুষ মাত্র; তাহা হইলে তো বিজয়গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক হইয়া দাঁড়ান! দূরের কথা যাউক, সে দিনকার ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি? ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি তো ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সেই কবি-কাহিনী সকলের পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।

১। গোবিন্দদাসের বিষয় ছাড়া আরও অনেক নূতন নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব 'তথ্য'র পরিচয় নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহার আলোচনা এখানে করা গেল না। [পাছে কেহ কিছু মনে করেন, এই ভাবিয়া এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক কায়স্থজাতীয়—বৈদ্য-জাতীয় নহেন]।

এই তো অবস্থা। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ হইতেছেন একমাত্র বড় কবি, যাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট, বিস্তৃত ও সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, বন্ধু-সমাজ—কেহই অজ্ঞাত, অখ্যাত নহেন। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে যাহা অনন্যদুর্লভ, তাহা অর্থাৎ গোবিন্দদাস-কবিরাজের কাব্যরচনার একটা প্রামাণিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ইতিহাস-প্রবঞ্চিত বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এই সৌভাগ্যই বা আমাদের সহিবে কেমন করিয়া? সম্পূর্ণ পরিচয়যুক্ত এই একমাত্র করির বঙ্গদেশে কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া আমরা খেয়াল দেখিতেছি। ইতিহাস-সরস্বতীর অপূর্ব্ব বিদ্রূপ!

গোবিন্দদাস-কবিরাজ তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল-ভাষায় লিখেন নাই। তিনি যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা একটী মিশ্র ভাষা। এই ভাষা বিদ্যাপতি সমসাময়িক প্রাচীন মৈথিল ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাঙ্গালা ভাষার রস-সঞ্চারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী কবির লেখনীতে এই ভাষার জন্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-প্রসঙ্গই এই ভাষার উপজীব্য বস্তু বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এই সাহিত্যিক পরগাছা বা উপভাষা "ব্রজবুলী" নামেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই পরগাছা এখন ভাষা-তরুর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্যের ইতিহাস টানিয়া আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কবিরাজ এই বিস্তৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদগ্ধসমাজে তাঁহার কবিত্বের যথোচিত আলোচনা ও সমাদর তো হয়ই নাই, উপরন্তু নানাবিধ ভ্রমাত্মক তথ্য প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

[২]

কবি-উল্লিখিত ব্যক্তি-পরিচয়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস-কবিরাজের কতকগুলি পদের ভণিতার মধ্যে অপর ব্যক্তি বা কবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুধৃত পদগুলির মধ্যে ছয়টী পদে বিদ্যাপতির ভণিতা[১], তিনটী পদে রায়-বসন্তের ভণিতা[২], একটী পদে রায়-সন্তোষের ভণিতা[৩], একটী পদে হরিনারায়ণের ভণিতা[৪], একটী পদে নরসিংহ রূপনারায়ণের ভণিতা[৫], একটী পদে ভূপতি রূপনারায়ণের ভণিতা[৬] ও দুইটী পদে রায়-চম্পতির ভণিতা[৭] দেখিতে পাওয়া যায়।

১। পদসংখ্যা [৯৩, ২৬১, ৪০০, ১২৯৬, ১৬৪০; ১৬৭১,] ; পদামৃতসমুদ্রে দুইটী অতিরিক্ত এইরূপ ভণিতার পদ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৯৭, ১০৯ ; বহরমপুরের দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২। পদসংখ্যা [১০৫০, ১৭২০, ২৪২২]।

৩। পদসংখ্যা [২৪১৫]। ৪। পদসংখ্যা [২৪০৭]। ৫। পদসংখ্যা [২৪১৬]। ৬। পদসংখ্যা [২৪২০]। ৭। পদসংখ্যা [৫৩১, ৫৩৮] ; শেষের পদটীতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের পদকল্পতরুতে "প্রাপ্ত আদিত" এই পাঠ ধরা আছে। তাহা সমীচীন নহে।

বিদ্যাপতি, রায়-সন্তোষ, হরিনারায়ণ, নরসিংহ ও রূপনারায়ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন রায়-বসন্ত ও রায়-চম্পতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

অনেকে বলেন যে, এই রায়-বসন্ত, ভবানন্দ (রায়) মজুমদারের পুত্র এবং তথাকথিত বসন্ত-সুকুমার কাব্যের রচয়িতা ; এবং ইনি অনুমান ৮৪০ সালে ভুরসুট পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, এই অনুমানের সমর্থক বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাওয়া যায় না ; উপরন্তু রায়-বসন্তের পদ আলোচনা করিলে, তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কবি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অপরে বলেন যে, ইনি প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন। ইহাও গল্প মাত্র। পদকল্পতরুতে (পরিষৎ সংস্করণ) [৫৩৮] সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে,—

জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন সোই পূজে পাঁচ-বাণ।
প্রাত আদিত ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ ॥

অনেকের মতে, প্রাত আদিত=প্রতাপাদিত্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহা ঠিক নহে। এই স্থলে পুথিতে পাঠ আছে,—

রায়-চম্পতি ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ ॥

এবং এই পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

পদকল্পতরুতে রায়-বসন্তের উনত্রিশটী পদ আছে। সেগুলির পদসংখ্যা এই,— [২৪৫৩, ২৪৪৯, ২৯২৬, ২৪৪৬, ২৪৪৮, ২৯২৯, ২৯২৭, ২৯৩৫, ২৯১৮, ২৯০৫, ২৯২৩, ২৯৩৪, ৫৫২, ২৯৩৩, ২৯২৪, ২৯২১, ২৯৪৭, ২০৩২, ২৯৩১, ২৯২৮, ২৪৫০, ২৪৫১, ২৯২০, ২৯১৭, ২৪৫২, ২৪৪৭, ২৯৩০, ২৯১৯, ২৯৫৪]। রায়-বসন্তের কিছু পরিচয় অগ্রে দিয়াছি। এক সময়ে নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ-কবিরাজ ও ব্যাস চক্রবর্ত্তীর মধ্যে তর্ক উঠে, গোস্বামি-সম্মত মত কোন্‌টী—স্বকীয়া-বাদ, না পরকীয়া-বাদ ? নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ-ভ্রাতৃদ্বয় পরকীয়া-বাদের পক্ষে, আর ব্যাস চক্রবর্ত্তী স্বকীয়া-বাদের পক্ষে ছিলেন। এই সংশয় নিরাস করিবার জন্য নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ-ভ্রাতৃদ্বয় বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর মত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র রায়-বসন্তের মারফতে পাঠান হইল। শ্রীজীব গোস্বামীও রায়-বসন্তের গৌড়দেশে ফিরিবার সময় তাঁহার হাত দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পত্র পাঠাইয়া দেন।

শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন।
পাঠাইব পত্র দঢ়াইলাম তিন জন ॥
গোস্বামি-পার্ষদবর্গে এক লিখন।
মনে বিচারি ইহা লঞা যাবে কোন জন ॥
রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিত্তে অবিরত ॥
আমরা কহিল তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলুঁ তিন জন ॥
তার পর রায় যবে আইল গৌড়দেশে।
পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সন্তোষে ॥ [কর্ণানন্দ, পঞ্চম নির্য্যাস]।

রায়-বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার একটী পদ ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। সেটী এই,—

প্রভু নরোত্তম গুণনিধি।
কনক-কমল জিনি সুকোমল তনুখানি
না জানি গঢ়িল কোন বিধি॥
গোরা প্রেমে মত্ত হৈয়া রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে।
পাইয়া অমূল্যধন কৈলা আত্মসমর্পণ
প্রভু লোকনাথের চরণে॥
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ
হইল গমন গৌড়-দেশে।
শ্রীগৌড়-ভ্রমণ করি গিয়া নীলাচলপুরী
পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশে॥
প্রভু-পরিকর যত অনুগ্রহ কৈল কত
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা।
এ দাস বসন্ত ভণে পাষণ্ডী-অসুরগণে
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা॥ [ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ]॥

গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে এই দুইটী ভণিতায় রায়-চম্পতির উল্লেখ দেখা যায়। দুইটী পদ একই ছন্দে লেখা।—

বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-কোণে হেরবি কান।
রায়-চম্পতি বচন মানহ দাস-গোবিন্দ ভাণ॥ [৫৩১ ॥
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন সোই পূজে পাঁচবাণ।
রায়-চম্পতি[১] ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ॥ [৫৩৮]॥

পদকল্পতরুর মধ্যে রায়-চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদ একটী [২০২৫], বিদ্যাপতি-কবি-চম্পতি-ভণিতাযুক্ত পদ একটী [৩৬৮], এবং শুধু চম্পতি-ভণিতাযুক্ত পদ আটটী পাওয়া যায় [৪৮০, ১৭৪৪, ১৬৬৪, ৭২৫, ১৬৫৮, ৪৮২, ৪৮১, ৫৩২]। এই চম্পতি কে? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পটুত্বের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, ইনি এবং বিদ্যাপতি অভিন্ন। ইহা অশ্রদ্ধেয়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব; কেবল রাধামোহন ঠাকুর একটু ঈঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পদামৃতসমুদ্রের টীকার দুই স্থলে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, চম্পতি-রায় দাক্ষিণাত্যবাসী, শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত, এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র ছিলেন এবং তিনিই গীতকর্ত্তা।

"শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রঃ চম্পতি-রায়নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" (পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ১৭৪)।

১। পাঠান্তর—'প্রাত আদিত' (প-ক-ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০)।

"চম্পতি-রায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" (ঐ পৃঃ ২৯২)।

চম্পতিরায়ের এই পরিচয় (যে তিনি চৈতন্যদেবের পার্ষদমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন) সত্য হইলে, ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদের মত রায়-চম্পতিরও কতকগুলি পদ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় যে ব্রজবুলি বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা রায় রামানন্দের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গি ভেল" পদ হইতে প্রমাণিত হয়।

'চম্পতি' শব্দ 'চমূপতি' শব্দ হইতে আসিয়াছে ; অর্থ— সেনাপতি। ইহা নামও হইতে পারে, পদবীও হইতে পারে। এই স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদবী 'চম্পটী'র সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই ; 'চম্পটী' বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি, গাঞি নাম, এবং ইহা আসিয়াছে গ্রামের নাম হইতে—প্রাচীন হিন্দু আমলের তাম্রশাসনে এই গ্রামের নাম 'চম্পাহিট্টী'রূপে পাওয়া যায়।

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপগোস্বামী দক্ষিণদেশবাসী কোন কবির রচিত ("দাক্ষিণাত্যস্য") বলিয়া পাঁচটী শ্লোক তুলিয়াছেন [শ্লোকসংখ্যা ৮, ৫০, ৭০, ১১৫, ২৮২]। তাহার মধ্যে একটী শ্লোকে 'চমূপতি' কথাটী আছে ; এবং সেই স্থলে ঐ কথাটী কবির নাম বলিয়া ধরিয়া লইলে বেশ সঙ্গত অর্থ হয়। সে শ্লোকটী এই,—

["অথ ভজনবাৎসল্যম্।

অতন্দ্রিতচমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত-
প্রণীতমণিপাদুকং কিমিতি বিস্মৃতান্তঃপুরম্।
অবাহনপরিচ্ছদং পতগরাজমারোহতঃ
কবিপ্রকরবৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ ॥ ১ ॥ ৫০ ॥ দাক্ষিণাত্যস্য"]।

এই চমূপতিই কি পদকর্ত্তা চম্পতি ?

'ভূপতি', 'কবি ভূপতি', 'সিংহ ভূপতি' এবং 'নৃপতি সিংহ কবি'—এই ভণিতার সর্ব্বসমেত চৌদ্দটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় [৪৮৩, ৪৭৯, ১৮৭৮, ৪৭৮, ৫৩৯, ১৭২৬ ; ৪৮৮ ; ১৬৯৮, ১০৮০, ৪৭৭, ১৭৩৬, ১৯৮৩, ১১৪ ; ৪৮৩]। অনেক পুথিতে এই সকল পদের কোন কোনটীর ভণিতায় ভূপতির পরিবর্ত্তে চম্পতি নাম পাওয়া যায় (পদকল্পতরুর পাঠান্তর দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি ১০৬০-১০৬৩ সালের মধ্যে লেখা একখানি পদসংগ্রহ-গ্রন্থ আমি দেখিতে পাইয়াছি। তাহাতে 'দুর্জ্জয় মান' প্রসঙ্গে পর পর সাতটী পদ আছে। সব পদগুলিতেই ভূপতির ভণিতা। এই পদগুলি পদকল্পতরুতেও পর পর দেওয়া আছে [৪৭৭-৪৮৩]। পদকল্পতরুতে কিন্তু এই সাতটীর মধ্যে তিনটী পদের ভণিতায় ভূপতির পরিবর্ত্তে চম্পতির ভণিতা পাওয়া যায়। যথা,—

পদকল্পতরু—পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিনু বিষাদ না পায়সি লাজে ॥ [৪৮০] ॥

পুথি—পাঁচ ২ গুণ চৌগুণ (দশ) গুণ আট দীগুণ সখি মাঝে।
ভূপতি (পতি) অতি তুয়া গুণে আকুল ইসদ না পায়েবি লাজে ॥ (পৃষ্ঠা ৬০)।

পদকল্পতরু—দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল রতিচিহ্ন দেখি প্রতি-অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়[১] কর্পূর যব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে॥ [৪৮১]॥

পুথি—আনলুঁহুঁ[২] অধিক রোসে তনু জারল রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
ভূপতি কহে কর্পূর পেড় যব না মিলব তবহুঁ মিলব হরিসঙ্গে॥ (পৃঃ ৬০)।

পদকল্পতরু—মেরু-সম মান কোপ সুমেরু-সম দেখি ভেল রেণু সমান।
চম্পতিপতি অব রাই মানাইতে আপ সিধারহ কান॥ [৪৮২]॥

পুথি—মেরু সম মান সুমেরু সম কোপ হাম ভেল রেণু সমান।
ভূপতিনাথ কহে রাধে যব মিলব আপে সিধারহ কান॥ (পৃঃ ৬১)।

অতএব ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চম্পতি আর ভূপতি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তির উপাধি বা পদবী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণনার মধ্যে এক উড়িয়্যাবাসী সিংহেশ্বরের নাম আছে।—

রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর॥

এই 'সিংহেশ্বর'ই কি 'সিংহভূপতি' বা 'রায়-চম্পতি' ?

[৩]

কাব্য-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেই বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হয়। সত্য বটে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, এই দুই মহাকবি মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমরা সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের নামের যে সকল পদের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসকে মহাকবি বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি, তাহার চৌদ্দ-আনা অংশ, হয় মহাপ্রভুর পশ্চাদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি বা কবিগণের রচনা, অথবা তাহা চণ্ডীদাসের প্রাচীন পদের বৈষ্ণব কবিকর্ত্তৃক সংস্কৃত রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক রচনা। ঐ কাব্যের মূল রস, কামশাস্ত্রের বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আদিরস; গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদ্ধতির প্রেমরস নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ প্রকট কামুক; রাধা প্রথমে লজ্জাশীলা কুলবালা ও পরে পরপুরুষানুরক্তা বিগতলজ্জা নারী। মোটামুটি ইহাই চণ্ডীদাসের প্রামাণিক কাব্যের নায়ক-নায়িকার পরিচয়।

১। পৈড়—ডাব (উড়িয়ায় প্রচলিত শব্দ); কর্পূরসংযোগে ডাবের জল বিষ হইয়া উঠে, এই প্রবাদ উড়িয়ায় এখনও প্রচলিত আছে। ভূপতি ওরফে চম্পতি যে দক্ষিণদেশের লোক ছিলেন, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

২। আনলুহুঁ—আনলহুঁ (অনল্ হইতে)।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির (এবং চণ্ডীদাসের) কাব্য-আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কাব্যের স্থূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাহার আস্বাদন তাঁহার সমকালীন ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজন ও কবি-গণকে ঐ কাব্যের মধ্যে অলৌকিক রসান্তরের আভাস বা উদ্দেশ দিয়া গিয়াছে; এবং ঐ অর্থেই বৈষ্ণব মহাজনেরা ঐ বাহ্যতঃ স্থূল আদিরসাত্মক পদগুলি পরম আনন্দে আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরাও এখন পর্য্যন্ত সেই ধারা অনুসরণ করিয়া ঐ পদের আলোচনা ও রসাস্বাদন করিয়া থাকি। অধিকন্তু, চণ্ডীদাসের পদের মত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত অনেকগুলি পদ যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত বা সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কিছু প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাদে) ও বিদ্যাপতির পদাবলীকে বৈষ্ণব সাহিত্যের বহির্ভুক্ত করা চলে কি? বৈষ্ণব মহাজন-রসিকদিগের অনুমত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৈথিল ভাষানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বিদ্যাপতির কবিত্বের খ্যাতি আমাদের দেশে যথেষ্ট কমিয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া গান বাঁধিয়া গিয়াছেন; তাঁহার পরবর্ত্তী কবিরাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তবে এই দুই সাহিত্যের মূলগত পার্থক্য কি, এবং সেই পার্থক্যের কারণই বা কি—এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। প্রাক্-চৈতন্য ও অর্ব্বাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের[১] পার্থক্য ও তাহার কারণ মূলতঃ এই।

(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে রাধা সামান্য নায়িকা মাত্র; পরবর্ত্তী সাহিত্যে রাধার প্রাধান্য কৃষ্ণের প্রাধান্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

(খ) প্রাক্-চৈতন্য সাহিত্যে কৃষ্ণ ঈশ্বর, বিষ্ণুর অবতার; তাঁহার সকল দাবী ঈশ্বরত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী সাহিত্যে কৃষ্ণ পরমপুরুষ, 'সর্ব্বকারণকারণম্'; আর তাঁহার দাবী নয়—প্রার্থনা—শিশুত্বের, বালত্বের, সখ্যের, প্রেমের মধ্য দিয়া। রাধাকৃষ্ণের লীলা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার বিলাসমাত্র না হইয়া জীবশক্তি ও চিৎশক্তির চিরন্তনী লীলার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। সাধক ও ভক্ত এই লীলার সাক্ষী হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। সিদ্ধ হইলে তিনি এই অনাদি অনন্ত লীলার সহায়ক সখী হইয়া যান, এবং লীলার পুষ্টি সাধন করেন।

(গ) শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রই বৈষ্ণব-সাহিত্যের মেরুদণ্ড। বৈষ্ণব-কবিরা অনেকেই আজীবন কুমার ছিলেন; তাঁহারা স্বীয় প্রেয়সীর মুখচ্ছবি ও আচরণের আদর্শে রাধার বর্ণনা ও চরিত্র-অঙ্কন করেন নাই; তাঁহারা রাধাভাবের মূর্ত্তিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গিয়াছেন। এই বিষয়েই এতটুকুমাত্রও কল্পনার আবশ্যক হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে শেষ দ্বাদশবর্ষের আচরণ তাঁহারা শুধু রাধার উপর আরোপ করিয়া দিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হইলে, বাঙ্গালার যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য, তাহার সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য

১। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ সাহিত্যকে (জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি) বৈষ্ণব সাহিত্য বলা চলে না। এই সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণ মোটামুটি নায়ক ও নায়িকার প্রথাগত (conventional) নাম মাত্র। অবশ্য কৃষ্ণকে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধে স্থাপিত; এবং এই ধর্ম্ম কোন দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মত, বা বিশেষ কোনও তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। এই ধর্ম্ম এক অপূর্ব্ব জীবনকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্রভাবে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবির সংখ্যা সুপ্রচুর। প্রধান প্রধান কবিদিগের নাম করিতে গেলে—বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নরোত্তম ঠাকুর, যদুনন্দনদাস, নরহরিদাস (ঘনশ্যাম) ইত্যাদি। এই সকল প্রথমশ্রেণীর কবির মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থান সর্ব্বোচ্চে। গোবিন্দদাস-কবিরাজ-রচিত পদের সংখ্যা চারি শতের উপর। এই পদগুলি সবই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যে যে পদগুলিকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে। বাঙ্গলা পদগুলি প্রায়ই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু, বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলী পদগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় পদরচনা করেন নাই।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ। সকল পদকর্ত্তাই শুধু এই দুইটী বিষয় অবলম্বন করিয়াই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যের বন্দনা এবং লীলা-প্রসঙ্গ, আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা। বৈষ্ণব-কবিদের পরম আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব এই যে, তাঁহারা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে আপনাদিগের কবিত্বশক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাস-কবিরাজ অভিসার, উৎকণ্ঠা ও ভাবোল্লাস বর্ণনায় অতুলনীয়। এমন কি, অভিসার বিষয়ে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সংস্কৃত-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কৃতিত্বকে পরাজিত করিতে পারে। কবিরাজ কৃষ্ণলীলার প্রায় সকল বিষয়েই অত্যুৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন; কেবল বাৎসল্য-ঘটিত পদ তাঁহার নাই বলিলেই হয়। গোষ্ঠলীলার সম্বন্ধে দুই একটী পদ আছে, কিন্তু অন্যান্য পদের অপেক্ষা সেগুলি কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দদাসের নিজকৃত একখানি পদাবলী ছিল। তাহার নাম "গীতামৃত" ছিল কি না, বলা সুকঠিন। রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজকৃত পদাবলী গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন; কারণ—'চম্পকসোনকুসুমকনকাচল' ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"তৎকৃতে গ্রন্থেঽস্য দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগো দৃশ্যতে, কিন্তু পূর্ব্বাপরং গৌরীরাগেন গানং শ্রুতমতো গৌরীরাগো লিখিতঃ" যাহা হউক, সে পুঁথি এখন প্রকট নাই। বর্ত্তমানে কবিরাজের পদগুলি পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত আছে। কবি পদগুলি পারম্পর্য্যক্রমে রচনা করিয়াছিলেন কি না, উপস্থিত জানিবার উপায় নাই।

এখন গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের পদগুলির পারম্পর্য্য অনুসারে ধারাবাহিক

ভাবে পরিচয় দেওয়া যাউক। বলা বাহুল্য, যে নিম্নের আলোচনায় সকল পদগুলিরই আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই।

রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন।—তাঁহার রূপ অঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়, জলদপুঞ্জকে পরাজিত করে এবং জগতের লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে। তাঁহার শীতলচরণ নবারুণ ও কমলদলের ন্যায় রক্তিম; তাহা শরতের অরবিন্দকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছে। তাঁহার গ্রীবা হইতে লম্বিত ভ্রমরগণ-চুম্বিত কেলিকদম্বের মালা অবনি চুম্বন করিতেছে। তরুণ তমালের মত এই পুরুষের অধরসুধাময় যে মুরলীধ্বনি তরঙ্গিণীবৎ উছলিয়া পড়িতেছে তাহাতে রঙ্গিণী গোপীদের হৃদয়রূপ বসন বিগলিত হইয়াড়িতেছে। মত্ত ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার লোল লোচন কর্ণপ্রান্ত-বিলম্বিত উৎপলের দিকে ধাবিত হইতেছে। কপালে তাঁহার সুন্দর তিলক। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ; তাহাকে রমণীদিগের মন মধুকর-মালার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল-কমল-দলারুণ মঞ্জিত-রঞ্জিত-চরণা ॥ [২৪১২] ॥[১]
তনু-তনু-অনুলেপন ঘন-চন্দন-মৃগমদ-কুঙ্কুমপঙ্ক।
অলিকুলচুম্বিত অবনিবিলম্বিত বনি-বনমাল-বিটঙ্ক ॥
অতি-সুকুমার-চরণতল-শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
(রায়-সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত-দাস-গোবিন্দ ॥)[২৪১৫] ॥
অধর-সুধা-ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি বিগলিত-রঙ্গিণি-হৃদয়-দুকূল।
মাতল-নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল ॥
রোচন তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক বেড়ল রমণি-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাসচিতে নিতি নিতি বিহরই ইহ নাগরবর তরুণ-তমাল ॥
[২৪২৪] ॥

কৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধার মনের শান্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছেন। মেঘ দেখিলে কৃষ্ণের স্মৃতি হইতেছে, চক্ষুতে জল ভরিয়া আসিতেছে। রাধা বিজনে তরুণ তমালকে আলিঙ্গন করিতেছেন [৩৯]।

রাধা সম্পূর্ণরূপে শ্যামময় হইয়া গিয়াছেন। চক্ষে তাঁহার শ্যামকজ্জল, মুখে তাঁহার শ্যাম-নাম, অঙ্গে তাঁহার শ্যাম শাটী। শ্যাম তাঁহার বক্ষের হার, হৃদয়ের মণি। শ্যামবর্ণা সখীকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্যাম তাঁহার মর্ম্মে লাগিয়াছে। পরিজন নিঠুর। রাধার মুখ ম্লান পদ্মের মত দেখিতে হইয়াছে। অবিরল অশ্রুধারায় কজ্জল ধুইয়া যাইতেছে। নয়নে ঘুম নাই।

১। [ ] বন্ধনী-মধ্যস্থ সংখ্যাগুলি পদকল্পতরুর পদসংখ্যা সূচিত করিতেছে।

লোচনে শ্যামর বচনহি শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর শ্যামর-সখি করু কোর॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর-ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচননিন্দ॥

বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণ কি ভুলিয়া আছেন? কবি গোবিন্দদাস আর কতক্ষণ রাধাকে আশ্বাস দিয়া রাখিবেন?

মনমথ সাগর রজনি উজাগর নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ [৪০]॥

কৃষ্ণও রাধাকে দৃগ্‌গোচর করিয়াছেন। রাধার লাবণ্যের তো বর্ণনা হয় না। তাঁহার মুখশ্রী শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডলের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে। তাঁহার অধরে মৃদুহাস্য উঠিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। কবরীতে বকুলফুলের মালা বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাতে আকুল অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। রাধার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে, এবং বাহুর কঙ্কণ ও কটির কিঙ্কিণি মৃদু মৃদু শিঞ্জিত হইতেছে। পদপঙ্কজের উপর মণিময় নূপুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। রাধার পদনখ কামদেবের দর্পণস্বরূপ; কবি গোবিন্দদাস তাহার বালাই লইতেছেন।

শরদসুধাকরমণ্ডলমণ্ডনখণ্ডন বদনবিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যামমনোহরচিতচোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যামবিনোদিনি রাই।
তনু-তনু অতনুযূথশতসেবিত লাবণি বরণি না যাই॥ ধ্রু॥
কবরি-বকুলফুলে আকুল-অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ।
মদনমুকুর জনু নখমণিদরপণ নীছনি গোবিন্দদাস॥ [২৪৬৩]॥

বস্ত্রের ভিতর হইতে রাধার অঙ্গদ্যুতি ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় আভাসিত হইতেছে। রাধা থামিয়া থামিয়া চলিতেছেন, আর তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে যেন একটী একটী করিয়া স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। সখীদিগের সহিত রাধা কথা কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রভঙ্গীতে যেন যমুনার তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। রাধার তরল-নয়নের দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়িতেছে সেখানে সেখানে নীলপদ্মের বন ভরিয়া উঠিতেছে। রাধার হাস্যে কুন্দ ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। রাধার এই অপূর্ব্ব শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে যেন চিনিয়াও চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ-চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই॥

দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাহাঁ যাহাঁ ভঙ্গুর ভাঙ-বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি-হিলোল॥
যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নীল-উতপল বন ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান॥ [৮৬]॥

কবি এই পদটী বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত পদের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন।—

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ। তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস। তহিঁ তহিঁ কমল প্রকাস॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ। ততহিঁ মদনসর লাখ॥

এই স্থলে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয়ও ঐ পদটীর মধ্যে যে দিয়া গিয়াছেন তাহা পদ দুইটী তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

রাধার অনুরাগ গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। আর বুঝি সখীগণের নিকট হইতে গোপন রাখা যায় না। প্রস্ফুটিত কদম্ব দেখিলে রাধার দীর্ঘনিশ্বাস স্বতঃই ফুলিয়া উঠে। অঙ্গে সর্ব্বদা পুলকোদ্গম হইতেছে। করতলে বদন রাখিয়া রাধা সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন। চোখের জল অতি কষ্টে নিবারণ করিতে হয়। কথাও ভাল করিয়া কহিতে পারেন না। তুচ্ছ ছল করিয়া রাধা একবার ঘর আর একবার বাহির করিতেছেন। ইহা হইতে সখী আন্দাজ করিয়াছে, যে রাধা শ্যামচন্দ্রকে দেখিয়াছেন।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল-পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জানলু ভেটলি শ্যামর-চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গুপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥

আনছলে অঙ্গন আনছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত ॥ [৭০] ॥

রাধা যখন দেখিলেন যে সখীর নিকট আর মনোভাব গোপন রাখা চলে না, তখন স্বীকার করিলেন, যে তিনি পথে যাইতে কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। আর সেই হইতেই তাঁহার এই অবস্থা।

সজনি যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম-শর নয়নে না হেরিয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন-বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয়দলে করু দংশ ॥
অতয়ে সে মঝুমন জ্বলতহি অনুখন দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল অবহুঁ না মীলল কান ॥—[৭৩] ॥

রাধাকে আশ্বাস দিবার জন্য সখী কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। রাধা নিষেধ করিলেন। রাধা কৃষ্ণকে এখনও ভাল করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তাহাতেই প্রাণ থাকে কি যায়, তাহার স্থিরতা নাই। ধন্য সেই রমণী, যিনি কৃষ্ণকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। কৃষ্ণকে সখী ঘনশ্যাম বলে, কিন্তু রাধার নয়ন তাহ তো বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসাইয়া দেয়। প্রেমিকা না কি প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করিতে পারে। রাধার কিন্তু এখনও চপল জীবনে সাধ আছে। অতএব কৃষ্ণের কথা উত্থাপন না করাই ভাল।

আধক আধ আধ-দিঠি-অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যে হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জলু আগি ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি-রস-মরিযাদ ॥—[২৩৪] ॥

রাধা সহচরীগণের সহিত কালিন্দীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন। দিবাকর-কিরণে ম্লান কাঞ্চন শিরীষকুসুমের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি কৃষ্ণের চিত্ত চুরি করিয়া লইল। রাধা চঞ্চল নয়ন-কোণে কৃষ্ণকে কটাক্ষ করিয়া মন চুরি করিবার সুনিপুণ প্রণালী দেখাইলেন। যমুনার বেলাভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে রাধা কোমল চরণ অতি ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন। রাধার কষ্ট দর্শনে কৃষ্ণের নয়ন সজল হইল। রাধা সেই সজল নয়নপঙ্কজ দুইটী পাদুকা করিয়া লইলেন। নয়ন মন দুইই হারাইয়া কৃষ্ণ একেবারে রিক্ত হইয়া পড়িলেন।

সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণি কালিন্দি করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ-কুসুম জনু তনুরুচি দিনকর-কিরণে মৈলান ॥

সজনি সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর ॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক-বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি নেল ॥
চীত নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ-পাপ-দহনে তনু জারত গোবিন্দদাস ভালে জান ॥—[২০৪] ॥

রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের মিলনোৎকণ্ঠা দেখিয়া সখী তাঁহাদের মিলনসাধনে যত্নবতী হইলেন। রাধার নিকট দূতী কৃষ্ণের বিরহ-ব্যথার বর্ণনা করিতেছে। কৃষ্ণ রাধার বিরহে ক্ষীণতনু ও জর্জ্জরিত হইয়াছেন। চন্দ্রের কিরণ তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অভিসারের আশায় তিনি রাগিণী মেঘমল্লার আলাপ করেন, তাহাতে আকাশে মেঘ আসে, কিন্তু তাঁহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহা উড়িয়া যায়। ধবল বসনের ভারও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। রাধার নিকট আসিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। রাধার নাম ও গুণগ্রাম জপিতে জপিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, এবং তাহা করিয়াই তিনি কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিয়া আছেন।

চান্দ নিহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই কৈছে করব অভিসার ॥
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির-পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত উতপত দীঘ নিশাসে ॥
তুয়া গুণ-নাম-গাম জপি জীবই বহু পুলকয়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ যাহাঁ ইহ নব নব নেহা ॥—[২১৮] ॥

কৃষ্ণ বেতসকুঞ্জ-গৃহে বসিয়া আছেন। তিনি একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, এবং একবার পথ দেখিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণ রাধার নিবিড় বিরহ-দহনে দহিতেছেন। তাঁহাকে এখনও রাধার অবিশ্বাস করা উচিত হয় না।

কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত পন্থ হেরত তোর।
অমল-কমল-নয়ন-যুগল সঘনে গলয়ে লোর ॥
এতহুঁ যতনে পুরুষ-রতনে চিতে নাহি বিশোয়াস।
গহন-বিরহ দহনে দহই কহই গোবিন্দদাস ॥–[২১৭] ॥

কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার্থ রাধা অগত্যা চলিলেন। রাধা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রগুপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চকিতনয়নে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। ইহাতে সখী রহস্য করিয়া রাধাকে বলিতেছে,—তুমি বলিতেছ, যে আমার কথাতেই তুমি কৃষ্ণের নিকট যাইতেছ। তোমার এই কথার ছাঁদ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বঞ্চনা করিলে তোমার কি ফল হইবে? তোমার ব্যবহারে বুঝিতেছি যে, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধন অন্তরে সঞ্চিত করিয়া গোপনে চলিয়াছ। কিন্তু তোমার হাস্য, তোমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে। এত দিনে স্বচক্ষে দেখিলাম, যে চোরের অঞ্চলের গ্রন্থিতে চুরিকরা ধন থাকিলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা ধরা যায়। আর তুমি এই গোপন-ধন লইয়া এতই আকুল হইয়াছ যে

পথও ভাল করিয়া নজর করিতেছ না।—রাধা উত্তর দিবার উপক্রম করিলে সখীস্থানীয় পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস তাঁহাকে বলিতেছেন,– তুমি থাম, তোমার এতক্ষণ মৌনভাব হইতেই সব ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছি।

চৌদিক চকিত-নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম-সুনাগর-গুপত-প্রেমধন জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি।
এ তুয়া হাস মরম পরকাশই প্রতি-অঙ্গভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি ॥*
গহন-মনোরথে পন্থ না হেরসি জীতলি মনমথরাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ মৌনহিঁ সমুঝলুঁ কাজ ॥—[২২৭] ॥

রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিলেন। চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা রাধা সখীর আঁচল ধরিয়া কোনও প্রকারে পর্য্যঙ্কে বসা না-বসার মত করিয়া বসিলেন। সখী প্রস্থানোদ্যতা হইলে রাধাও উঠিতে চাহিলেন। বাধা দিয়া কৃষ্ণ রাধার হাত ধরিতে গেলে রাধা হাত ঠেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণ রাধার মুখের প্রতি চাহিতে রাধার নয়নে জল ভরিয়া উঠিল। * * * রাধার এই অপরূপ সারল্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৃষ্ণের বাসনা ডুবিয়া গেল।

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচঙ্ক। বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক ॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস-অভিলাষে আগোরল নাহ ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী। ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি ॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই। হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই ॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ। চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ ॥
শূতলি ভীত-পুতলি সম গোরি। চীত-নলিনি হরি রহই আগোরি ॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম। রূপকে কূপে মগন ভেল কাম ॥ [১০০] ॥

রাধার লজ্জা ও সাধ্বস দেখিয়া সখী ভৎর্সনা করিতেছে। যদি হরির পাণিস্পর্শে তুমি এতই কাঁপিবে এবং অঙ্গের সংবৃত্ত বসনকে আরও সংবরণ করিবে, তাহা হইলে তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে অত বেশ প্রসাধনের রঙ্গ করিলে কেন? তুমি নিজের কার্য্য বুঝিতেছ না? যাহার বিরহে তুমি জাগিয়া ও ঘুমাইয়াও স্বস্তি পাও না, তাহাকে কি এত লজ্জা ও ভয় করিতে আছে?

যব হরি-পাণি-পরশে ঘন কাঁপসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময়-অভরণ বেশ-পসায়নি রঙ্গ ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ ॥ (২৩৬)

এই রাধা ও মাধবের প্রথম মিলন এখনও পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণের অনুনয়ে রাধা

---

* তুলনীয় জ্ঞানদাস—আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে।
মরমে পিরিত বেকত অঙ্গে ।[৬৭৩—]।

অবনতমুখে পদনখে মাটি খুঁটিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া রাধার অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলেন, রাধা অমনি আধ পা পিছাইয়া গেলেন। বিদগ্ধ মাধব রাধার মন বুঝিয়া চরণ স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইলেন। রাধা নিবারণ করিতে গেলে কৃষ্ণের হাতে তাঁহার হাত ঠেকিয়া গেল। পাণিস্পর্শে প্রেমের সঞ্চার হইল। রাধা ঈষৎ হাসিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পহিলহি রাধা-মাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী। চকিত-বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল পদ-আধ পয়ান॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি। দেই রতন পুন লেয়লি চোরি॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥—[৫২]॥

বসন্তকাল, শুক্লপক্ষের রজনী; রাধা কৃষ্ণের অভিসারে চলিয়াছেন। রাধার কবরীতে কুন্দকুসুম, হৃদয়ে মুক্তার মালা, অঙ্গে কর্পূর ও চন্দনের বিলেপন; ধবল বস্ত্র পরিধান। এইরূপ শ্বেত বসন ভূষণে মণ্ডিতা রাধাকে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণের মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যায় না। গৃহের পরিজনের দৃষ্টি এইরূপে এড়াইয়া রাধা নিকুঞ্জে চলিয়াছেন।

কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর॥
ধবল-বিভূষণ-অম্বর বনই। ধবলিম-কৌমুদি মিলি তনু চলই॥
হেরইতে পরিজন-লোচন ভুল। রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহ বুর॥—[৩০৫]॥

রাধা কৃষ্ণের অপেক্ষায় কুঞ্জগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া সখী তাঁহার নিকট গিয়া বলিতেছেন।—মাধব, মন্মথ শিকারে ফিরিতেছে। রাধা তাহার লক্ষ্য। মদনের শরাঘাতে জরজর হইয়া রাধা একেলা নিকুঞ্জে রহিয়াছে। তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে বাঁচাও। বসন্তের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অনেক দূর যাইতে হইবে। রাধা গলায় আশা-পাশ লইয়া প্রেমকল্পতরুর মূলে বসিয়া আছে। তাহার ফল অমৃত হইবে, কি গরল হইবে, তাহা তোমার যাওয়া না-যাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। (অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলেই রাধার আশা-পাশ গলার মালা হইয়া দাঁড়াইবে, নতুবা তাহা গলার ফাঁস হইয়া তাহার প্রাণবিনাশেরই হেতু হইবে)।

মাধব মন্মথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তেরা॥

*   *   *   *

তুহু অতি মন্থর গমন দুরন্তর মধু-যামিনি অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি॥
আশাপাশ লেই গলে বৈঠলি প্রেমকলপতরু মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে ধরব গরল ফল গোবিন্দদাস কহ স্কুর॥—[৩১৮]॥

পৌষ মাসের রাত্রি, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে; তুষারে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গৃহে থাকিয়াও সকলে কাঁপিতেছে। সকল লোকই শয্যায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন করিয়াছে। পরম বিস্ময়ের বিষয় যে, রাধা এমন সময়ে অভিসারে বাহির হইয়াছে। সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্বেত-বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সকলের অলক্ষিতে তিনি কুঞ্জে চলিয়াছেন। তুহিনের শীতস্পর্শ ও পথের কণ্টকাদির প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কবি বলিতেছেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নূতন প্রেমের নিকট কি কোন বাধা টিকিতে পারে?

পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ। চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ। জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ। উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই। চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘিন যাহা নূতন নেহ॥—[৩২৬]॥

রাধা কুঞ্জে কৃষ্ণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন; এ দিকে সখী আসিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছে।—শীতের রাত্রি; যমুনার তীরে কুঞ্জকুটীর-লতাগুলি শীতল-পবনে আন্দোলিত হইতেছে। সেই তুষার-সমীরে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। রাধা সেখানে আর কতক্ষণ একেলা কাটাইবেন? মাধব, তোমার প্রেম ধন্য; আর রাধাও ধন্য যে, কুলগৌরব-রূপ কঠিন কপাট উদ্ঘাটন করিয়া, গুরুজনদিগের সতর্ক নয়নরূপ কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া এইরূপ সময়ে তোমার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে।

হিম-ঋতু-যামিনী যামুন-তীর। তরল-লতা-কুল-কুঞ্জ-কুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিনসমীর। কৈছে বঞ্চব শুন শ্যামশরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ। ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গেহ॥
কুলবতি-গৌরব-কঠিন-কপাট। গুরুজন-নয়ন-সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই। ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥—[৩৩৭]।

কুঞ্জে কৃষ্ণের অপেক্ষায় বহুক্ষণ থাকিয়া রাধা অধীর হইয়া সখীকে বলিতেছেন।—কতক্ষণ আমি আর দুর্জ্জন-নয়নরূপ প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া, প্রেমধন হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিব? পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন ধাঁধিয়া গেল। রজনী শেষ হইয়া আসিল; অনুরাগ তো বাড়িয়াই চলিয়াছে; কৃষ্ণ এখনও আসিলেন না। কবি বলিতেছেন,—আমার প্রভুর দিগ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়-মাহা সাচি। দুরজন নয়ন-পহরি কত বাঁচি॥
পন্থ নেহারি নয়ন-লয় লাগি। টুটত রজনী বাঢ়ত অনুরাগী॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামর-কাঁতি। গোবিন্দদাস-পহু দীগভরাঁতি॥—[৩৬২]॥

অন্যাসক্ত মনে করিয়া রাধা কৃষ্ণকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন; পরে অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন।—কুলবতী কেহ যেন পরপুরুষকে নয়নের কোণেও না দেখে; আর যদি দেখে তো কৃষ্ণকে যেন কিছুতেই না দেখে। কৃষ্ণকে যদি দেখিতেই হয়,

তবে যেন তাঁহার সহিত প্রেম না করে। আর যদি প্রেম করিয়া ফেলে, তবে যেন মানিনী না হয়।

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই প্রেম করই জনি মান ॥—[৪৩৪] ॥

রাধার এই অনুতাপ শ্রবণ করিয়া সখী বলিতেছেন।—কৃষ্ণের মুরলীরব শুনিবার সময় আমি তোমার কর্ণদ্বয় রোধ করিয়াছিলাম; কৃষ্ণকে দেখিবার সময় আমি তোমার চক্ষু ঢাকা দিয়াছিলাম,—তুমি ভ্রমে পড়িয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল করিয়া কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিতেছ; ইহার ফলে তোমাকে কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণের পরিচয় না লইয়া কেন তুমি পরপুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের দেহ সমর্পণ করিলে? ইহার জন্য তুমি দিন দিন তোমার রূপলাবণ্য খোয়াইতেছ; তোমার এখন বাঁচাই সংশয়। শ্যাম (রূপ) মেঘের জল প্রত্যাশা করিয়া তুমি তোমার হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছ, কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সেই বৃক্ষে এখন তোমাকে নয়ননীর সেচন করিতে হইবে।

শুনইতে কানু-মুরলি-রব-মাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি জনম গোঁয়ায়বি রোয় ॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ-লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন-নীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে ॥—[৪৩৫] ॥

ইহার সহিত অমরুশতকের এই শ্লোকটীর মর্ম্মগত সাদৃশ্য আছে।—

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়া কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাস্বরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারান্ তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥

রাধা মানিনী হইয়াছেন। কৃষ্ণ অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, রাধা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে রাধার জ্ঞান হইল। তখন আর উপায় নাই; তিনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন শুধু তিনি কৃষ্ণের দর্শনের কাঙ্গাল।

সো বহুবল্লভ সহজই দুর্ল্লভ দরশন লাগি মন ঝূর।
(গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব তবহিঁ মনোরথ পুর ॥)—[৪৩৬] ॥

সখীও ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন।—খল লোকের কথায় তুমি অবিচার করিয়া কৃষ্ণের প্রতি মান করিয়াছ। কৃষ্ণ রোষে বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর আমার মুখের দিকে কাতর হইয়া চাহিলে কি হইবে?

কহলম খলজন দোখল কান। তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়সি মান॥
রোখে বিমুখ যব চলু বরনাহ। অব কাতরদিঠে মঝু মুখ চাহ॥—[৪৩৭]॥

বর্ষা কাল, রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন। আকাশে নূতন মেঘ ঘনঘটা করিয়া আসিয়াছে। গৃহের বাহিরে অন্ধকার এমন নিবিড় যে, নিজ দেহও দেখা যায় না। রাধার অন্ধকারে কিছু আসিয়া যায় না; তাঁহার অন্তরে শ্যামচন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এই তো প্রথম অভিসারের উপযুক্ত লগ্ন। সখীদিগের আর বিচার করা উচিত নয়। তাহারা রাধার অঙ্গে মৃগমদ লেপন করিয়া নীলবসন পরাইয়া দিল। কাঁচুলির আবশ্যক কি? সে তো অনাবশ্যক ভারমাত্র। মুক্তার হার সপত্নীতুল্য, অতএব পরিত্যাজ্য। এক সখী দ্বারদেশ হইতে দেখিয়া আসুক, গুরুজনসকল জাগিয়া আছে, কি ঘুমাইতেছে। পথে যাহাতে দিক্‌ভ্রম না হয়, সেই জন্য সখীস্থানীয় কবি গোবিন্দদাস গোপনে সঙ্গে চলিলেন।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ। বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর-ইন্দু। উছলল মনহিঁ মনোভবসিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার। শুভখন ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর। তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচকুচকঞ্চুক ভার। দূর কর সৌতিনি মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি। গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগভরম জনি হোয়। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥—[৩৪২]॥

রাধা কুঞ্জগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের আসিতে কিছু দেরী হইয়াছে, সেই জন্য রাধা মান করিয়া কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিলেন। সখী কৃষ্ণের হইয়া রাধাকে বলিতেছে।—তুমি গরবিনী হইয়া বাসগৃহে রহিয়াছ, ওদিকে কৃষ্ণ শ্রাবণ-মেঘের বর্ষণ মাথায় করিয়া আসিল। তুমি সুখময় পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছ; আর কৃষ্ণ প্রান্তর পঙ্ক উত্তীর্ণ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। সখী, অস্থানে মান করিও না; তোমার বহুপুণ্যের ফলে তুমি রসিকশেখর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছ। এখন রাত্রি ঘোর হইয়াছে; বিজলী চমকাইতেছে। এমন সময়ে কামিনী কি কান্তের ক্রোড় ত্যাগ করিতে পারে? আকাশের মধ্যে ঘন ঘন মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে; কোন রমণী এমন সময়ে নাথকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তুহুঁ রহ গরবিনী বাসক গেহ। সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শূতলি সুখময় পরিযঙ্ক। সো তরি আওল পাঁতর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান। পুনফলে মীলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর। কামিনি কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন-গরজন অম্বর-মাহ। বরজত কোনে এ হেন বর-নাহ॥—[৫৪৮]॥

প্রার্থনা-চাটুকার কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন।—মন্মথ-মকরের ত্রাসে আমার মানস-মৎস্য তোমার হার-তটিনীর তীরস্থ কুচকুম্ভে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। এ আমার অতীব দুর্দৈব যে, তুমি সেই কলসীর মৎস্যকে বড়শী-বিদ্ধ করিতে চাহিতেছ।

মনমথমকর-ডরহি ডরকাতর মঝু মানস-ঝষ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হারতটিনি-তট-কুচঘট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি সম্বরু কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি কিয়ে ডারসি এ অতি কঠিন বিপাক ॥—[৬২৩] ॥

বৃন্দাবনের বনে মদন-কিরাতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে। তাহার দারুণ কুসুম-শর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ পুরুষোচিত গৌরব ও লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া রাধার শরণাপন্ন হইলেন। ফলে বিপরীত হইল। মদন-কিরাতকে দমন করিবার জন্য প্রযুক্ত রাধার চঞ্চল নয়নবাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কৃষ্ণের মর্ম্মে আঘাত করিল। এখন রাধা ও মদন, এই উভয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের জীবন সংশয়ারূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এখন কবি উপদেশ দিতেছেন,—

মণিময়-হার-তরঙ্গিণি-তীরহি কুচ-কনকাচলছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দদাস যশ গায় ঃ—[২য় খণ্ড, পৃঃ ৭]

লীলাদুর্ল্ললিত বহুবল্লভ কৃষ্ণকে রাধা আপনার প্রেমপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া সখী রাধাকে কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন।—তুমি তো কম নহ।—

যো গিরি-গোচর-বিপিনহি সঞ্চরু কৃশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক-চারু-শটা-পরিমণ্ডিত অরুণ-কুটিল-দিঠি চাহ ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণি-নয়ানি।
সো চঞ্চল-হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সয়ানি ॥—[৭০৬] ॥

এই পদটী কৃষ্ণ ও সিংহপক্ষে দ্ব্যর্থ। [হরি—(১) কৃষ্ণ, (২) সিংহ ; কৃশকটি—(১) পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য, (২) সিংহের বিশেষত্ব ; ইত্যাদি]।

রাধা বলিতেছেন।—আমার রূপে বা গুণে কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা ভুল। আমার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহা কৃষ্ণেরই দান। তাঁহার প্রেমই আমাকে মর্য্যাদা দিয়াছে। কৃষ্ণ দক্ষ স্বর্ণকার ; বেণুর নিঃস্বনে তিনি আমার হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছেন ; আমার কুলমর্য্যাদা সেই প্রেমাগ্নির ইন্ধন হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি ও হস্ত উভয়ের স্পর্শই সোহাগা ; ঘর্ম্মজলই জুড়িবার (পান দিবার) বারি। এই উপায়ে তিনি আমার মনরূপ স্বর্ণে নিজ প্রেমরূপ মণি খচিত করিয়া এই অমূল্য হার গড়িয়া আমাকে পরাইয়া দিয়াছেন। সেই হারের পালিশ হইয়াছে নবানুরাগ। সেই মণিহার আমি গুরুজননয়নরূপ তস্করের নিকট হইতে লক্ষ প্রাণের মত গোপন করিয়া রাখিয়াছি।

বেণুক ফুঁকে বুকে মদনানল কুল-ইন্ধন মাহা জারি
দরশ পাণি ছুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রম-জল জোরণ বারি ॥
সজনি, কানু সে ছৈল সোণার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি জোরি পিন্ধায়ল হার ॥
নব-অনুরাগ-রঙ্গে পুন রঞ্জল মুল না জানয়ে কোই।
গুরুজননয়নচোর পয়ে ছাপিয়ে প্রাণ-লাখ সম গোই ॥—[৭০৭] ॥

প্রেমের আনন্দ প্রাপ্তির সুখের অপেক্ষা অনেক গভীর। কৃষ্ণের আলিঙ্গনে ধরা দিয়াও রাধার ভ্রান্তি রহিয়া গেল যে, কৃষ্ণকে তিনি পান নাই। প্রেম এইরূপই বিচারমূঢ়।

কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত কব মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহি মঝু মীটব অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরি বঙ্ক নেহারই সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস-পরশ যব পাওব তবহিঁ মনোরথ পূর॥—[৭৬৫]॥

মিলনের নিবিড় সুখ রাধার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। লোচনে পলক ও আনন্দের অশ্রু রাধাকে কৃষ্ণের বদন ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে দেয় না। একে ত গুরুজনের সতর্ক-দৃষ্টির জন্য কৃষ্ণকে দেখিবার সুযোগ তো ঘটিয়াই উঠে না।

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল কৈছে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু-দুরুজন-লোচন-কণ্টক-সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ-বিবাদ করত কত ধৈরজ-লাজ-বিচার॥

তুলনা করুন,— অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥—[মেঘদূত]॥

অতএব রাধা ঠিক করিলেন,—

সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি-দিবস সুখে হেরব এহি দঢ়ায়লুঁ সার॥—[৭৭৯]॥

রাধার বিপদ্ হইয়াছে; কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গীণ মাধুর্য্য কৃষ্ণকে সর্ব্বদাই রাধার মনে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণের নবনব-গুণসমূহ কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে; তাঁহার রূপ নয়নের রসায়ন স্বরূপ; তাঁহার মিলনকালীন সম্ভাষণ হৃদয়কে আপ্যায়িত করে; তাঁহার সঙ্গ স্পর্শকে অমৃতসিক্ত করিয়া দেয়।[১] সখি, যাঁহার অন্তর রসময়, এমন গুণগণসাগর শ্যাম সুনাগরকে কোন্ রমণী ভুলিতে পারে? সত্য বটে, গুরুজন আমাকে তর্জ্জন করে, কুলবতীরা আমাকে গালি দেয়; কিন্তু মধুর মুরলীর মধুর আশ্বাসে আমি এই সকল কষ্ট একেবারে ভুলিয়া যাই। কুলমর্য্যাদা লইয়া আমি কি করিব? তাহা তো দিবাদীপ-তুল্য বিড়ম্বনা মাত্র, প্রেম-পবনে নির্ব্বাপিতপ্রায়।

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস-সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥

১। কবি অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর-মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আন পরসঙ্গ।—[৭৯৪]॥

এ সখি রসময় অন্তর যার।
শ্যাম-সুনাগর গুণগণ-সাগর কো ধনি বিছুরই পার॥
গুরুজন-গঞ্জন গৃহপতি-তরজন কুলবতি-কুবচন-ভাষ।
যত পরমাদ সবহুঁ পুন মেটই মধুর-মুরলি-আশোয়াস॥
কিয়ে করব কুল দিবসদীপ-তুল প্রেমপবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোর॥—[৯০২]॥

তুলনা করুন,—

কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কানে।
কৃষ্ণনাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে॥ ইত্যাদি॥—[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত]॥

অনুরাগের তীব্রতায় রাধা অভিসারে বাহির হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। সখী নানা প্রকার ছল তুলিয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছে। গৃহের দ্বার কপাটরুদ্ধ; বাহিরে বাদল ঝরিতেছে— সে জল নীলনিচোলে নিবারিত হইবে না। পথ পঙ্কিল ও বন্ধুর। বিদ্যুতের আলো চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে; বজ্রনিনাদে কর্ণের মর্ম্ম জ্বলিয়া যায়। আর হরিও আছেন সুদূরে—মানস-সুরধুনীর পারে। শুধু প্রেমের জন্য কি গৃহত্যাগ করিয়া এইরূপ বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দেহকে উপেক্ষা করা উচিত?

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহিঁ অতি দূরতর বাদল দোল। বারি কি বারই নীল-নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার। হরি রহ মানস-সুরধুনি পার॥
ঘন ঘন ঝনঝন বজর-নিপাত। শুনইতে শ্রবণ-মরম জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনি দহন বিথার। হেরইতে উচকই লোচন-তার॥
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥ [৯৮৭]॥

রাধা ইহার উত্তরে সখীকে বলিতেছেন।—কুলমর্য্যাদারূপ কপাট আমি হেলায় উদ্ঘাটন করিয়াছি; কাঠের কপাট কি এখন আমায় ঠেকাইতে পারিবে? আত্মমর্য্যাদারূপ সাগর পার হইয়াছি; ক্ষুদ্র নদী কি আমার নিকট এখন দুস্তর হইবে? সখী, আমাকে আর নিষ্ঠুর ভাবে পরীক্ষা করিও না। আমার আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণ পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন,—এই কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় অশ্রুপাত করিতেছে। আমার উপর মদনের কোটি কোটি শর পড়িতেছে; তুচ্ছ মেঘের জলে আমার কি হইবে? যাহার অন্তর প্রেমের তুষানল সহ্য করিতেছে, বজ্রাগ্নিকে কি সে কখনও ভয় করে? আর দেহের কথা বলিতেছ? যাঁহার পদতলে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, এখন তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া কি আমাকে শরীর রক্ষা করিতে হইবে?

কুল-মরিযাদ-কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ-মরিযাদ-সিন্ধু সঞে পঙরলু তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
যৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥

কোটি কুসুম-শর বরিখয়ে যছু পর তাহে কি জলদ-জল লাগি।
প্রেম-দহন-দহ যাক হৃদয় সহ তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলুঁ তাহে কি তনু-অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর সহচরি পাওল বোধ॥—[৯৮৮]॥

উপরোক্ত পদ দুইটির সহিত এই শ্লোকটি তুলনীয়—

"ছিদ্রান্বেষণতৎপরঃ প্রিয়সখি প্রায়েণ লোকোঽধুনা
রাত্রিশ্চাপি ঘনান্ধকারবহুলা গন্তুং ন তে যুজ্যতে।"
"মা মৈবং সখি বল্লভঃ প্রিয়তমস্তস্যোৎসুকা দর্শনে
যুক্তাযুক্তবিচারণা যদি ভবেৎ স্নেহায় দত্তং জলম্॥"
[শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, ৩৬১৯]॥

কৃষ্ণ রাস করিবেন। শারদ-পূর্ণিমার চন্দ্রিকায় চারি দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে। বৃন্দাবনের বনে মল্লিকা মালতী যূথী প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে ভ্রমর-গণকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। রজনী এইরূপ মধুর দেখিয়া কৃষ্ণ বংশীধ্বনি আরম্ভ করিলেন। বংশীধ্বনিতে কৃষ্ণের আহ্বান শুনিয়া গোপীরা স্রস্তবস্ত্রে ত্রস্তপদে কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসিল।

শরদ-চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথি মত্ত-মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি শ্যামমোহন মদনে মাতি
মুরলিগান পঞ্চম-তান কুলবতি-চিত চোরনি॥—[১২৫৫]॥[১]

রাসমণ্ডলীতে নটরাজ কৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিলে ভ্রম হয়, যেন প্রাচীমূলে নয়নাভি-রাম নূতন মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে। কবির মনে সেই সন্দেহ জাগিয়াছে। ও তো কৃষ্ণ নয়, কালো মেঘ; চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ কি? —না, উহা ইন্দ্রধনু। মালতীর মালা বলিয়া যাহা ভ্রম হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই বকপঙ্‌ক্তি। উহা তো কপাল নয়, মেঘাবৃত শশাঙ্ক-লেখা। ও দুটি কি বাহুদণ্ড? না—উহা দিগ্‌বারণের কর। অরুণের আভাস করকিসলয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। চাতকের রব বংশীধ্বনির মত শুনাইতেছে। অমৃতবর্ষণ হাস্যের মত বোধ হইতেছে। উহা হার নয়, তারার দ্যুতিমালা। স্থলপদ্মের রাগ পদতলের রক্তিমার ন্যায় দেখাইতেছে। যাহা নূপুর বলিয়া মনে হইতেছে, উহা কলহংসমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুরপতিধনু কি শিখণ্ডকচূড়ে। মালতিঝুরি কি বলাকিনি উড়ে॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু-আধ-খণ্ড। করিবরকর কিয়ে ও ভুজদণ্ড॥
ও কি শ্যাম নটরাজ। জলদকল্পতরু তরুণি-সমাজ॥
কর-কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ। মুরলি খুরলি কিয়ে চাতক-ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া-মকরন্দ। হার কি তারকদ্যোতিক ছন্দ॥

১। রাসের সম্বন্ধীয় পদগুলিতে গোবিন্দদাস শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াছেন।

পদতলে কি থলকমল-ঘনরাগ। তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥—[১০৫০]॥

রাধা গোপীদিগের সহিত দধিদুগ্ধের পসরা লইয়া মথুরার হাটে যাইতেছেন। কৃষ্ণ মহাদানী সাজিয়া পথ অবরোধ করিলেন। কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন। -তুমি বার বার আমাকে বঞ্চনা করিয়া জিনিষ লুকাইয়া দান এড়াইয়া যাও। তুমি তোমার কেশ-ভারে চামরকান্তি অপহরণ করিয়াছ; দন্তে মুক্তাপঙক্তি লুকাইয়া রাখিয়াছ; অধরে রক্ত-প্রবাল গোপন করিয়া রাখিয়াছ; তুমি বর্ণে কুঙ্কুমরাশিকে চুরি করিয়াছ: আর দুইটী কনক-কলসে রস ভরিয়া বুকের মধ্যে কাপড় ঢাকিয়া চুরি করিয়া রাখিয়াছ—সে কারণ তোমার গতি মন্থর। বিনা বিচারে তোমাকে কে ছাড়িয়া দিবে?

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ গজগামিনি তো বড়ি সেয়ান। বলে ছলে বাঁচসি গিরিবরদান॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার। বরণে চোরায়সি কুঙ্কুমভার॥
কনয়া কলস দউ রস ভরি লেই। হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই॥
তেঞি অতি মন্থর গমনসঁচার। কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার॥[১৩৭৩]॥

মথুরা হইতে জানি না, কে এক জন আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া রাধার অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। সখী সকল ব্যাপার জানিয়া আসিয়াছে, কিন্তু রাধার নিকট তাহা ভাঙ্গিতে সাহস হইতেছে না। রাধা নিজ দেহ ও মনের, এবং সখীর মনোভাব হইতে সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন। চক্ষু দুইটী তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া আসিতেছে; অন্তরের ব্যাকুলতা বর্ণনা করা যায় না। সখী, গোপন রাখিয়া কি করিবে? করতল দ্বারা কি উদ্যত বজ্র নিবারিত হয়? সখী, তোমার মৌনভাবের কারণ জানিলাম,—প্রিয় আমাকে ছাড়িয়া প্রবাসে চলিলেন। যাহা হউক, তাঁহার গমনের সময় তোমরা যেন 'না না' বলিয়া অমঙ্গল করিও না। বৃথা আশায় কাল হরণ করিয়া আর কি ফল? দমনই এখন প্রেমের উপযুক্ত কর্ত্তব্য।

ঝাপল উতপত লোরে নয়ান। কৈছে করত হিয়া কিছুই না জন॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহিঁ রাখি। তনু মন দুহুঁ মুঝে দেয়ত সাখী॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। বজরক বারণ করতলে হোয়॥
জানলুঁ রে সখি মৌনক ওর। পিয়া পরদেশ চলব মোহে ছোড়॥
গমনক সময়ে বিরোধ জনি কোয়। পিয়াক অমঙ্গল যৈছে না হোয়॥
সময়-সমাপন কী ফল আর। প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥[৬০১]॥

কৃষ্ণ মথুরা যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। রাধা সখীকে বলিতেছেন।—"রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ"—তিনি কি নিষ্ঠুর হইতে পারেন? নিশ্চয়ই পাপী অক্রূর তাঁহাকে ও আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে মথুরায় লইয়া যাইতেছে। এখন আর বৃথা লোকলজ্জার অবকাশ নাই; উত্তরীয়াঞ্চল ধরিয়া কৃষ্ণকে ফিরাও।

হরি নহ নিরদয় রসময়-দেহ কৈছন তেজব নবীন সনেহ ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান সব মুখ বারি লেই চলু কান ॥
এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ। আঁচর গহি বাহুরায়হ নাহ ॥ [১৬২৪] ॥

কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। রাধা বিলাপ করিতেছেন।—সখি, আমার জীবনের নির্লজ্জতা দেখ; কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন, আমার অধন্য জীবন চলিয়া না গিয়া এখন রোদন করিয়া প্রীতি জানাইতেছে। বৃন্দাবনে সেই শোভা সৌন্দর্য্য সবই রহিয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণের অভাবে আমার জীবন এখন কলঙ্কমাত্রে পর্য্যবসিত হইল। প্রেম ক্ষণস্থায়ী, আর জীবন স্থায়ী ও কঠিন—এত দিনে এই কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিলাম।

দেখ সখি নীলজ জীবন মোই। পিরিতি জনায়ত অব ঘন রোই ॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ-কুটীর। সো যমুনা-জল মলয়-সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক। কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এত দিনে বুঝল বচনক অন্ত। চপল প্রেম থির জিবন দুরন্ত ॥ [১৬৩৭] ॥

বৃন্দাবন হইতে মথুরায় কৃষ্ণের নিকট দূতী আসিয়া কৃষ্ণকে সংবাদ দিতেছে।—কৃষ্ণ, বালিকা রাধা দিবারাত্রি তোমার পথ পানে চাহিয়া রোদন করিয়া করিয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কি রসে তাহাকে সুখী করিব? তাহার বিষম কুসুম-শরজ্বালাই বা কি করিয়া নিবারণ করিব? মাধব, ইহাতে যে তোমার ভাবনার কোন কারণ নাই, তাহা মনে করিও না। রাধা কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, কিন্তু কলঙ্ক তোমার উপরই আরোপিত হইবে। চন্দন, চন্দ্রকিরণ, মৃদু মলয় পবন সেবন এবং সিক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়াও, এবং কুবলয়, কুমুদ, কমলদল, কিশলয়-রচিত শয্যায় শয়ন করিয়াও রাধা নির্বৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না। দারুণ বিরহ-হুতাশে নবনীতকোমল রাধা ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে। সখীস্থানীয় কবি রাধার জীবনাশঙ্কায় তাহার শ্বাস বহিতেছে কি না, পরীক্ষা করিতেছে।

তুয়া পথ জোই রোই দিনযামিনি অতি দুবরি ভেল বালা।
কি রসে রিঝায়ব কৈছে নিঝায়ব বিষম কুসুম-শর-জ্বালা ॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদকলা সম খীয়ত তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক ॥
চন্দন-চন্দ-মন্দ মলয়ানিল-নীর-নিষেবিত চীরে।
কুবলয়-কুমুদ-কমলদল-কিশলয়-শয়নে না বান্ধই থীরে ॥
সুনিক পুতলি তনু মহিতলে শুতলি দারুণ বিরহ-হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস বহ না বহ পরিখত গোবিন্দদাসে ॥—[১৯৩৪] ॥

উত্তরে কৃষ্ণ দূতীকে বলিতেছেন।—প্রথম আমরা যখন ভালবাসিয়াছিলাম, তখন আমরা কেহই ভাবি নাই যে, দেহ সর্ব্বদাই ইচ্ছার অধীন থাকে না। এখন আমাদিগের সেই প্রেমের মেলা ভঙ্গ হইয়াছে। মিলনের কথা কি? এখন দর্শনই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। রাধাকে তুমি প্রবোধ দিও, যাহাতে সে কিছুদিন যেন প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। রাধাকে বলিও, আমি শীঘ্র আসিতেছি। এত দিন পত্রাদি দিই নাই কেন জান? রাধাকে

পত্র লিখিতে গেলে আমার মনে যে ভাব তরঙ্গিত হইয়া উঠে, তাহা নিজ হাতে লিখিতে বিশ্বাস হয় না। আর পরের মুখে কত সংবাদ পাঠাইব ? তাহাতে কি বলিতে কি হইতে পারে।

যব তুহুঁ লায়ল নব নব নেহ। কেহু না গুণল পরবশ দেহ ॥
অব বিধি ভাঙ্গল সো সব মেলি। দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি। যৈছনে জীবয়ে দুয়-এক রজনি ॥
গণইতে দিবস অধিক গণি দেখ। মেটি শুনায়বি দুয়-এক রেখ ॥
লিখইতে হৃদয়ে উঠয়ে যছু রীত। নিজ-করে লিখইতে নাহি পরতীত ॥
কতয়ে সম্বাদব পরমুখে বাণী। কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি ॥ [১৮৩৩] ॥

গোবিন্দদাস-কবিরাজের গৌরচন্দ্রিকা পদের সংখ্যা ত্রিশের অধিক। এই পদগুলির অধিকাংশই উচ্চশ্রেণীর রচনা। এই পদগুলির কিছু পরিচয় না দিলে কবির কাব্য-পরিচয় অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কবির ইচ্ছা ছিল যে, তিনি গৌরলীলা বর্ণনা করেন, কিন্তু তাৎকালীন বৈষ্ণব মহান্তসমাজ তাঁহাকে কৃষ্ণলীলাই বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। কবিরাজ যদি গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া যাইতেন, তবে তাহা যে কিরূপ উপভোগ্য হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

✓ চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনুলাবণি রে।
উন্নতগীম সীম নাহি অনুভব জগমনমোহন ভাঙনি রে ॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন-মণ্ডন কলিযুগকালভুজগভয়খণ্ডন রে ॥
বিপুল-পুলক-কুল-আকুল-কলেবর গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহিমণ্ডল গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥ [৩] ॥

মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদদশার বর্ণনা কবি এই অনুপ্রাসময় পদটীতে করিয়াছেন।

যামিনি জাগি জাগি জগজীবন জপতহি যদুপতি নাম।
যাম যামযুগ যৈছন জানত জরজর জীবন মান ॥
ঝূরত গৌরকিশোর।
ঝাকত ঝীকয়ে ঝর ঝর লোচনে ঝুরি পুরবরসে ভোর ॥
চম্পকগৌর চাঁদ হেরি চমকই চতুর ভকতগণ চাহ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই চকিতহি চেতন চোরাহ ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি করযুগল ছোড়ল রজনিক নিন্দ।
ছোড়ব নাহি জগতজীবন ছদ না কহ দাস গোবিন্দ ॥ [১৮৮৭] ॥

গোবিন্দদাসের অন্যান্য পদের মধ্যে নিত্যানন্দবন্দনা একটী [৪], রামচন্দ্রবন্দনা একটী [২৪০৭], শ্রীনিবাসাচার্য্য বন্দনা একটী [১০], নরোত্তম ঠাকুর বন্দনা একটী [১১], বিদ্যাপতিবন্দনা দুইটী [১২, ২৩৮৬], এবং প্রার্থনাপদ দুইটী [২৭ ; ৩০৩২]।

অন্যতম বিদ্যাপতি-বন্দনায় কবি এক রকম স্বীকার করিয়াই গিয়াছেন যে, তিনি পদরচনায় বিদ্যাপতির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন।—

যত যত রসপদ করলহি বন্ধে।
কোটিহুঁ কোটি শ্রবণে যব পাইয়ে শুনইতে আনন্দে লাগয়ে ধন্দে॥
সো রস শুনি নাগর-বরনারি।
কীয়ে কীয়ে করি চিত চমকাওই ঐছন রসময় চম্পু বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখসম্পদ রহইতে আনমন যৈছন বামন ধরবহি চন্দে—॥ [২৩৮৬]॥

গোবিন্দদাস-কবিরাজ সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি **সঙ্গীতমাধব** নামক একটী সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। ইহা বলিলে বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, একমাত্র গোবিন্দদাসের পদাবলী হইতে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রায় সকল অলঙ্কার ও গুণের সুন্দর উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী ও জীব গোস্বামীর সাহিত্যিক ও দার্শনিক রচনার সহিত কবি খুব ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। গোস্বামিগণের নিকট কবি অনেক ভাব ও উপমাদির জন্য ঋণী। তবে সেই সেই স্থলে গোবিন্দদাস স্বীয় কবিত্বশক্তির সাহায্যে বিষয় ও অলঙ্কারটীকে অধিকতর প্রস্ফুটিত ও সুষ্ঠু করিয়া তুলিয়াছেন। গোবিন্দদাস মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের নিকট ঋণী হইয়াছেন, কিন্তু কখনও চোর হয়েন নাই। নিজের কৃতিত্ব যে স্থলে স্বল্প, কবি সেখানে যুক্তভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্যে কবির বিশেষ অধিকার ছিল, এবং তাহা হইতে কবি কাব্য রচনার অনেক উপাদান পাইয়াছিলেন। এ স্থলে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

রাধা কৃষ্ণকে কৌশলে সঙ্কেত করিয়া মিলনস্থান জানাইয়া দিতেছেন।—

মঝু মুখ বিমল-কমল-বর-পরিমলে জানলুঁ তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামিক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব না জানি কৈছে দিল তোর॥
দূরে রহু শ্যাম ভ্রমরবররায়।
স্বামিক সেবন করইতে ঐছন জানি করহ অন্তরায়॥
এতহুঁ তিয়াসে হোত যব আকুল কী ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাঁহি চলহ যাহাঁ কুসুম বিথারল মঞ্জুল মাধবি-কুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত কয়ল যব কামিনি কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ-গোঙার ভ্রমর বলি খোজত গোবিন্দদাস রসগান॥—[৬৪৬]॥

ইহার সহিত উদ্ধবসন্দেশের এই শ্লোকটীর তুলনা করুন,—

মদ্বক্ত্রাম্ভোরুহপরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে
পত্যুঃ কৃষ্ণভ্রমর কুরুষে কিন্তুরামন্তরায়ম্।

তৃষ্ণাভিজুং যদি কলরুত ব্যগ্রচিত্তস্তদাগ্রে

পুষ্পৈঃ পাণ্ডুচ্ছবিমবিরলৈর্যাহি পুন্নাগকুঞ্জম্॥ [উজ্জ্বলনীলমণি, বহরমপুর সংস্করণ (১২৯৫), পৃঃ ১৬১]॥

বিরহের দশমী দশায় রাধার ব্যাকুলতা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। রাধার সকল ইন্দ্রিয় কৃষ্ণের সেবা ও স্পর্শের জন্য আতুর হইয়া রহিয়াছে। রাধা তাই প্রার্থনা করিতেছেন।— যে স্থানে আমার প্রভু অরুণ চরণ ফেলিয়া চলিয়া যান, আমার গাত্র যেন সে স্থানে মাটি হইয়া প্রভুর স্পর্শসুখ অনুভব করে। প্রভু যে সরোবরে নিত্য স্নান করেন আমি যেন তথাকার সলিল হইয়া তাহা পূর্ণ করি। সখি, এমন করিয়াও যদি গোকুলচন্দ্রের সহিত মিলন হয়, তবে বিরহে মরণই তো নিরাপদ। প্রভু যে দর্পণে নিজ মুখারবিন্দ দর্শন করেন, আমার অঙ্গ যেন জ্যোতি হইয়া সেই দর্পণে প্রতিফলিত হয়। প্রভু যে বীজনে বায়ু সেবন করেন, আমার শরীর যেন সেই বীজনে মৃদু পবন হইয়া প্রভুকে গাত্রসুখ প্রদান করে। জলধর শ্যাম আমার প্রভু যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, সেখানে সেখানে আমার অঙ্গ যেন আকাশ হইয়া সেই শ্যাম নীরদকে ধারণ করে।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাহাঁ তাহাঁ ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদন্দ। ঐছে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ-মুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী। সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥
[১৯৫৩]॥

এই পদটীতে বিরহে মিলনের আর্ত্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে। সুভাষিতাবলী এবং পদ্যাবলীতে একটী শ্লোক আছে, যাহার ভাব লইয়া কবি এই অপূর্ব্ব পদটী রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোকটী এই,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশান্ বিশন্তু স্ফুটং
ধাতস্ত্বাং শিরসা প্রণম্য কুরুমামিত্যস্থ যাচে পুনঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ালয়-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥ [সুভাষিতাবলী, দাক্ষিণাত্যস্থ [৩৫৫] ; পদ্যাবলী, যাণ্মাষিকস্থ, শ্লোকসংখ্যা ৩৪০ ; উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৭৯৫]॥

কৃষ্ণ মথুরায় প্রস্থান করিলে রাধার উক্তি (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)।—

শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি। চলতহিঁ পেখলুঁ নয়ন পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহ হেরি। শূনহি মন্দিরে আয়লুঁ ফেরি॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই। পিরিতি জনায়ত অব ঘন রোই॥ [১৬৩৭]॥

কৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, তাহা শুনিলাম ; তিনি যাত্রা করিলেন, তাহাও চোখ মেলিয়া দেখিলাম। তিনি যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, আমিও চাহিয়া রহিলাম। শেষে শূন্য মন্দিরে ফিরিয়াও আসিলাম। সখী, দেখ, এখন কিন্তু আমার নির্লজ্জ প্রাণ রোদন করিয়া মায়া জানাইতেছে।

গোবিন্দদাস এই পদটীর ভাব নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।—

যাস্যামীতি সমুদ্যতস্য বচনং বিস্রব্ধমাকর্ণিতং
গচ্ছন্ দূরমুপেক্ষিতো মুহুরসৌ ব্যাবৃত্য পশ্যন্নপি।
তচ্ছূন্যে পুনরাগতাস্মি ভবনে প্রাণাস্ত এব স্থিতাঃ
সখ্যঃ পশ্যত জীবিতপ্রণয়িনী দম্ভাদহং রোদিমি॥] পদাবলী, রুদ্রস্য, ৩২৩]॥

এক সখী অপর সখীকে রাধার সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করিতেছে।—

সজনী কি কহব রাইক সোহাগি।
যাকর দেহলি বদরি কোরে হরি রজনি পোহায়ল জাগি॥
কোকিল সম হরি সঙ্কেত করইতে দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে গুরুজন জাগল পড়ি গেও দারুণ বাধা॥
ননদিনি বলে ধনি কো বাহিরায়ত ভীত পুত্তলি সম দেহা।
লোরে মিটায়ল পীনপয়োধর মৃগমদ-কুঙ্কুম-রেহা॥—[৭১৬]॥

ইহার সহিত তুলনা করুন,—

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী॥ [পদ্যাবলী, ২০৬]

গোবিন্দদাস-কবিরাজের কবিত্বের আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—কবির অনুপ্রাস-ঝঙ্কারের সাহায্যে অতুলনীয় শব্দচিত্র রচনা। কবির পদাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। এ স্থলে আরও কিছু উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা,—

নন্দ-নন্দন-চন্দ চন্দন-গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল কুলজ কামিনি-কন্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল-কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড-মণ্ডল-বলিত-কুণ্ডল উড়ে চুড়ে শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব-তাল-পণ্ডিত বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন শ্রবণ-রোচন ভাষ।
অমল-কোমল-চরণ কিশলয়-নিলয় গোবিন্দদাস॥ [২৪১৯]॥

অভিসারিকা রাধার রূপবর্ণনা,—

কঞ্জ-চরণযুগ যাবক-রঞ্জন খঞ্জন-গঞ্জন-মঞ্জির বাজে।
নীলবসন মণি-কিঙ্কিণি-রণরণি কুঞ্জর-গমন দমন খিন মাঝে।
সাজলি শ্যাম বিনোদিনি রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ-তরঙ্গিণি রঙ্গিণি মদন-মোহন মন-মোহন-ছাঁদে॥ ইত্যাদি।

॥ ১০৩৭ ॥

ছন্দের উপর কবির দক্ষতা অসাধারণ। ব্রজবুলীর মাত্রা-ছন্দের সহিত প্রচুর তৎসম-তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ অনুপ্রাসমণ্ডিত হইয়া গোবিন্দদাসের কাব্যে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে।

একে কুল-কামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পূর॥ [৯৭৯]॥
শ্যামর-চীত-চোর কুচ-কোরক নীল-নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ-চরণতলে জিউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥ [১০৫৪]॥

এ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়াই অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। গোবিন্দদাসের রচনাগুলি সবই গীতিকবিতা। আধুনিক পাঠ্য নামমাত্র গীতিকবিতা নহে; এইগুলির অধিকাংশই কীর্ত্তনে গীত হইবার জন্য রচিত। বাঙ্গালার অপূর্ব্ব রস-কীর্ত্তনে সুরতালে গীত হইলে এই 'রসনা-রোচন' পদগুলি যে কিরূপ 'শ্রবণ-বিলাস' হইয়া উঠে, তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবকবির কাব্য রসিক ও সাধকের আস্বাদ্য, তাত্ত্বিকের বিচার্য্য নহে।

অনুপ্রাসাত্মক চিত্র-গীত কবি অনেকগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে সাতাশটী এইরূপ পদ আছে[১]। এখানে একটী উদাহরণস্বরূপ তুলিয়া দিতেছি।

কাননে কামিনি কোই না যায়। কালিন্দিকুল কলপতরু-ছায়॥
কুঞ্জ-কুটির মাহা কান্দই কোই। করে শির হানই কুণ্ডল ফোই॥
নলিনি-নারিগণ নাশল নেহ। নবিন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী-নিন্দিত নব নব বালা। নাগল বিরহ-হুতাশন জালা॥
গলত গাত গীরত মহি মাহ। গুরুতর গিরিষ অধিক ভেল দাহ॥
গোকুলে গোপ-রমণি অছু ভেল। গরল-গরাসনে গোবিন্দ গেল॥ [১৭২৮]॥

কৃষ্ণের বিরহে গ্রীষ্মকালে বিরহিণী গোপীদিগের ক্লেশ এই পদটীতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে গোবিন্দদাস প্রবীণ ছিলেন। উপমা, রূপক, সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি, একাবলী প্রভৃতি সকল প্রকার সরল ও জটিল অলঙ্কারের নিদর্শন তাঁহার পদাবলীর মধ্যে

১। 'ক' (৫৭৮, ১৮৮৬, ২৪৩২৭); 'ক', 'গ', 'ন', (১৭২৮); 'ক', 'জ', 'প', 'র', (২৪২৮); 'গ', (১৮৯০); 'ঘ', (১৯১৪); 'চ', 'ছ', 'জ', 'ঝ', (১৮৮৭); 'ছ', (১৯০১); 'জ' (১৯১২), 'ঝ' (১৭৪১); 'ট', 'ঠ' 'ড', 'ঢ' ১৭১৮); 'ত', (১৮৯৬); 'দ', (১৯০১), 'ন', (১৮৯৪; ২৭২৩); 'প', (১৭৪০); 'ফ' (১৭২১); 'ব' (১৯২০; ২৭১৪); 'ভ' (১৯২২); 'ম' (১৭২২; (২৪২৬) 'র' (১৮৯৫) 'শ', 'ষ'. 'স' (১৭১৭); 'হ' (১৯২৩)।

যথেষ্ট পাওয়া যায়। দুই একটী কবিতার মধ্যে কবি অতি সুকৌশলে শ্লেষালঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া গুণপনা দেখাইয়াছেন।২

কবিতা বা শ্লোকের শেষে ভণিতা দেওয়ার প্রথা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই প্রচলিত আছে। ভণিতার মধ্যে যে কত মাধুর্য্য ও চমৎকারিত্ব থাকিতে পারে, তাহা বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ না করিলে ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। এই ভণিতা রচনা বিষয়ে গোবিন্দ-দাস-কবিরাজ মহাশয়ের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট। এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

তরুণ-অরুণ-রুচি পদ অরবিন্দ। নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ॥ [১৯]॥
গোবিন্দদাস ভণে জান। তুয়া বিনু কানুক জ্বলত পরাণ॥ [৪৬]॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥ [৫২]॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ। চাঁদকি লাগি সুরজ উপরাগ॥ [৮৫]॥
যব মন বান্ধল ইন্দ্রিয় ফাঁপর তাহি মিলল আন আন।
কাঠক পুতলি ঐছে মুরুছায়ত গোবিন্দদাস পরমাণ॥ [২০০]॥
ইহ রসসায়রে মগন সুরাসুর দিনরজনী নাহি জান।
গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই শ্রীবল্লভ পরমাণ॥ [২২৫]॥
ঘন সঞে দামিনি দুকূলে দুকূল জনু দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেঢ়ি চারু অরুণ সরোরুহ মধুকর গোবিন্দদাস॥ [৩০২]॥
যাকর বচনে নাহিক বিশোয়াস। তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দদাস॥ [৩১৪]॥
সহচরি মোহে লাখ সমুঝায়ল তাহে না রোপলুঁ কাণ।
গোবিন্দদাস সরস-বচনামৃতে পুন বাহুড়ায়ব কাণ। [৪৩৪]॥
গোবিন্দদাস দেখব তব সাঁচ। কাকর অঙ্গনে কো পুন নাচ॥ [৫৪৮]॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস। বীজন করতহিঁ গোবিন্দদাস॥ [১১১১]॥
ধনি ধনি ভাণনি চতুর-শিরোমণি বিদগধ-জীবন জাব।
গোবিন্দদাস এ হেন রসে বঞ্চিত অবহুঁ শ্রবণে নাহি জীব॥ [১৩২১]॥
তপত সরোবরে থোরি সলিল জনু আকুল সফরি-পরাণ।
জীবন মরণ মরণ বরু জীবন গোবিন্দদাস পরমাণ॥ [১৯৩৫]॥
রমণী-রমণ-রতন-রুচিরানন রঞ্জিতরতিরসবাস।
রসনারোচন রসিকরসায়ন রচয়তি গোবিন্দদাস॥ [২৪২৮]॥

গোবিন্দদাস সংস্কৃত গীতিকবিতাও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত একটী সংস্কৃত পদ পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত আছে। সেই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনার উপসংহার করিতেছি।

ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পঙ্কজ-কলিতম্।
ব্রজ-বনিতা-কুচ-কুঙ্কুম-ললিতম্॥
বন্দে গিরিবরধর-পদ-কমলম্।
কমলা-কর-কমলাঞ্চিতমমলম্॥

২। (৬২১) ও (৭০৬)—পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

মঞ্জুল-মণি-নূপুর-রমণীয়ম্ ।
অচপল-কুল-রমণী-কমনীয়ম্ ॥
অতিলোহিতমতিরোহিতভাসম্ ।
মধু-মধুপীকৃত-গোবিন্দদাসম্ ॥ [৩৭৯ ॥

গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর মধ্যে গল্পাংশের বা উপাখ্যানাংশের ধারাবাহিকতা থাকিলেও ঐ পদাবলী কোষকাব্য ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। কবিরাও কবিতাগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সময়ে পৃথক্‌ভাবে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে পদাবলীর মধ্যে মহাকাব্য (epic) বা নাটক (drama)র মত নায়ক নায়িকার চরিত্রের সম্পূর্ণতা বা সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ খুঁজিতে হইলে হতাশ হইতে হইবে। রাধা, কৃষ্ণ ও তাঁহাদের প্রেমলীলা মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারের প্রতীক হইলেও উহা মানবিকতার ঊর্দ্ধে। তথাকথিত বৈষ্ণব-মতাবলম্বী 'কর্ত্তা-ভজা' বা 'সহজিয়ারা' নিজেদের সাধন-ভজনের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহারা রাধা-কৃষ্ণলীলাত্মক কোন পদাবলী লিখেন নাই, ইঁহারা রাধা ও কৃষ্ণের নামে সাধন-ভজনের ব্যাপার লইয়া দেহতত্ত্বের পদ রচনা করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব কবিদিগের অঙ্কিত বিভিন্ন কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য নাই। রাধা-চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন দিকে রঙ্ ফলাইয়া গিয়াছেন। বলরামদাসের রাধা-চরিত্রে বিরহের আর্ত্তি সকল ভাবকে ছাপাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমনি গোবিন্দ-দাসের রাধাচরিত্রে রাধার রূপানুরাগ ও তজ্জনিত ব্যাকুলতা পাঠক ও শ্রোতার মনে গভীর ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। শব্দ ও অর্থালঙ্কারের বাহুল্য যে অনেক সময়ে গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাবের গভীরতা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

[৪]

কয়েকটী নূতন পদ

কিছু দিন হইল, পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবগত হই যে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট একখানি প্রাচীন পদসংগ্রহের পুথি আছে এবং তাহাতে 'গোবিন্দদাস' ভণিতাযুক্ত অনেকগুলি পদ আছে। তখন আমার প্রথম প্রবন্ধটী লেখা হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি সুনীতিবাবুর আনুকূল্যে ও সজনী বাবুর সৌজন্যে পুথিখানি দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।

সাধারণ বাঙ্গালা পুথির হিসাবে এই পুথিখানি বেশ প্রাচীন বলিতে হইবে। পুথিখানি এক সময়ের লেখা নহে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ – পুথির বেশী অংশ— ১০৬০ হইতে ১০৬৩ সালের মধ্যে লেখা; (পুথির পৃষ্ঠার মধ্যে মধ্যে তারিখ দেওয়া আছে।) অপর অংশ তাহার অনেক পরেকার লেখা বলিয়া বোধ হয়। পুথিখানি বাঁধান খাতার আকারে উভয় পৃষ্ঠে লেখা; পত্রসংখ্যা ১৮৬। আকার লম্বায় ৯ ইঞ্চি, চওড়ায় ৭ ইঞ্চি। সজনীবাবুদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে এই পুথি রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

পুথিতে সর্ব্বসমেত ৫৩ জন কবির ৩৯০টী পদ আছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি পরিচিত ও বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছাড়াও অনেক একেবারে অপরিচিত কবির পদও ইহাতে আছে। শুধু প্রাচীনত্ব নয়, অন্যান্য অনেক দিক্ দিয়া এই পুথিটীর বিশেষত্ব আছে। ইহার সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত পরিচয় প্রবন্ধান্তর-সাপেক্ষ। বর্ত্তমানে কেবল গোবিন্দদাসের পদগুলির সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পুথিটীর প্রাচীন অংশে ১০৬০ হইতে ১০৬৩ সালের তারিখ দেওয়া আছে। অতএব ঐ অংশটী গোবিন্দদাস কবিরাজের মৃত্যুর ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। এই অংশে গোবিন্দদাস ভণিতাসম্বলিত একুশটী পদ আছে। এই একুশটী পদের মধ্যে পনেরোটী পদ পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র বা অপর পদসংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলি এই,—

এতদিনে গগনে অখিন রহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু থির।

গোবিন্দদাস কহে সো অপরূপ নহে কুবুজা অব নব রাণী॥
[পদকল্পতরু, ১৯০৪]॥

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া দৈবে কহল শুভবাণী।

* * *

প্রাণ-প্রাণ হরি নিজগৃহে আওব গোবিন্দদাস-মনলোভা। [ঐ, ১৭০৪]

* প্রভাতকালে কাক কলকলি আহার বাঁটিয়া খায়।

* * *

দুরদিন যত সব দূরে গেল কহই গোবিন্দদাসে॥ [ঐ]॥

দুঁহে দুঁহা মিলনে উপজল প্রেম।

* * *

গোবিন্দদাসের মনে যুগল-কিশোর॥ [ঐ, ২৬৪]॥

গুরুজননয়ন-বিধুন্তুদ মন্দ।

* * *

মিললি নিকুঞ্জে কহে গোবিন্দদাস॥ [ঐ, ৯৯০]॥

আঁধল প্রেম পহিল নাহি হেরলুঁ সো বহুবল্লভ কান।

* * *

গোবিন্দদাস কহই অতি ভাবিনি ঐছন কামুক নেহ॥ [ঐ, ৪৩৩]॥

যাকর চরণ-নখর-মণি হেরইতে মুরুছএ কত কোটি কাম।

* * *

গোবিন্দদাস আনি যব মিলায়ব তবহিঁ মনোরথ পূর॥ [ঐ, ৪৫৩]॥

গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল হাম নাহি পালটি নিহার।

* * *

গোবিন্দদাস আনি যব মিলায়ব তবহিঁ মনোরথ পূর॥ [ঐ, পৃঃ ২৮৪]॥

---

* বাঙ্গালা পদ : সম্ভবতঃ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর।

সুন্দরি কতহুঁ সমুঝায়ব তোয়।

*　　*　　*

আপন চরিত আপনে না সমুঝসি হঠে নঠ কৈলি সব কাজ ॥ [ঐ, ৪৭২] ॥

কাঁচা-কাঞ্চন-কাঁতি কমলমুখি কুসুমিতকাননে জোই।

*　　*　　*

কিঞ্চিতকাল কলপ করি মানই গোবিন্দদাস তহিঁ ছোরি ॥ [ঐ, ১৮৮৬] ॥

খিতিতলে সুতলি বালা।

*　　*　　*

খোজত গোবিন্দদাস ॥ [পদামৃতসমুদ্র (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২৯৯] ॥

গুরুজন-গঞ্জন বোল।

*　　*　　*

গোবিন্দদাস কহিএ তাপ ॥ [পদকল্পতরু, ১৮৯০ ॥

ঘনশ্যামরতনু তুহু কিয়ে ভোরি।

*　　*　　*

ঘুষত পহুঁপায়ে গোবিন্দদাস ॥ [ঐ, ১৯১৪] ॥

চিত অতি চপল-চরিত-গতি তোরি।

*　　*　　*

চেতন রহাওত গোবিন্দদাসে ॥ [পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ৩৩৬] ॥

ছোড়ল সুখময় কুসুমশয়ান।

*　　*　　*

ছদম না কহতহিঁ দাস গোবিন্দ ॥ [পদকল্পতরু, ১৯১১] ॥

এই প্রাচীন অংশে ছয়টী সম্পূর্ণ নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

রাধাশ্যাম নিকুঞ্জ-মন্দির মাঝ।
চৌদিকে ব্রজবধূ মঙ্গল গায়ত তেজি কুলভয় লাজ॥
সরদজামিনি সুন্দর কামিনি চঞ্চল লোচনে চায়।
মদন-ভুজঙ্গমে রাইরে ডংসল ঢোলি পড়িছে শ্যাম গায়॥
কানু-ধনন্তরি রাই কোরে করি য়ৌখদ চুম্বনদান।
নাগর নাগরি য়ো রসে আগরি দুহিঁ দুহুঁ একুই পরান॥
স্বর্গে বিদ্যাধরি করজোড় করি করতহিঁ পুষ্পকি রাস।
নানা জন্ত্র মেলি বাজত মুরলি কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥ [পৃঃ ২৫] ॥

সুনিঞা মধুর মুরলি তান সহিল নহিল রসের প্রাণ
অন্তরে ভেদল মদনবান চলল নিকুঞ্জ মাঝেরে।
অঙ্গে পহিল জলদ বাস বিধির য়বধি লাস-বিলাস
প্রেমে ঢল ঢল ইসত হাস শ্যামমোহিনি সাজেরে॥

কুটিল কুন্তলে কবরি রাঙ্গ রতনে বোতিত (?)[১] অপন সাজ
কনকচম্পক * * * মাঝ মল্লিকা মালতি ঘেরিয়া।
জিনি সরুরুহ চরণচন্দ নখমণি তাহে বিধুকে নিন্দ
রসের রাবেসে গমন মন্দ মদন কান্দয়ে হেরিয়া ॥
রচিয়া মণ্ডলি কেলি সুসার চৌদিক গোপিনি মাঝে বাজার
প্রবেশিল্যা কুঞ্জকানন মাঝ মিললহু শ্যামরায় রে।
নয়ানে নয়ানে মিলন কান উপজল কত রসের বাণ
সে রসে হিলোলে গোবিন্দদাস কি দিব উপমা তায় রে ॥ [পৃঃ ৩৫] ॥

নিধুবনে শ্যাম-বিনোদিনি জোর।
বিধির অবধি দুহুঁকার রূপে সুখের নাহিঁক ওর ॥
আধ সিরে সোভে মউর মটুক আধ সিরে সোভে বেনি।
কনক কমলে জৈছে বিরাজিত ফণি উগারল মণি ॥
আধ শ্রবণে মকরকুণ্ডল আধ মরকত ছবি।
আধ কপালে[২] চান্দের উদয় আধ কপালে রোবি ॥
আধ পহিরল হিরণ কিরণ আধ নিলমণি জোতি।
আধ অঙ্গে বনমালা দুলে বিরাজিত গজমতি ॥
মন্দমলয় সিতল পবন তোরুলতা উড়ে বায়ে।
নিকুঞ্জদ্বারে বাহির নিকটে গোবিন্দদাস গুণ গায়ে[৩] ॥ [পৃঃ ৩৬-৩৭] ॥

কিশোরি কিরণে[৪] দুহে অতি ভেল ভোর।
কনক লতিকা রাই নাগরের কোর ॥
রাই মুখ বামে মুরুলি করি করে।
তিলে দসবার চাঁদ মুখানি নিহারে ॥
নিলপিতবাস দেখি কুঞ্জের ভিতর।
অরুণের কাছে যেন নবজলধর ॥
দুহুঁজনার প্রেম দেখি সব গোপীগণ।
রাধা তোমার তুমি রাধার একুই জীবন ॥
দেখিআ দুহাঁর রূপ অতিরসে ভোর।
গোবিন্দদাসের মনে জুগলকিশোর ॥ [পৃঃ ৪১] ॥

সজনি আজু কত অপরূপ রঙ্গ।
রমণিক বেস ধরি রসিক নাগরবর যাওত দুতিক সঙ্গ ॥
আগুপদ বাম বামগতি চললি বামে পেখলুঁ শ্যাম।
বামে ভুজে ঘন বসন উড়য়েত বাম কুন্তলে অনুপাম ॥

১। জড়িত, খচিত? ২ 'কালে'—পুথি। ৩। তুলনীয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পদসংখ্যা ৭৬।
৪। কিশোর?

পাটাম্বর পরি অভিনব নাগরি তৈখনে করল পআন।
সিথ্যারি (?) কাম সিন্দুর পরিহরি লখই না পারই আন॥
মণিময় কঙ্কন দুই ভুজে সোভল সঙ্খ সোভে তার মাঝে।
এমন চোতুরবর দেখি নাঁহি নাগর এ মহিঁ মণ্ডল মাঝে॥
পদতলে ওরূন মুঞি দেখিলুঁ তেঁ করিল য়নুমান।
গোবিন্দদাস কহে চোতুর সিরমুনি রাধা মন্দিরে করল পয়ান॥ [পৃঃ ৫৬]॥
বিরহিণী আকুলি ভূতলে স্বতলি সোখিগণে ধরই না পারি।
সহচোরি দুখে রোখ ভরি দুরত বিহি সনে দেত গারি॥
হরি হরি কাহে বাড়ায়লু লেহা॥
কানুক লাগি বধভাগি হোয়লুঁ খোয়লুঁ রাইক নেহা॥
সব সহচরি মেলি ভাবনা ভাবই করতহি এক য়নুমান।
রাই শ্রবণ পর স্যাম স্যাম করি করতহিঁ নব রস গান॥
স্যাম নাম সুনি চমকি উঠিল ধনি সোখিগণে দেয়ত কোর।
গোবিন্দদাস চলুঁ রাই বিপত্তি দেখি বুঝাইতে শ্যামকিশোর॥ [পৃঃ ৭৪]॥

এই কবিতাগুলির মধ্যে কিছু কিছু হীন-মিলন ও পাঠাশুদ্ধির পরিচয় থাকিলেও কবিত্বাংশে চমৎকারিত্ব আছে। এই কবিতাগুলির উদ্ধারে আমি পুথির পাঠই যথাযথ রাখিয়াছি।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে পনেরোটী পুরাতন পদ পাওয়া যায়। সেগুলি এই,—

কাজর তিমির ভ্রমর জিনি তরু তনুরুচি নিবসই কুঞ্জ কুটীর।

* * *

বিঘ ওখদ এ দউ ধারণ গোবিন্দদাস পরশংসে॥ [পদকল্পতরু, ৭০৮]॥
বেণুক ফুঁকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মহাঁ জারি।

* * *

গোবিন্দদাস কহ আন হেরলহ জাগি হোই পরমাদ॥ [ঐ, ৭০৭]॥
হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল প্রেম প্রহরি রহু জাগি॥ [ঐ ৭১০]॥
* দিবস সিনান সময় জানি॥ [ঐ, ৬৯৩]॥

* * *

না জানি এ কোন মথুরা সঞে আয়ল তাহে হেরি জিউ মোর কাঁপ।

* * *

গোবিন্দদাস কহে আসি সখি পুছহ কাহে এত বিঘন বিথারি॥
[ঐ, ১৬০০]॥

নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি তা সম সোই আয়ল ব্রজ মাঝ।

নহে সমনে আনি তুরিতে মিলায়ব গোবিন্দদাস চিতে ভিতে॥ [ঐ, ২৬০২] ॥
দেখ সখি অঠমিক রাতি।

* * *

আনি মিলায়ব কান॥ পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ১৫৩] ॥
কানুক সন্দেশে বেশ বনি আয়নু সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে।

* * *

গোবিন্দদাস কহই শুন সুন্দরী কানুক যৈছন নেহ॥ [পদকল্পতরু, ৩৬১] ॥
রিতুপতি রাতি বিরহজরে জাগরি দুঁতি উপেখল বামা।

* * *

পীরিতিক পন্থ কৈছে তব মিটব গোবিন্দদাস চিতে ভিতে॥ [ঐ,৩২০] ॥
বিরহে আকুল ধনী তুয়া নাম গনি গনি মোহে অতি অশকতি ভেল।

* * *

গোবিন্দদাস কহে রাই যদি দেখবি আপ চলহ মঝু সাথ॥ (ঐ) ॥
চৌদিকে চকিত নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ।

* * *

গোবিন্দদাস কহই অব ধীরহু মৌনে সমুঝল কাজ॥ [ঐ, ২২৭] ॥
পহিলহি কুল তুল সম উড়ল যাকর বেণুক ফুঁকে।

* * *

কত পরমাদ কহই না পারিয়ে গোবিন্দদাস ভালে জান॥ [ঐ, ৭০৯] ॥
দরশন লোরে নয়ন দুই ঝাঁপ।

* * *

গোবিন্দদাস না ভাঙ্গে বিবাদ॥ [ঐ, ২৩৩] ॥
অবলা কি গুণ জানি ধরে।
গোবিন্দদাসের বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী তেঞী তুমি তেঞী তুমি শ্যামের পরাণ॥ [পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ৪০৬]

* * *

এ গজগামিনি তু বড়ি সিয়ান।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥ [পদকল্পতরু, ১৩৭৩] ॥

এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এই সাতটী নূতন পদ পাওয়া যায়। প্রথম বেশ চমৎকার।

কুঙ্কুমে চাঁদ লেখি চুম্বই কান। লাজে চন্দ্রমুখী তেরছ নয়ান॥
নব কিসলয় কর দসনকী ঘাত। কিসলয় অধরে হেঠ রহু মাথ॥
নখ করে দেই কনয় কটোর। উহুঁ করে ধনি মোড়সি কোর॥[1]

১। "কঠৌড়। মোর সিকোড়॥" পুথি।

চম্পকদাম আলিঙ্গই কান। লাজে গোরি সুখে হরল গেয়ান ॥
বিগলিত কেষ দুহুঁরে গলিত পিধান। গোবিন্দদাস দুহাঁর বলি[১] জান ॥
[পৃঃ ১০৪] ॥

ইথে অন্তরে হরি মন্দিরে গেল। সঙ্গে সখা ব্রজবালক মেল ॥
ব্রজসুত প্রবেসিত নিয় নিয় ঠাম। গোপিকা মনোরথ কাম ॥
নিয় সুত পাই সভে করতহি কোর। ভোজন করাআ যত হোত বিভোর ॥
তব নন্দক মন্দিরে নন্দ-কিসোর। নিরখি জসোমতী হোত বিভোর ॥
চরণ পাখালি মুছই সব যঙ্গ। ভোজন করায়ত প্রেম তরঙ্গ ॥
মুখ কর ধোই দেয়ত গুয়া পান। রতন পালঙ্কে সুতায়ল কান ॥
তব জসোমতি চলল গৃহ কাযে। সুতি রহল হরি মন্দির মাঝে ॥
গোবিন্দদাস চিতে হরসিত ভেল। সয়ন তেজি হরি কুঞ্জহি গেল ॥
[পৃঃ ১০৪] ॥

চলু অভিসারে বিনোদিনি রাধে নব নব রঙ্গিনি সাথে।
বামচরণ মূলে সতদল কমল কামজয় ধনুসর হাথে ॥
সিথাএ সিন্দুর দূরে রবি কিরণ চৌদিকে মলয়জ বিন্দু।
হেরইতে লাজ সায়রে সশী ডুবল দিনে দিনে খিন ভেল ইন্দু ॥
কুঞ্জর দমণ ভূষণ করু সুন্দরি মদন জিনিতে ধনী সাজ।
পহিরল ধৌতবসন নিবি রঙ্গন কটিতটে কিঙ্কিনি বাজ ॥
নব নব রঙ্গিনি চামর ঢুলায়ত জয় দিয়া বন পরবেষে।
হেরইতে দুহু মুখ দুহু ভেল আকুল বলিহারি গোবিন্দদাসে ॥ (পৃঃ ১০৭)।

অভিসারের এই পদটী গোবিন্দদাস কবিরাজের অযোগ্য নহে। তুলনীয়, অপ্রকাশিত পদাবলী, পদসংখ্যা ৮০।

আজু কেনে আরে সখি তনু মোর কাঁপ।
নিরবধি লোরে (নয়নে) নয়নযুগ ঝাঁপ ॥
অকুষল সুচক তব কাহে হেরি। মনছন কাহে করু বেরি ॥
জব হাম হেরনু গৌউর বয়ান। তৈখনে পুন পুন অরুণ নয়ান ॥
তৈখনে বুঝনু বচনবিশেষ। গোরা মুঝে ছোড়ি চলব দুরদেষ ॥
তব হাম ছোড়ব জিবনক সাধ। গোবিন্দদাস কহে বড় পরমাদ ॥ [পৃঃ ১০৮] ॥
অনাথ সমান রাই রহিলা পড়িয়া। নিশ্বাষ ছাড়এ ঘন হা কৃষ্ণ বলিয়া ॥
উচ্চস্বরে কান্দে রাই বিলাপ করিয়া। কোথা গেলে অহে স্যাম অনাথ ছাড়িয়া ॥
দেখা দিয়া মোর প্রাণ রাখ একবার। জনমিয়া হেন কভু না করিব আর ॥
গোবিন্দদাসেতে বলে শুন বিনোদিনী। অন্তরে ভাবিয়া দেখ স্যাম গুনমনী।
(পৃঃ ১২৬) ॥

১। বলিহারি (?)।

এই কবিতাটীর রচনারীতি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়।

একদিন মহাপ্রভু নবদ্বিপ পুরে। সঙ্গে লয়্যা ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করে ॥
সংকির্ত্তন মাঝে গোরা আধ আধ হাষ। মনে পড়ে মহাপ্রভুর পুরুব বিলাষ ॥
ঝুলনা ঝুলিব বলী মনেতে পড়িল। সখাগণে গোপীভাব মনেতে করিল ॥
ঝুলনা ঝুলএ গোরা অতি অনুপাম। আনন্দে ভকত সবে ঝুলনা ঝুলান ॥
হেরি গদাধর মুখ মন্দমন্দ হাষ। দুরহি দূর রহু গোবিন্দদাষ ॥ (পৃঃ ১৫৭) ॥

এই পদটী গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচনা বলিয়া মনে হয় না।

বড়াই আশীয়া বলে অতিবড় কুতুহলে সুন অগো রাজার নন্দিনি।
মথুরার পথে জাই পসরা সাজাই রাই গোবিন্দ কদম্বতলে দানি ॥
মথুরার পথে দানি রসীক সে শীরোমণী চল তথা ব্রকভানুসুতা।
সঙ্গে লয়্যা পৃয় সখি মথুরায় চলীলা হাটী দানছলে ভেটীবারে তথা ॥
সিন্দুরে কাজলে রেষ কুসুমে রচিত কেষ জতনে সাজায়্যা রূপডালী।
মুখানি কনক ইন্দু লাবণ্য রষের শীন্ধু মন্দবায় পড়েছে বিজুলী ॥
চলে ব্রকভানুর কুমারি।
রশীক বড়াই তায় দেখায়্যা সুনায়্যা জ্যায় নিকট হইল মধুপুরে ॥
জাইয়া জমুনা তিরে মিলন কদম্ব তলে জেখানে রশীক শীরোমণী।
দানছলে কাছে আশী কহে কিছু হাশী হাশী গোবিন্দদাস ভণে[1] ॥ (পৃঃ ১৮১) ॥

সম্ভবতঃ এই পদটীর রচয়িতাও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

গোবিন্দদাসের অল্প পরবর্ত্তী সময়ের এই পুথিটীতে আমরা এমন অনেক পুরাতন ও নূতন পদ পাইতেছি, যাহা অবিসংবাদিত ভাবে গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচনা। ২৭৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালী কবি ছিলেন, আর এখন তিনি মৈথিল হইতে চলিতেছেন। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি !

পরিশিষ্ট—ক

পদকল্পতরু-ধৃত "গোবিন্দদাস" ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলী পদ-সকলের ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী সূচী।

৩-৫, ১০—১২, ১৯, ২০, ২৭, ৩৯, ৪০, ৪৬, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৬৭, ৭০, ৭৩—৭৫, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯১, ৯৩, ১০০, ১০১, ১১৫, ১২৮, ১৩২, ১৩৯, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৬, ১৭৪, ১৮৯, ১৯২, ১৯৯, ২০০, ২০৪, ২১৩, ২১৭—১৯, ২২৫, ২২৭, ২৩৩-৩৬, ২৬১, ২৬৩—৬৫, ২৭০, ২৭৫, ২৮৭, ৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৩—১৫, ৩১৮—২০, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৫—৭, ৪০৯, ৪২৩-২৫, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৩-৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩—৪৫, ৪৫৩ ৫৫, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৮৯, ৪৯০, ৫০৮, ৫০৯, ৫১৯, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৩৮,

---

১। গোবিন্দদাসের এই বাণী।

৫৪৮, ৫৫৩, ৫৭৪, ৫৭৭, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৮, ৫৯৩, ৫৯৯, ৬০২, ৬০৫, ৬১১, ৬২১, ৬২৩, ৬২৩ক, ৬২৪, ৬২৯, ৬৩০, ৬৪৬, ৬৪৮, ৬৯৫, ৭০৪—১০, ৭১৬, ৭৪৪, ৭৫০, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬৫—৬৮, ৭৭১—৭৩, ৭৭৯, ৭৮৮, ৭৯৪, ৯০১, ৯০২, ৯১০, ৯৪০, ৯৭৯, ৯৮১, ৯৮৬—৯৬, ৯৯৯, ১০০০—৪, ১০০৮, ১০১৪, ১০২৩, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৪১, ১০৫০—৫৫, ১০৬৩, ১০৬৫, ১০৭৩, ১০৭৬, ১০৯১, ১১০৬, ১১১১, ১২৫৫—৫৮, ১২৬৬, ১২৬৮, ১২৭২, ১২৮০, ১২৯৬, ১৩০৫—৯, ১৩১৮, ১৩২০, ১৩২১, ১৩৪২, ১৩৬৭, ১৩৭৩, ১৩৮০, ১৩৮২, ১৩৯৩, ১৪১২, ১৪২২, ১৪২৮, ১৪৩৪, ১৪৩৬, ১৪৬৩, ১৪৬৭, ১৪৭০, ১৪৮৭, ১৪৮৯, ১৪৯৯, ১৫০৯-১১, ১৫১৬, ১৫৫২, ১৫৬৯, ১৫৭৯, ১৬০০—০২, ১৬০৪, ১৬০৯, ১৬১৪, ১৬১৬, ১৬২০, ১৬২৩-২৫, ১৬৩৭, ১৬৪০, ১৬৪৬, ১৬৭১, ১৬৭৩, ১৬৮২, ১৬৮৪, ১৬৮৮, ১৬৯১, ১৭০৪, ১৭১৭, ১৭১৮, ১৭২০-২২, ১৭২৪, ১৭২৭, ১৭২৮, ১৭৩১, ১৭৩৯-৪১, ১৭৫২, ১৮০৬-১৪, ১৮৩০, ১৮৩৩, ১৮৪৮, ১৮৮১, ১৮৮২, ১৮৮৬, ১৮৮৭, ১৮৯০, ১৮৯৩—৯৬, ১৯০১, ১৯০৪, ১৯১০—১২, ১৯১৪, ১৯২০-২৩, ১৯৩৪-৩৮, ১৯৫১, ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৮৮, ২০১৩, ২০৩৯, ২০৪০, ২০৭৫, ২০৭৬, ২০৮০, ২০৮৪, ২০৯৮, ২১১২, ২১৩৩, ২১৩৫—৩৮, ২১৪০, ২২১৪—২২১৬, ২৩৩৫, ২৩৮৬, ২৪০৭, ২৪১২, ২৪১৪—১৬, ২৪১৯, ২৪২০, ২৪২২—২৬, ২৪২৮—৩২, ২৪৩৪, ২৪৩৭, ২৪৪২, ২৪৬৩, ২৪৬৪, ২৪৬৬, ২৪৬৮, ২৪৭৮, ২৪৮৪—৮৬, ২৫১৮, ২৫৩৯, ২৫৪২, ২৫৪৫, ২৫৫০, ২৫৫৩, ২৫৭৮, ২৫৯৪, ২৬২৮, ২৬৩২, ২৬৩৯, ২৬৪৭, ২৬৫০, ২৬৫২, ২৬৮৬, ২৬৯৩, ২৬৯৫, ২৭১২—১৪, ২৭৩২, ২৭৩৪, ২৭৩৭, ২৭৩৮, ২৭৪৫, ২৭৫০, ২৭৫২, ২৭৬১, ২৭৬৩, ২৭৬৬—৭৫, ২৭৭৯, ২৭৮৩, ২৭৮৪, ২৮০৬, ২৮০৭, ২৮১০, ২৮১১, ২৮১৪, ২৮২৯, ২৮৩১, ২৮৩২, ২৮৪৬, ২৮৬৩—৬৬, ২৯২২, ২৯২৫, ৩০১২।

পরিশিষ্ট—খ

গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলী পদসমূহের

অকারাদিক্রমে

সূচীপত্র।

[* চিহ্নিত পদগুলি পদামৃতসমুদ্রে আছে।

† চিহ্নিত পদগুলি গোবিন্দদাস কবিরাজ-রচিত বলিয়া রাধামোহন ঠাকুর, নরহরিদাস প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

‡ চিহ্নিত পদগুলি সজনীবাবুর পুথিতে আছে।]

শ্রীসুকুমার সেন

কবিশেখরের বিদ্যাসুন্দর

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (ষট্‌ত্রিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা) শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকামঙ্গল" নামে প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। প্রবন্ধ ছাপা হইবার পূর্ব্বে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পুথির দুইটি সংস্কৃত শ্লোক আমার বররুচিকৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথির মধ্যে পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। পুথি মিলাইয়া শ্লোক দুইটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এক্ষণে আনন্দের বিষয় এই যে, আমি অন্যত্র উহার সন্ধান পাইয়াছি।

স্নান ব্যপদেশে সরোবরতীরে যখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন কবিশেখরের বিদ্যা—"কমলে খঞ্জন বসিতে দেখিয়া সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইঙ্গিতে সুন্দরকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল"। শ্লোকটি লিপিকার-দোষে অশুদ্ধ লিখিত হইয়াছে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত না করিয়া একটু নমুনা দিলাম,—

"অবোধ বিপিনায়তে প্রিয়সখিমনাঃ পিজ্ঞানতে

* * * *

* * * পিজ্ঞমায়তে বিরচঞন সাক্ষাবিক্রিতি পিতিতঃ।

এই শ্লোকটি জয়দেবের গীতগোবিন্দ-কাব্যে পাইয়াছি।—

"আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ন্ শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥"

(৪র্থ সর্গ, ১০ম শ্লোক)

কবিশেখরের দ্বিতীয় শ্লোকটি ইহার উত্তররূপে সুন্দরের মুখে দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকটি পূর্ব্বের ন্যায় লিপিকার-প্রমাদ-দুষ্ট। কবিশেখরে উহার অবস্থান এইরূপ,—

এমত বৈসে কমলে ভ্রমরি
দেখিয়া কুমার কিছু বলেন চাতুরি।
"পূর্ব্বং যত্র সমো তয়া রতিপতেরাসাদিতা সিদ্ধয়ে

ভয়স্তৎকুচকুম্ভপরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥"

এই শ্লোকটিও গীতগোবিন্দে পাইয়াছি :—

"পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্ম্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাবলীং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥"

(৫ম সর্গ, ২য় শ্লোক, গেয় অংশের পরেই)।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

ঋগ্বেদের অশ্বদেবতা

আমরা ঋগ্বেদে অশ্বের বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই। যতগুলি দেবতার স্তুতি আছে, প্রায় সকলেরই রথ ও রথের অশ্বের কথা পাওয়া যায়। অনেক স্থলে যে রশ্মি অথবা আলোককে অশ্ব শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এ ভাবে অশ্বের উল্লেখ ব্যতীত আমরা চারি প্রকার অশ্বের উল্লেখ—উল্লেখ কেন, তাহাদের স্তুতি পর্য্যন্ত দেখিতে পাই; ইহাদিগকে দেবতাগণের স্থানে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে এই অশ্বদেবতা কয়টীর ভৌতিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমতঃ দধিক্রা বা দধিক্রাবন্। ঋগ্বেদের নানা স্থলে (৪।৩৯।৬; ৪।৪০।৪; ইত্যাদি) ইহা অশ্ব নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যাস্ক তাঁহার নিঘণ্টুতে (১।১৪) দধিক্রা অশ্বের এক নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই শব্দের অর্থ দধিক্ষরণকারী। দধিক্রার পক্ষ আছে; এবং তাহার পক্ষ, পক্ষী এবং শ্যেনপক্ষীর পক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে (৪।৪০।২,৩)। তাহাকে শিকারাভিমুখী শ্যেনের সহিত তুলনা করা হইয়াছে: এমন কি, শ্যেনই বলা হইয়াছে (৪।৩৮।৫)। অন্য এক স্থলে তাহাকে হংস বলা হইয়াছে (৪।৪০।৫)।

দধিক্রাকে অতিশয় দ্রুতগামী অশ্ব বলা হইয়াছে (৪।৩৮।২,৯; ৪।৩৯।১)। তাহার যুদ্ধে জয়লাভ এবং দস্যুদিগকে পরাজয় করিবার কথা দেখিতে পাওয়া যায় (৪।৩৮।১-৩,৭)।

দধিক্রাকে উষা (৪।৩৯।২; ৪।৪০।১; ২০।১০১।১), অগ্নি (৩।২০।১,৫), সূর্য্য (৪।৪০।১; ৭।৪৪।২-৫), অশ্বি (৪।৪০।১), জল (৪।৪০।১), বৃহস্পতি (৪।৪০।১) এবং আঙ্গিরস জিষ্ণুর (৪।৪০।১) সহিত স্তুতি করা হইয়াছে। দেখা যায় যে, দধিক্রা অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা উষার সহিত অধিকতমভাবে জড়িত। এক্ষণে দধিক্রা কোন্ দেবতা দেখা যাউক। আমরা এ সম্বন্ধে তিনটী মত দেখিতে পাই। রথ্ এবং গ্রাস্‌মান সাহেব ইহাকে অশ্বরূপে সূর্য্যের গোলক মনে করেন। বর্গেইন্ সাহেব বলেন যে, সূর্য্য এবং বিদ্যুৎরূপী অগ্নিকেই দধিক্রা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। লুদ্‌ভিগ্ পিশল্, ব্রাদ্‌কে এবং ওল্‌ডেনবার্গ্ সাহেব ইহাকে প্রকৃত ঘোটক বলিয়া মনে করেন; কোন ঘোড়দৌড়ে দ্রুতগতির জন্য জয়ী হওয়ায় ইহাকে দেবতা-রূপে গণ্য করা হইয়াছে।

আমরা এই তিন মতের কোনটীই গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যখন সূর্য্য এবং অগ্নির সহিত দধিক্রার স্তুতি করা হইয়াছে, তখন ইহাকে সূর্য্য অথবা অগ্নি বলিয়া মনে করা যায় না। পুনশ্চ ইহার পক্ষ থাকায় আমরা কিরূপে ইহাকে পার্থিব ঘোটক বলিয়া মনে করিতে পারি?

আমরা দধিক্রাকে Pegasus নামক অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ বলিয়া মনে করি। এই তারকাপুঞ্জে বহু দিন হইতে একটী সপক্ষ অশ্ব কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা অশ্বিনী নক্ষত্রের (অশ্বিদ্বয়ের) নিকটে অবস্থিত। ইহা কুম্ভরাশির উপরেই অবস্থিত এবং ইহার পদ হইতে

* ১৩৩৫, ১৭ই চৈত্র, হাওড়া, মাজুগ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

জল ক্ষরণ কল্পনা করা হইত। পুনশ্চ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০।৩৫০০ বৎসরে বিষুবদ্বৃত্ত ইহার উপর পতিত হইত এবং দক্ষিণ অয়নান্ত সম্ভবতঃ ইহার নিকটস্থ ছিল; সুতরাং শীত ঋতুতে পরিষ্কার আকাশে প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ইহা দৃষ্ট হইত। এই সকল কারণে ইহা উপরোক্ত দেবতাগণের সহিত স্তুত হইত বলিয়া মনে করা যায়। ইহার সংস্থানের বিশেষত্বের জন্য ইহার গতি অতিশয় দ্রুত দেখাইত বলিয়া ইহার দ্রুতগতির উল্লেখ আছে; সুতরাং ইহাকে যুদ্ধজয়ী বলা হইত। গ্রীসদেশীয় উপাখ্যানে ইহার কথা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, তার্ক্ষ্য নিঘণ্টুর মতে (১।১৪) ইহা অশ্বের একটী নাম। ঋগ্বেদের দুই স্থলে ইহার নাম আছে; এবং তিনটী ঋকে ইহার স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায় (১।৮৯।৬; ১০।১৭৮।১—৩,)। মঙ্গল প্রদানের জন্য অরিষ্টনেমি (যাহার রথের নেমি অহিংসিত) তার্ক্ষ্যের স্তব আছে। তার্ক্ষ্যকে অতিশয় বলবান্, সংগ্রামে জয়শীল এবং শত্রুবিজয়ী অশ্ব বলা হইয়াছে। তার্ক্ষ্যকে ইন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সায়ন তার্ক্ষ্যকে তৃক্ষের পুত্র বলেন। আমরা (ঋঃ বেঃ ৮।২২।৭) ত্রসদস্যুর পুত্র তৃক্ষির নাম পাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের দুই মত দেখা যায়। Macdonell সাহেব ইহাকে অন্তরীক্ষ অশ্বরূপী সূর্য্য মনে করেন। ফফ্ সাহেব মনে করেন যে, ইহা তৃক্ষির ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া। আমাদের মনে হয় যে, ইহা যথার্থই পার্থিব ঘোটক। কিন্তু তার্ক্ষ্য শব্দের সহিত Turk শব্দের সাদৃশ্য আছে; তজ্জন্য সম্ভবতঃ ইহা তুরস্কদেশীয় ঘোটক হইতে পারে। তার্ক্ষ্যের বল এবং যুদ্ধের কার্য্য করিবার জন্য ইহার স্তব করা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, পৈদ্ব অর্থাৎ পেদুর অশ্ব। ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশ্বিদ্বয় পেদুকে (১।১১৬।৬) শ্বেতবর্ণ (১।১১৬।৬) অশ্ব দিয়াছিলেন। ইহা ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা, দৃঢ়াঙ্গ এবং সেচনসমর্থ (১।১১৮।৯)। ইহা দীপ্তিমান্ (১।১১৯।১০)। পুনশ্চ উক্ত হইয়াছে (ঋ, বে, ৭।৭১।৫) যে, অশ্বিদ্বয় পেদুর জন্য শীঘ্রগামী অশ্ব যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে সূর্য্য বলিয়া মনে করেন। সেচনসমর্থ এবং দীপ্তিমান্ বলায় আমাদের মনে হয় যে, এই অশ্ব Pegasius ভিন্ন অন্য কিছু নয়। পেদু সম্ভবতঃ কোন পার্থিব মানব নহেন। বহু দিন হইতে অন্তরীক্ষে বহু তারকামণ্ডিত এক নরমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। এই অতিকায় পশুপালক নরমূর্ত্তিকে Bootes নামে অভিহিত করা হয়, এই তারকাপুঞ্জ বৈদিক সময়ে Pegasius এর সহিত এক সঙ্গে আকাশে উদিত থাকিতেন। সম্ভবতঃ পেদু এই নৃমূর্ত্তি হইবেন।

চতুর্থতঃ, এতশ। যাস্কে (নিরুক্ত, ১।১৪) ইহাকে অশ্বের এক নাম বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের কয়েক স্থলে (১।৫৪।৬, ১।৬১।১৫; ৫।৮১।৩; ৭।৬৬।১৪; ৭।৬২।২; ইত্যাদি) এতশ অশ্ব বা দ্রুতগামী অশ্ব, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুনশ্চ আমরা ইন্দ্র এবং সূর্য্যের সহিত এতশের সম্পর্ক দেখিতে পাই। এতশ ইন্দ্রের রথ টানে (১।১২১।১৩)। এতশের সহিত সূর্য্যের যুদ্ধের সময় ইন্দ্র সূর্য্যের দ্বিচক্র রথের একখানি চক্র হরণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যাশ্বগণের গতিরোধ করিয়াছিলেন (৪।৩০।৬; ৫। ৯।৫; ৫।৩১।১১)। পুনশ্চ ইন্দ্র সূর্য্যের রথের চক্র জোরে চালাইয়া দিয়া এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন (৪।১৭।১৪।) Macdonell সাহেব এতশকে সূর্য্যের অশ্ব বলিয়া মনে করেন; তিনি আরও বলেন যে, এই উপা-

খ্যানের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব (Macdonell সাহেবের Vedic Mythology পৃঃ ১৫০)। আমাদের মনে হয় যে, এতশ কাল্পনিক মধ্য-সূর্য্য mean sun) এবং আমাদের সূর্য্য প্রত্যক্ষ সূর্য্য (true or apparent sun)। ইন্দ্রকে আমরা উত্তর অয়নান্তের (সম্ভবতঃ দক্ষিণ অয়নান্তেরও) অধিপতি মনে করি। সূর্য্যের গতি প্রত্যহ সমপরিমাণ নহে; তজ্জন্য সময় নির্দ্দেশার্থ এক মধ্যসূর্য্য কল্পনা করা হয়, যাহার গতি সমভাব। আমরা ঘটিকা-যন্ত্রে যে সময় দেখি, তাহা কাল্পনিক সূর্য্য হইতে নির্ণীত হয়। প্রত্যক্ষসূর্য্য প্রত্যহ ভিন্ন গতিতে ভ্রমণ করিয়া এক বৎসরে আবার প্রায় পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। মধ্যসূর্য্য প্রত্যহ সমগতিকে এক বৎসরে আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পড়েন। দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ-সূর্য্য কখনও মধ্যসূর্য্যের অগ্রে এবং কখনও মধ্যসূর্য্যের পশ্চাতে গমন করিতে থাকেন। এক বৎসরে মধ্যসূর্য্য এবং প্রত্যক্ষসূর্য্য চারি বার একত্র মিলিত হন। এই মিলন সময়ের নাম শূন্য কালসমীকরণ বলা হয়। মধ্য এবং প্রত্যক্ষসূর্য্যের মিলনকে "এতশ এবং সূর্য্যের যুদ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মিলন উত্তর অয়নান্তের সন্নিকটে সংঘটিত হইত বলিয়া এতশ ও সূর্য্যের যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তার কথার অবতারণা হইল। যখন প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি মধ্যসূর্য্যের গতি অপেক্ষা মন্দতর হইত, তখন ইন্দ্র সূর্য্যের রথ অবরোধ করিলেন, এইরূপ বলা হইত। আবার যখন প্রত্যক্ষসূর্য্যের গতি মধ্যসূর্য্যের গতি অপেক্ষা শীঘ্রতর হইত, তখন ইন্দ্র এতশকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন, এইরূপ মনে করা হইত। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক ঋষিগণ কালসমীকরণ বিষয় অবগত ছিলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে এই চারিটী অশ্বদবতা সম্বন্ধে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিমত কতটা নির্ভুল, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন।

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ

ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি ময়ূরভট্ট

এ কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা কেহই ময়ূরভট্টের পুথি ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-লেখক এ গ্রন্থের সন্ধান পান নাই। আর কেহও পান নাই। কেবলমাত্র 'বৌদ্ধগান ও দোহা'-সম্পাদক ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় ময়ূরভট্ট-লিখিত ধর্ম্মমঙ্গলের একখানি পুথির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে পুথিখানি এখন আর তাঁহার নিকট নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ পুথিখানি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। রাখালদাস বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও আর সে পুথির কোনও সন্ধান পাই নাই। সম্প্রতি আমি ময়ূর ভট্টের একখানি পুথি পাইয়াছি। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রবাসীতে এই পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পুথিখানি প্রকাশ করিবার ভার লইয়াছেন।

এই পুথিখানি হইতে জানা যায়, ময়ূরভট্টের পুথির দুইটী খণ্ড ছিল। প্রথমটী পুরাণ খণ্ড বা সাংজাত খণ্ড, এবং দ্বিতীয়টী চরিতখণ্ড বা লাউসেনের কাহিনী। আমার পুথিখানিতে কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডটী আছে। দ্বিতীয় খণ্ডটী আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে পুথিখানি সম্পূর্ণ, ইহার কোনও অংশ খণ্ডিত নহে। এই প্রথম খণ্ডের শেষভাগে দ্বিতীয় খণ্ডের একটী সূচী দেওয়া আছে। এই সূচী হইতে জানা যায় যে, ময়ূরভট্টের চরিতখণ্ডটী দ্বাদশ 'মতি' বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল।

"প্রথম মতীতে আছে সৃষ্টিপ্রকরণ।
রঞ্জার উৎপত্তি ইছায়ের বিবরণ॥
দ্বিতীয় মতিতে হরিচন্দ্র উপাখ্যান।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা পুত্রবর পান॥
তৃতীয়েতে শিশুচুরি মন্ত্রিমন্ত্রণায়।
মল্লশিক্ষা দুর্গার ছলনা আখড়ায়॥
চতুর্থেতে মল্লবধ ফলক গঠন।
কুম্ভীরাদি বাঘজন্ম বাঘের নিধন॥
পঞ্চমে বারুইরঙ্গ সুরিক্ষাদলন।
ষষ্ঠমেতে হস্তিবধ দেশে আগমন॥
সপ্তমেতে কাউরে কলিঙ্গাপরিণয়।
অষ্টমে সম্বন্ধ আর লোহগণ্ডাক্ষয়॥
নবমেতে মায়ামুণ্ড ইছাই-নিধন।
দশম মতিতে অতিবৃষ্টিনিবারণ॥
একাদশে ধর্ম্মসেবা ময়না নিধন।
দ্বাদশে পশ্চিমোদয় স্বর্গআরোহণ॥"

এই বারোটী 'মতি' বা পরিচ্ছেদ আছে বলিয়াই চরিতখণ্ডের নাম 'বারোমতী' এবং ইহার আনুষঙ্গিক উৎসবের নাম 'বারোমতী গাজন'। এই 'বারোমতী' শব্দটী এক্ষণে উচ্চারণে ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বর্ত্তমান উচ্চারণ 'বার্ম্মতী'। ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এরূপ উচ্চারণ-সংক্ষেপ বিচিত্র বটে। কারণ, 'দ্বাদশ' শব্দ প্রাকৃতে 'বারহ' আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহার সংক্ষেপে বাঙ্গালা 'বারো' হইয়াছে। ইহার অন্ত্য স্বর উচ্চারিত হওয়াই স্বাভাবিক; না হওয়াই অস্বাভাবিক। 'বারো' কিম্বা 'তেরো' শব্দের সহিত সমাসনিষ্পন্ন অন্য কোনও শব্দ বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় জীবিত থাকিলে ধ্বনি-পরিবর্ত্তনরীতির উদাহরণ পাওয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ কোনও সমস্ত পদ বাঙ্গালায় নাই। 'বারোয়ারী' শব্দ ঠিক অনুরূপ নহে। কারণ, ইহার ব্যুৎপত্তিতে 'বারো' শব্দ আছে কি না, জানা যায় নাই। 'বারো ভুঞা' শব্দ সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে নাই। 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদী' কত দিনের প্রবচন জানি না। কিন্তু এখানে 'তেরো নদী' সংক্ষিপ্ত আকারে 'তের্নদী' হয় নাই।

যাহাই হউক, 'বারোমতী' কথাটা ছাড়িয়া দিয়া ময়ূরভট্টের কথাই ধরা যাউক। ময়ূর ভট্টই যে ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি, সে কথা আমরা পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গলকারদিগের নিকট জানিয়াছি। তাঁহারা প্রায় সকলেই ময়ূরভট্টকে নমস্কার করিয়া বা অন্য কোনও প্রসঙ্গে ময়ূরভট্টের নাম করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর গ্রন্থে আছে,—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥
জগতঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।
ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি তাহার যশ অখিল ভরিয়া॥"—৯ পৃঃ।
"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥"— ১১৬, ১২০পৃঃ।
"বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান॥"—১৮১, ১৮৪, ১৯২, ২০৯ পৃঃ।

ঘনরামের গ্রন্থে পাওয়া যায়,—

"স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত-আদ্যকবি॥"—৫পৃঃ।
"এত বলি প্রবোধিয়া করিল বিদায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥"—২৬পৃঃ।

"ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥"—১৪৭ পৃঃ।

গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,——

"আছিল ময়ূরভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ার ছাঁদে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্ম শতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥"

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ৩৮২পৃঃ।

আরও—

"ময়ূরভট্টকে বান্ধিয়া (বন্দিয়া ?) মস্তকে
সীতারাম দাস গায়॥"—বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, ৪১০পৃঃ।

এই সকল উল্লেখ হইতেই এ কাল পর্য্যন্ত আদিকবি ময়ূরভট্টের নাম বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই আদিকবি কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে মুগ্ধ ভক্তবৃন্দকে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল শুনাইয়া ঐহিক সুখ ও পারত্রিক পুণ্য অর্জ্জনের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তাঁহার গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। তবে তাঁহার গ্রন্থখানিতে এমন একটী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যাহাতে তাঁহার রচনাটীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থখানি বিলুপ্ত হইবারও বোধ হয়, তাহাই অন্যতম কারণ। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতৃগণ সকলেই দেবাদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূরভট্ট রাজাদেশে তাঁহার গান রচনা করিয়াছেন। যে ধর্ম্মগ্রন্থ দেবাদেশে রচিত, ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণের নিকট তাহার মূল্য অনেক। রাজাদেশে রচিত ধর্ম্মগ্রন্থের কি সেরূপ সমাদর হইতে পারে ? রাজা ত ধর্ম্মগুরু নহেন। আবার কোনও বিশিষ্ট রাজার আদেশ তাঁহার রাজ্যের সীমানার মধ্যেই সমাদৃত হইতে পারে। কিন্তু পররাজ্যে তাহার সমাদর হইবার কোনও কারণ নাই। আবার মহারাজ অশোকের আদেশ তাঁহার রাজত্ব-কালেই সমগ্র ভারতবর্ষে সম্মানিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগে সে আদেশের সম্মান কেহ করে নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই দেবাদেশে রচিত ধর্ম্মমঙ্গলগুলি পাইয়া আমাদের দেশের লোকে ময়ূরভট্টকে ভুলিতে পারিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকের নিকট অশোকের শিলালিপির ন্যায়ই ময়ূরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলখানি মূল্যবান্। ময়ূরভট্টের আত্মবিবরণ এইরূপ,—

"শ্রীগুরুচরণ সেবি　　রচি বারমতি কবি
ধর্ম্মসেন পাইয়া সন্ধান।
পাঠাইয়া অনুচরে　　নিমন্ত্রিল সমাদরে
গেলাম রাজার সন্নিধান॥
কহিনু সাংযাত মত　　শ্রীধর্ম্মমাহাত্ম্য যত
স্মরিয়া শ্রীগুরু নিরঞ্জন।

হয়ে নৃপ শুদ্ধমতি শুনিলেন বারমতী

ময়ূরক ভট্ট বিরচন ॥—৪ পৃষ্ঠা।

ময়না দেশাধিপতি রাজা ধর্ম্মসেন লাউসেনের পৌত্র।* অযোধ্যাধিপতি দশরথের ন্যায় মৃগয়া করিতে গিয়া ধর্ম্মসেন না জানিয়া ব্রহ্মহত্যা করিয়া ফেলেন। তার পর অনুতাপ-গ্রস্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে ধর্ম্মঠাকুর বলিলেন,—

"ধর্ম্মের মাহাত্ম্য তত্ত্ব শ্রবণে হইবে মুক্ত
ব্রাহ্মণে করিবে বহু দান।
যাবে ব্রহ্মহত্যা পাপ না করিও মনস্তাপ
বার দিন শুনিবে পুরাণ॥
তুমি হও পৌত্র যার যে সব চরিত্র তার
তাহাই পুরাণ বারমতী।
বৈশাখী তৃতীয়াদিতে হবে পাঠ আরম্ভিতে
পূর্ণিমাতে পূর্ণ কর পুথি॥
দ্বিজরূপী নিরঞ্জন সেনেরে কহি স্বপন
অদৃশ্য হইল ত্বরাপর।
নয়ন মেলিয়া রায় কারে না দেখিতে পায়
ভাবিলেন তিনি মায়াধর॥"—৪খ পৃঃ।

রামাই পণ্ডিত রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনের পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং ময়ূরভট্ট বা ধর্ম্মসেনের কাল নির্ণয় হইলে রামাই পণ্ডিতের কাল নির্ণয়ে কোনও গোলযোগ থাকিত না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কবি তাঁহার স্থিতিকালের কোনও উল্লেখ করেন নাই। অন্য কোনও কবিও করেন নাই। তিনি ময়না দেশের রাজা ধর্ম্মসেনের নাম করিয়াছেন। কিন্তু ইনি কে?

* ধর্ম্মসেনের বংশলতা এইরূপ,—

কনকসেন
|
কর্ণসেন
|
লাউসেন
|
চিত্রসেন
|
ধর্ম্মসেন

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মালদহ হইতে প্রাপ্ত শিবের গাজনে আছে,—

"কাউসেন দত্তের বেটা নয়সেন দত্ত।
যে জন পৃথিবীতে আনিল মহেশ্বর ব্রত॥"

'কাউসেন' এখানে কর্ণসেনেরই অপভ্রংশ। অন্যথা লাউসেন ব্যতীত অপর নামগুলি সংস্কৃত শব্দেই পাওয়া যাইতেছে। ধর্ম্মঠাকুর সাধারণতঃ বিষ্ণুরই অবতার-ভেদ বলিয়া উক্ত হইলেও অনেক স্থলেই তিনি শিব। তাঁহার আসন কখনও কৈলাসে, কখনও বৈকুণ্ঠে।

ময়ূরভট্টের কালনির্ণয়

ময়ূরভট্টের কালনির্ণয়ের দুইটী পন্থা দেখা যাইতেছে। লাউসেনের কাল নির্ণীত হইলেও ময়ূরভট্টের কালনির্ণয় হইতে পারে। কারণ, লাউসেনের পৌত্রের প্রজা ময়ূরভট্ট। আবার পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের কাল নির্ণীত হইলেও তাহা হইতে ময়ূরভট্টের কাল অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলগুলি প্রায় সবই বড় আধুনিক। প্রথমতঃ ধর্ম্মমঙ্গল-গুলির কাল আলোচনা করা যাউক।

(ক) যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলের কাল নির্দ্দিষ্ট ভাবে জানা গিয়াছে, সেগুলি প্রায় সবই খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল।

(১) বাঙ্গালা ১১৪১ (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪০) সালের ৪ঠা চৈত্র কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী কালুরায় নামক ধর্ম্মদেবতার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন—এই কথা দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। দীনেশবাবুর হিসাবে একটা ভুল আছে। বাঙ্গালা ১১৪১ সালের ৪ঠা চৈত্র ইংরাজী ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, ১৭৪০ হইবে না।

(২) শাঁখারীনিবাসী নরসিংহ বসুর ধর্ম্মমঙ্গল রচনা ১৬৫৯ শকাব্দের (১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের) ১০ই শ্রাবণ তারিখে আরম্ভ হয়।

(৩) কৃষ্ণপুরনিবাসী ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ,—

শক লিখি রাম-গুণ-রস-সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১ খৃষ্টাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমাংশে শুক্লা তৃতীয়া তিথি ৮ই তারিখে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

(৪) চামোটনিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল, মল্লভূমের অধীশ্বর রাজা গোপাল সিংহের আমলে ১০৩৮ মল্লাব্দে (১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে) রচনা করেন। ইহাঁর স্বহস্ত-লিখিত পুথি একখানি আমার নিকট আছে।

(৫) ইন্দাসনিবাসী সীতারাম দাস ১০০৪ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। সীতারাম দাসের কয়েকখানি পুরাতন পুথির তারিখ ১০৩৪ মল্লাব্দ (১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ), ১০৬০ মল্লাব্দ (১৭৫৪ খ্রীঃ)। এই পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। একখানি মহাভারতের পুথির পুষ্পিকায় এক সীতারাম দাসকে লেখকরূপে দেখিয়াছি। যথা,—

"স্বাক্ষরমিদং শ্রীসীতারাম দাস। পুস্তক শ্রীকাশীচরণ তাঁতী সাং পাত্রসায়ের। ইতি সন ১০৪০।২৪ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত।"

এই ১০৪০ সাল মল্লাব্দ হইবে। তাহা হইলে খ্রীষ্টাব্দ ১৭৩৪ হইবে। এই পুথিলেখকই কি আমাদের কবি সীতারাম দাস? কবির নিবাস ইন্দাস হইতে পাত্রসায়ের আন্দাজ তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(৬) হায়ৎপুরনিবাসী রামদাস আদকের গ্রন্থ ১০৩২ মল্লাব্দ বা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এইগুলি সবই ১৬৯৮ হইতে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত।

(খ) যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলের রচনাকাল নির্দ্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই, সেগুলিও প্রায় সবই উল্লিখিত সময়ের অন্তর্গত অথবা নিকটবর্ত্তী।

(৭) গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুথির তারিখ ১০৭১ মল্লাব্দ (১৭৬৬ খ্রীঃ)। সুতরাং এই পুথিরও রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে ইনি পঞ্চদশ শতকের বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন।

(৮) মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল বিষ্ণুপুরে মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠার (১৬২০--২৬খ্রীঃ) পর এবং মদনমোহন ঠাকুরের বিষ্ণুপুর ত্যাগের (১৭৪৮-৭৮খ্রীঃ) পূর্ব্বে রচিত।

"বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে ॥"—৬খ পৃঃ।

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, বিষ্ণুপুরে মদনমোহনবিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ এখনও স্থানান্তরিত হয় নাই।

ইহা ছাড়া সুরিক্ষার পাটে বন্দী 'বিদগ্ধ বিদেশী পুরুষের' তালিকায় কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, খেলারাম, ঘনরাম প্রভৃতি নামগুলিও নিতান্ত আকস্মিক নহে। কবি সম্ভবতঃ এই সব নামধেয় কবিকে চিনিতেন। তিনি যে মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে আভ্যন্তর প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু ঘনরামের নাম জানিলে তাঁহাকে ঘনরামের সমসাময়িক করিতে হয়। এই সকল অবান্তর প্রমাণের প্রয়োজন এই যে, তাঁহার প্রদত্ত তারিখটী আমাদের নিকট হেঁয়ালীমাত্র।

(৯) রামনারায়ণের পুথির লিপিকাল ১১৯৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ইনিও সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। দীনেশ বাবু ইহাঁকে সপ্তদশ শতকের লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু সেটা কেবলমাত্র অনুমান।

(১০) খেলারামের পুথি হইতে যে তারিখ সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তাহার অর্থগ্রহণ করা কঠিন।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন ॥"

'ভুবন' শব্দে 'তিন', 'সাত' বা 'চতুর্দ্দশ' সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারে। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ শতাব্দীর উল্লেখ করেন নাই, কেবলমাত্র বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন 'বাহাত্তর সালের বন্যা,' 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' ইত্যাদি। বায়ু মাস শব্দে সপ্তম মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাস বুঝাইতে পারে। 'শরের বাহন' বোধ হয় নিতান্তই অর্থশূন্য, অথবা ঐ কার্ত্তিক মাসেরই দ্যোতক। তাহা হইলে শতাব্দীটী ইহাতে আন্দাজে জুড়িয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি ১৬১৪ শক ধরা যায়, তাহা হইলে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। তাহা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলগুলির নিকটবর্ত্তী কাল হইয়া পড়ে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা চলে না।

(১১) রূপরামের একখানি পুথি আমার নিকট আছে। এই গ্রন্থে কবি আত্মবিবরণ দিয়া ছেন। আমি তুলিয়া দিলাম।

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি ছিরামপুর।*
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিসাসয়** পড়ুা পড়ে জার বর্ত্তমানে॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাত্যে সুত্যে বাক্যবান জলন্ত আগুন॥
খাত্যে সুত্যে মন্দবাক্য বলে রত্নেশ্বর।
মনে হইল পড়িতে জাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মনিরাম রায়+ দিল পরিবার ধুতি॥
পথের সম্বল দিল পঞ্চ আনা কড়ি।
গাসণ্ডা পড়িতে জাব ভট্টাচার্য্যের বাড়ি॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য‡ কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
জুমর অমর বেদ (শেষ ?) হল্য অল্প দিনে॥
মাঘ রঘু পড়িল নৈষধ জথাবিধি।
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল সিধি॥
বাখানিতে কারক আগুন জলে তায়।
গুরু শিষ্যে দুজনে অনর্থ বয়্যা জায়॥
তিনবার পুর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চার।
সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার[১]॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
পড়াতে নাড়িল বেটা এখনি বিদায়॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য নবর্দ্দিপে আছে[২]।
ভারথি পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা[৩]॥
এমন বচন সুনি বুকে লাগে ডর।
সুজ্জের সমান গুরু পরম সুন্দর॥
মনে দুঃখ বিষম বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
নবর্দ্দিপে পড়িতে যাইব দিবারাত্তি॥
হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনুর্ব্বার ফিরা আইল ছিরামপুরের গনে॥
আড়ুয়া করিল পাছু ডানি দিগে বাসা।
পুরান জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা॥
ঘুর্যা ঘুর্যা বুলি সুধু পলাসনের বিলে[৪]।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে[৫]॥
বাঘ দুটা দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা তিন কাছাড় খালাম গোপাল দিঘির পাড়ে॥
সন্ধি টীকা পড়িল সুবন্ত টীকা নাঞি।
আপনি কারক টীকা কুড়াল্য গোসাঞি॥
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুথি[৬]।
সম্মুখে দাণ্ডাল জেন ব্রাহ্মণ মুরুতি॥
সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর দুর।
আপুনি বলেন ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম্ম ঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম।
বার দিনের গীত গায় সুন রূপরাম॥
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি।
তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুজ্যা বুলি॥

---

* কবিকঙ্কণের জন্মস্থানের নিকট। রায়না থানা।

** ইঁহার পিতৃদেবের চতুষ্পাঠীতে ১২০ জন ছাত্র ছিল।

+ মণিরাম রায় কে? কোনও ছাত্র? না, গ্রামের জমিদার?

‡ কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম কে?

১। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিষ্যের সহিত তর্ক সহ্য করিতে পারিতেন না।

২। ইনি কে?

৩। মুখে বসন্তের চিহ্ন ছিল।

৪। এখন 'পড়াসন'।

৫। কবিকঙ্কণ-গন্ধ।

৬। এরূপ ধর্ম্মঠাকুরের শিষ্য না হইলে বোধ হয়, তিনি 'আমি রূপরাম' হইতে পারিতেন না।

পুর্ব্বেতে আছিলে তুমি সখা জে চরণে।
অতেব দেখিলে দুটি কমল চরণে॥
এত বলি অনাদ্য আপনি অন্তর্ধ্যান।
তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ॥
দিবসে তিমির ঘোর দেখিতে না পাই।
খুঙ্গি পুথি বান্ধিয়া ঐমনি দিলাম ধাই॥
আকাসে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল।
সাখারি পুখুরে খাল্য পরিপুন্ন জল॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরসন।
প্রনাম করিল গিয়া মাএর চরণ॥
সোনা রূপা দুটি বনি দুয়ারে বসিয়া।
রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুথি লয়্যা॥
হেনকালে আইল তার ভাই রত্নেশ্বর।
দাদাকে দেখিয়া বড় গাএ আইল জ্বর॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা।
পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হল্য হারা॥
দাদা বড় নিদারুন বলে উর্দ্ধস্বরে।
কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি
আইলা ঘরে॥
কাছাড়িল অমর জুমর অবিধান।
বাহিরে সুবস্ত টীকা গড়াগড়ি জান॥
কুড়াল্য জতেক পুথি মনস্তাপ মনে।
তখনি বিদায় আমি মায়ের চরণে॥
সানিঘাট গ্রামে গিয়া দরসন দিল।
পথের পথুকে দেখে জিজ্ঞাসা করিল॥
ঠাকুরদাস পাল[৭] তারা বড় ভাগ্যবান।
না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান॥
আড়াই সের ধানের কিনিল চিড়া ভাজা।
দামুদরের জলে স্নান করিলাম পূজা॥
জলপান করি বস্যা বড় অভিলাসে।
হেন বেলা চিড়া ভাজা উড়াল্য বাতাসে॥
চিড়াভাজা উড়্যা গেল সুধু খাই জল।
খুঙ্গি পুথি বয়্যা জাত্যে অঙ্গে নাঞি বল॥
দিখলনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল।
তাঁতিঘরে ধর্ম্ম বড় পথেতে সুনিল॥
ধাওাধাই তাঁতিঘরে দিল দরসন।
চিড়্যা দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন॥
মনে হল্য পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই।
তাঁতিঘরে ধর্ম্ম ঠাকুর নাঞি দিল খই[৮]॥
দক্ষিণা আনিয়া দিল দস গণ্ডা কড়ি।
দৈবের ঘটনে তার কাণা ডেড় বুড়ি॥
পাঁচ দিন উপবাসে দৈবের ঘটন।
বাহাদুর এড়ানে দিলাঙ দরসন॥
গোওালা ভুমের রাজা গনেস[৯] তার নাম।
রিপুকুলচুড়ামণি বড় ভাগ্যবান॥
তারে গিয়া সপনে কহিলা মায়াধর।
প্রভাতে ভুপতি দিলা মন্দিরা চামর॥
সেই হত্যে গীত গাই ধর্ম্মের আসরে।
অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে॥
রূপরাম গীত গান শ্রীরামপুরে ঘর।
জার কলমে বসিয়া খেলা করে মায়াধর॥
ইতি আদ্যখণ্ড সমাপ্ত॥

রচনাকাল

তিন বান চারি জুগ বেদে জত রয়।
সাকে সনে জড় করিলে জত সন হয়॥
রসের উপরে রস তার রস দেয়[১০]।
এই সনের গীত হইল লেখা কর্যা নেয়॥

৭। ইনি কে?

৮। তাঁতীঘরে খই দিয়া পূজা চলে না।

৯। গোয়ালাভূমের বা গোপভূমের রাজা গণেশ।

১০। উচ্চারণ হইবে 'নেও', 'দেও'। রূপরামের তারিখ নির্ণয়:—
তিন বাণ=৩×৫=১৫, চারি যুগ=৪×২=৮, বেদ=৪, একুনে ২৭। ইহার রসায়ন—৬৬। একুনে ২৭৬৬ বৎসর পাওয়া যায়। শাক ও সন একত্র করিলে ২৭৬৬ বৎসর হয়। শকাব্দ ও সনাব্দে ৫১৫ বৎসরের প্রভেদ। সুতরাং ২৭৬৬+৫১৫=৩২৮১ বৎসর। শকাব্দকে দ্বিগুণিত করিলে ৩২৮১ বৎসর হয়। সুতরাং ইহার অর্দ্ধেক

রূপরামের রচনাকালবিষয়ক কবিতাটী আমাদিগের নিকট প্রহেলিকামাত্র। ইহা হইতে তাঁহার কালনির্ণয়-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। হয় ত এই প্রহেলিকাতেও লিপিকার-কৃত ভ্রমপ্রমাদ বিজড়িত হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসী পত্রিকায় ইহার একটী পাঠান্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু কোনওরূপ কষ্ট-কল্পিত অর্থ দ্বারা বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা হইতে পারে না। তবে রূপরামের আত্মবিবরণীতে যে সকল ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম আছে, তাঁহাদের ইতিহাস জানিতে পারিলে রূপরামের কালনির্ণয় সুগম হইতে পারে। গোপভূমের রাজা গণেশের বিষয়ে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। সে যাহাই হউক, রূপরাম বোধ হয়, নূতন যুগের ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের অগ্রদূত; কারণ, তিনি 'আদি রূপরাম' নামে অভিহিত। সুতরাং অনুমান করিয়া তাঁহাকে সপ্তদশ খ্রীষ্ট শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোনও সময়ে ফেলিতে পারা যায়। ১৬৭৫-৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিলে, আপাততঃ চলিতে পারে।

(১২) শ্যাম পণ্ডিত বীরভূমবাসী। ইঁহার পুথিখানি আমি দেখি নাই। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে ইঁহার একখানি পুথি আছে। বোলপুর বিশ্বভারতী হইতে শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে। ইনি দেশ হিসাবে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের দূরবর্ত্তী। হয় ত কাল হিসাবেও হইতে পারেন। বর্ত্তমানে আমি তাঁহার বিষয়ে কোনও আলোচনা করিলাম না।

(১৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দ্বিজ ক্ষেত্রনাথকৃত ধর্ম্মপুরাণ গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি আছে। পুথিখানিতে কেবলমাত্র আটখানি পাতা আছে। এ গ্রন্থকারের বিষয়েও আমরা খবর জানিতে পারি নাই।

(১৪) সেনপণ্ডিত ও প্রভুরামের পুথি আমি দেখি নাই। দীনেশবাবু ইঁহাদের নামমাত্র করিয়াছেন। কোনও পরিচয় দিতে পারেন নাই।

(১৫) দ্বিজ ভগীরথকৃত একখানি সাড়ে তিন পাতায় সম্পূর্ণ ধর্ম্মমঙ্গলের পুথির কথা আমার নোট-বহিতে লেখা আছে। পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ইহাঁর বিষয়ে আর কোনও কথা আমার মনে নাই।

(১৬) বলদেব চক্রবর্ত্তী নামক আর একজন ধর্ম্মসঙ্গীতকারের নাম দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে আছে। কিন্তু ইঁহার কোনও পরিচয় নাই। এটা কি 'সহদেব চক্রবর্ত্তী' স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ ?

এই সকল ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে,

১৬৪০||০ বা ১৬৪১ শকাব্দ গ্রন্থরচনার কাল। তাহাতে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু ইনি যদি ঘনরামের পরবর্ত্তী, তবে আদি রূপরাম হন কি প্রকারে ? ঘনরাম কিন্তু রূপরামের নাম করেন নাই।

যদি শতাব্দ বাদ দিয়া হিসাব ধরা যায়, তাহা হইলে ২৭+৬৬=৯৩ হয়। ৫৫ শকাব্দ ও ৩৯ সন এক বৎসরে পড়ে, দুয়ের একুনে ৯৩ পাওয়া যায়। যদি ১৫৫৪ শকাব্দ ও ১০৩৯ সন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এ হিসাব চলে। তাহাতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। সবটাই কিন্তু অনুমান। চারি যুগে ১৬ ধরিলে যোগফল ১০১ হয়। তাহাতে ৫৮ শকাব্দ হয়। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। এটা কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বের বা শত বৎসর পরের তারিখও হইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ৬০।৭০ বৎসরব্যাপী কালকে ধর্ম্মমঙ্গলের নূতন যুগ বলা যাইতে পারে। এই কালের পূর্ব্বে কোনও ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। স্থান হিসাবে বিচ্ছিন্ন বলিয়া আমি শ্যাম পণ্ডিতকে এই যুগপ্রবর্ত্তকদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলাম। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই সে বিষয় আলোচনা করিবার সময় আসিবে।

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ও মানভূম অঞ্চলে বহু-স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানটীকেই ধর্ম্মমঙ্গলের উৎপত্তিস্থান বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে এই সকল ধর্ম্মমঙ্গল যুগপৎ বহু স্থানে রচিত হইতেছিল, সে সময়ে যে, দেশের লোক লাউসেনের লড়াইয়ের গান শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়দেশ যে এক সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের প্রতি একটা উৎকট ভক্তি-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং ধর্ম্মঠাকুর মাঠে, পথে, গাছতলায়, যেখানে যাহাকে পাইতেছিলেন, তাহাকেই গান রচনা করিবার জন্য স্বপ্নাদেশ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহার মূলে কি সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারে না?

(১) খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্ত্তুগিজগণ এ দেশে বহু উৎপাত করিয়াছিল। (২) ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহের কীর্ত্তিতেও দেশবাসী চঞ্চল হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। (৩) ইংরাজ, ফরাসী ও ডচগণ এই সময়েই এ দেশে অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছিলেন। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারা নবাবের অনুমতি লইয়া কলিকাতা, চন্দননগর ও চুঁচুড়া নগর প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা। (৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র ও বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে সমস্ত দেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। (৫) ঐ সময়ে যখন ভাস্কর পণ্ডিত বর্গীদিগকে লইয়া এ দেশে উপস্থিত হন, তখন আবার কীর্ত্তিচন্দ্র ও গোপাল সিংহ পরস্পরের মধ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহারাষ্ট্রীয় আততায়িগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন।

এই যুগটী দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের ইতিহাসে অরাজকতার যুগ। সুতরাং তাহাদিগের উত্তেজিত চিত্তে দেশবাসিগণ তাহাদের প্রাচীন যুগের বীর লাউসেনের বীর্য্যকাহিনী শুনিতে আগ্রহান্বিত হওয়াতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না বলিয়া ধরিয়া লইলে বড় একটা সাংঘাতিক ভ্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই কারণেই এ কালে এতগুলি ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই যুগের পূর্ব্বে বহুকাল ধর্ম্মমঙ্গল রচনায় কোনও কবি মনোনিবেশ করেন নাই। আর করিলেও তাঁহাদের কাব্য আমাদের নিকট বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র ময়ূরভট্টের গ্রন্থ বোধ হয়, সকলেরই উপজীব্য ছিল।

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই সকল কবির কালনির্ণয় হইলেও ময়ূরভট্টের আবির্ভাব-কালের বিষয়ে কোনও অনুমান সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং ময়ূরভট্টের কালনির্ণয়ের জন্য আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

অতঃপর লাউসেনের কালনির্ণয়-চেষ্টা করা যাউক। কারণ, লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেন বা তৎপুরোহিত ময়ূরভট্ট লাউসেনের সময় হইতে আন্দাজ ৫০।৬০ বৎসর পরবর্ত্তী কালের লোক হইবেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—

ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভূঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণপরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত॥
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥
প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয়।
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয়॥

* * * *

হাতী হতে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্মদোষে॥

* * * * *

করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ।

* * * * *

কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দিখানা॥

* * * *

এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর।
সেইখানে ঘোষের বন্ধন করে দূর॥

* * * *

রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হইল গোয়ালার॥
পুত্র তার ইছাই প্রবল দিনে দিনে।
মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে॥

* * * *

তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সোমঘোষ বেটা হতে হল সর্ব্বনাশ॥
পুত্র তার ইছাই ঈশ্বরী যার সখা।
তার হস্তে ছিল মোর অপমান লেখা॥
তোমার দোহাই রদ, আমি হৈনু দূর।
ত্রিষষ্টী ঘুচায়ে নাম হয়েচে ঢেকুর॥

কোপে রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি।
বেন্ধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥

মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশাদোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয়॥

* * * * *

[ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর]
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা॥
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল॥

এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল নামক কোনও বিখ্যাত সার্ব্বভৌম নরপতির মৃত্যুর পর যখন তাঁহার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁহার সামন্ত-রাজগণের মধ্যে সোমঘোষ নামক একজন গোয়ালা ছিল। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অপর একজন সামন্ত-রাজা। সোমঘোষের সহিত গৌড়েশ্বরের সদ্ভাব ছিল, কিন্তু তৎপুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের অধীনতা ত্যাগ করিয়া নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এবং অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুরের সিংহাসনে আরোহণ করে। ছয় পুত্র সহ কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের পক্ষ হইয়া ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ করেন এবং সেই যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইয়া পুত্রহীন হন। পুত্রশোকে কর্ণসেন-পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইহার পর গৌড়েশ্বরের উদ্যোগে বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিবাহ হয়। এই কর্ণসেন-মহিষী রঞ্জাবতী গৌড়েশ্বর-মহিষী ভানুমতীর কনিষ্ঠা ভগিনী। বিবাহের পর ধর্ম্ম-ঠাকুরের ব্রত পালন করিয়া পুত্রবর পান এবং তার পর লাউসেনের জন্ম হয়।

লাউসেনের উৎপত্তিবিষয়ক এই আখ্যানটী সকল ধর্ম্মমঙ্গলেই প্রায় অভিন্ন। কোনও কোনও ধর্ম্মমঙ্গলে কর্ণসেনের ছয় পুত্র স্থানে চারি পুত্রের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া আর কোনও বিভিন্নতা দেখা যায় না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার শূন্যপুরাণের ভূমিকায় ধর্ম্মপাল নামক দুই জন পাল-নৃপতির বিষয়ে প্রচুর আলোচনা করিয়া রামাই পণ্ডিত ও লাউসেনকে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালের সময়ে ফেলিয়াছেন। এই আলোচনায় তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন বংশাবলীর প্রামাণ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার রামচরিতের ভূমিকায় লাউসেন ও ইছাই ঘোষকে প্রথম ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের সামন্তরাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ধর্ম্মমঙ্গলের পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। আমি নানা কারণে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতটীকেই সমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ, লাউসেনের সময় যিনি গৌড়েশ্বর, তাঁহার কার্য্যকলাপ কলিঙ্গ দেশে অনেক ছিল, এবং দেবপালদেবও কলিঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বরের পক্ষে সেনা-পতি হইয়া লাউসেন কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন। দেবপালদেবও কামরূপ বিজয় করিয়া-

ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইছাই ঘোষের সহিত লাউসেনের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাম্রশাসনাদিতে এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপুরাণগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত ইছাই বধ-কাহিনীটিকে মিথ্যা কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। একখানি তারিখবিহীন তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ঢেক্করী বিষয়ের সামন্ত-রাজা ধবল ঘোষের পুত্র ঈশ্বর ঘোষ নিব্বোকশর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণকে দিগ্‌ঘ্যাসোদিয়া নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে ঐ তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের। আবার সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের ২।৫ শ্লোকের টীকায় রামপালের সভায় সমাগত সামন্ত ভৌমিকগণের মধ্যে ঢেক্করীয় সামন্ত প্রতাপসিংহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাম্রশাসনোক্ত ঈশ্বর ঘোষকেই ইছাই ঘোষ বলিয়া সনাক্ত করিতে চাহেন। কিন্তু ধবল ঘোষকে সে মঘোষে পরিণত করিবার উপায় কি? পিতার নাম উল্লেখ করিবার সময় কি কেহ আভিধানিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে পারে? আর খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দেবপাল রাজার সামন্ত ইছাই ঘোষই বা কেমন করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে তাম্রশাসন দান করিবেন? আমার মনে হয়, দেবপালের ঢেক্করীয় সামন্ত সোম-ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষেরই বংশধর ধবল ঘোষ ও তৎপুত্র ঈশ্বর ঘোষ এবং তৎপরবর্ত্তী প্রতাপসিংহ। কনকসেন-প্রতিষ্ঠিত সামন্ত রাজবংশের সহিত দেবপালের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, তাঁহারা কলিঙ্গ দেশেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুর এই কলিঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ময়নাগড় মল্লভূমে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, তমোলুক অঞ্চলে ধর্ম্মঠাকুর বা ধর্ম্মপণ্ডিতগণের অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে নাই। ধর্ম্মঠাকুরের গাজনও নাই।

কনকসেন-প্রতিষ্ঠিত সামন্ত-রাজবংশের শেষ রাজা ধর্ম্মসেন ময়ূরভট্টকে আহ্বান করিয়া বারোমতী গান শুনিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরের হরিচন্দ্র রাজার সহিত কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলের হরিচন্দ্র উপাখ্যান পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। ইহাতে মহাভারতোক্ত হরিশ্চন্দ্র রাজা ও তৎপুত্র রোহিতাশ্বের (ধর্ম্মপুরাণে 'রুহিদাস' বা 'লুহিদাস' বা 'লুয়ে') নাম এই আখ্যানে বিজড়িত দেখা যায়। কোশল রাজমহিষী শৈব্যার স্থান অধিকার করিয়াছে রাণী মদনা। তাহা ছাড়া দাতা কর্ণের উপাখ্যানটীও এই সঙ্গে জুড়িয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণ স্থানে ধর্ম্মঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই বিভিন্নতাটী প্রকৃত বিভিন্নতা নহে। কারণ, ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে ধর্ম্মঠাকুর মূলতঃ বিষ্ণু দেবতা এবং ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তগণের বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়। সে যাহাই হউক, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা কেবল মাত্র রাঢ়দেশেই সীমাবদ্ধ। এক বাঁকুড়া জেলাতেই পাঁচ শতাধিক ধর্ম্মশিলার পূজা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে। অথচ ঢাকা বা তন্নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ধর্ম্মশিলা একটীও পাওয়া যায় না, ধর্ম্মমঙ্গলের কবিও কেহ ঐ সকল অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তস্থিত কবিগণের গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও ক্ষুদ্র রাজার যশোগাম সম্ভবপর বলিয়া ধরা যায় না। সে বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, যে ধর্ম্মপাল পালবংশের

গৌরবস্বরূপ, যিনি উত্তর-ভারতের সামন্ত-রাজগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাইয়াছিলেন, যাঁহার দরবারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার এবং কীর-বংশের রাজগণ দাসত্ব করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মপালের সময় এবং তৎপুত্র দেবপালের সময় রামাই পণ্ডিত কলিঙ্গদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। লাউসেন দেবপালদেবের কামরূপবিজয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং খৃষ্টীয় দশম শতকই লাউসেনের আবির্ভাবকাল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এই অনুমান অভ্রান্ত হইলে লাউসেনের পৌত্র ধর্ম্মসেন ও তাঁহার রাজকবি ময়ূরভট্টকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এই অনুমানের অনুকূল আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গল-গুলিতে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহের কথা আছে, তাহা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কামরূপের রাজা, ঢেকুরের রাজা এবং ত্রিষষ্টির রাজা—সকলেই হিন্দু। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কলহের কথা ধর্ম্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনীর মধ্যে কোথাও নাই। শূন্যপুরাণে "নিরঞ্জনের উষ্মা" শীর্ষক কবিতাটী উত্তর কালের যোজনা বলিয়া অনেকেই মনে করেন। এরূপ কবিতা বা ইহাতে বর্ণিত বিষয় কোনও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে, বিশেষতঃ চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থসমূহে হিন্দু মুসলমানে কলহের কথা বহু স্থানেই আছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি উত্তরকালে লিখিত হইলেও ইহাদের আখ্যানাংশে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বযুগের ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না কি ?

ভাষা বিচার

ময়ূরভট্টের সমগ্র পুথিখানির ভাষা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কারণ, পুথিখানি আধুনিক এবং ইহার ভাষাটীও আধুনিকত্বপ্রাপ্ত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ভাষা কেমন ছিল, তাহার আদর্শ আমরা এ যাবৎ পাই নাই। বৌদ্ধ গান ও দোহার গানগুলিই এই প্রাচান কালের বঙ্গভাষার একমাত্র নিদর্শন। ইহার পরবর্ত্তী যুগের যে ভাষা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে সংরক্ষিত দেখিতে পাই, ময়ূরভট্টের পুথিখানির ভাষা তাহা অপেক্ষা আধুনিক। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষাও এই প্রকারে লিপিকরদিগের হাতে হাতে এবং গায়কসম্প্রদায়ের মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। ময়ূরভট্টের পুথির আধুনিক ভাষা আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, যদি কালের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে একাদশ শতাব্দীতে ইহার যে রূপ ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে. এই গ্রন্থের ভাষা অবলম্বন করিয়া সেই প্রাচীন ভাষার রূপ আবিষ্কার করা সম্ভব কি না, তাহারই বিচার করা। এই গ্রন্থের ভাষায় কারক-বিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি বা ঐ প্রকার ব্যাকরণঘটিত রূপসমূহ কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষার ন্যায় আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া মূল গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে উত্তর কালে সংযোজিত বহু অংশ ইহাতে থাকিতে পারে, ইহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ। সে আলোচনা গ্রন্থ সম্পাদনকালে করা যাইবে। কেবল মাত্র শব্দসমূহ লইয়াও ভাষার প্রকৃত বিচার হয় না; কারণ, লিপিকরের

দুর্ব্বোধ শব্দ লিপিকর পরিহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কয়েকটী শব্দের আলোচনা করিয়াই এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিব।

সমগ্র গ্রন্থখানিতে আমরা তিন চারিটীর অধিক পারস্য ভাষার শব্দ পাই নাই; এবং সে শব্দগুলিও এরূপ যে, তাহাদের স্থানে অন্য সংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দ মূল গ্রন্থে থাকিতে পারে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 'নফর' শব্দ 'কিঙ্কর' বা 'দাস' শব্দের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থে কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এটীকে 'কিঙ্কর' শব্দ স্থানে উত্তর কালে সংযোজিত শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। মান 'বাজায়' করিবার জন্য গোপগণ চঞ্চল হইয়াছিল। 'বাজায়' শব্দটী স্থানীয় উচ্চারণে অতি আধুনিক শব্দ। এ শব্দটীও সম্ভবতঃ পারস্য ভাষার শব্দ। 'জা' শব্দ পারস্য ভাষায় স্থান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ব' উপসর্গ বাঙ্গলায় 'বা' আকারে 'বা-মাল' প্রভৃতি শব্দে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'বাজায়' শব্দের অর্থ 'স্থিতি-যুক্ত' বা 'সংরক্ষিত' হইতে পারে। কিন্তু এ শব্দটী যে ভাবে খাঁটী আধুনিক বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, তাহাতে এ স্থানে অন্য শব্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই অংশটী সমগ্র ভাবে উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত বা অংশতঃ সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এইরূপ আর একটী শব্দ 'পনীর'। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এই শব্দটীকে অতি আধুনিক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। শব্দটীর উৎপত্তির ইতিহাস আমি জানি না, ব্যুৎপত্তিও জানি না। তবে এটীর বিষয়েও ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনও শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকিতে পারে। আর একটী শব্দ 'বারাম'।

"রাজসভা নিমন্ত্রিয়া,
বসিল বারাম দিয়া,
জিজ্ঞাসিল পারিষদগণে।"

আর দুইটী পারস্য শব্দ ধর্ম্মশিলার নামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে,—'রাজসাহেব' ও 'ফতুসিংহ'। এ দুটী যে পরবর্ত্তী সংযোজন, সে কথা ধরিয়া লইবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না। এতদতিরিক্ত কোনও পারস্য শব্দ গ্রন্থখানিতে নাই। মুসলমানের সহিত হিন্দুর কলহের খবরও এ গ্রন্থের কোনও স্থানে নাই। সুতরাং শব্দ-বিচারে গ্রন্থখানিকে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বযুগের বলিয়া অনুমান করিবার পক্ষে কোনও বাধা দেখি না।

প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায় কতকগুলি নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'আলু', 'মালু', 'তপসী', 'মাউড়', 'গড়ে', 'চানক,' 'বাঙ্গড়', 'ধুত' প্রভৃতি গোয়ালা-দিগের নাম গ্রন্থমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। সবগুলির অর্থ করা যায় না। আবার কোনও কোনও নাম এখনও নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মশিলার নামের মধ্যেও কয়েকটী প্রাচীন নাম পাওয়া যায়;—বাঁকুড়ারায়, দলুরায়, দলমাদল, ঝগড়রায়, ঝর্ঝরীরায় প্রভৃতি। এগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় বাঞ্ছনীয়।

'হাল-বাড়ি', 'বাঁকবাড়ি', 'চৌতারা' প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক শব্দও পাওয়া গিয়াছে। হয় ত এগুলির প্রাচীন রূপ মূল গ্রন্থে ছিল।

প্রাচীন যুগের কবিদিগের ন্যায় স্থানে স্থানে শব্দালঙ্কারের পারিপাট্য দেখা যায়। যথা,—

শমনে শমন দূত ছেড়ে দেয় তারে।—২ ক পৃঃ।

বিধির অবিধি শুনি যত গোপদল।
পুষ্করে দুষ্কর ব্রত করি আচরণ॥ -৮কপৃঃ।

সংস্কৃত কবিদিগের ব্যবহৃত অর্থালঙ্কারও স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বরিষার শেষে যেন কমলের শোভা।—৯ ক পৃঃ।
শুক্লপক্ষ শশী সম দ্বিজের সন্ততি।
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ সুগঠন অতি॥—৯খপৃঃ।

ক্বচিৎ প্রাচীন ভাষার উপর আধুনিক হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায়।

তিনি প্রকাশ করিল (—'তেন্হো প্রকাশ করিলা')।—৩খপৃঃ।

আবার স্থানে স্থানে বঙ্গ-ভাষার প্রতি বিদ্বেষের ভাবও দেখা যায়।

"গিয়া ধর্ম্মমন্দিরেতে শ্রীধর্ম্মশিলা সাক্ষাতে অতিশয় কাতর অন্তরে।
অশ্রুজলে বক্ষ সিক্ত স্তব পঠে বেদ-উক্ত ভাষাতে নিষেধ লিখিবারে॥"—৪ক।

"অতি গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে।
ভাষায় রচিনু পুথি ধর্ম্মের প্রীতিতে॥"—২ক।

এইরূপ 'ভাষা' ও 'সংস্কৃতের' বিরোধ আরও দু-এক স্থলে আছে। স্থানে স্থানে এই পুরাণখানিকে 'পঞ্চম বেদ' বলিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহা হইতে আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, ময়ূরভট্ট বঙ্গভাষায় তাঁহার পুরাণ লিখিয়াছিলেন, না সংস্কৃত ভাষায়? আমার সন্দেহ আমার পুথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট জ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে একখানি সংস্কৃত সাংজাত গ্রন্থ আছে। আমি পুথিখানি দেখিতে চাহিলে তিনি ঐ গ্রন্থ হইতে কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া আমার নিকট দিয়া যান। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থখানি তাঁহাদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ। সুতরাং এখানি সাধারণে প্রকাশ করায় তাঁহাদের আপত্তি আছে। তবে যে অংশগুলি তিনি আমাকে দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিবার পক্ষে তাঁহার আপত্তি নাই। আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি, এই সংস্কৃত শ্লোকগুলির বর্ণনীয় বিষয় ময়ূরভট্টের বাঁঙ্গালা পুথির সহিত প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। এই স্থানে দুই চারিটী উদাহরণ দিলাম।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুরাণ

কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং পুরে দ্বারিকাসংজ্ঞকে।
আসীদ্‌বিপ্রো ধর্ম্মশীলো বিশ্বনাথ ইতি শ্রুতঃ॥
তস্যাসীৎ কমলা নাম পত্নী শীলসম্বিতা।
পূজয়ামাসতুর্বিষ্ণুং দম্পতী পুত্রহেতবে॥
সুতে নাসাদিতে চাতিদুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ।
ততো গৃহাদ্‌বিনিষ্ক্রম্য যযতুস্তীর্থদর্শনে॥
সভার্য্যশ্চ স বিপ্রেন্দ্রো জগাম সরযূতীরে।
ততঃ পুষ্করতীর্থে চ সরস্বতীসরিত্তটে॥

পত্ন্যা কমলয়া সার্দ্ধং সেবিত্বা কমলাসনম্।
অনাসাদ্য ফলং পশ্চাৎ সদারঃ কাননং যযৌ ॥
ফলমূলাশনৌ তৌ দ্বৌ গত্বা গঙ্গাতীরে ততঃ।
সন্তপ্যমানমনসা দম্পতী সমচিন্তয়ৎ (?) ॥
পুত্রো হি নিরয়ত্রাতা পুত্রো হি গৃহশোভনঃ।
মুখং ন পশ্যতি কোপি নাস্তি যস্য সুতো ভুবি ॥
ঘৃণ্যপ্রাণৈর্ন্নু কিং ফলম্ অলং বনেঽটনেন নু।
প্রাণান্ সন্ত্যজ্য গঙ্গায়াং তরেব দুঃখসাগরম্ ॥
এবং সংস্মৃত্য স বিপ্রঃ কমলা-সহিতস্তদা।
ভূত্বা হতাশঃ সংসারে প্রাণান্ হন্তুং সমুদ্যতঃ ॥
মার্কণ্ডেয়স্তদাগত্য তৎক্ষণাৎ তং ন্যবারয়ৎ।
আত্মহত্যা মহাপাপান্নাস্তি মুক্তিঃ কদাচন ॥
কথমেবং মতিস্তে স্যাৎ কথ্যতাং মে মিথোঽনঘ।
শ্রুত্বা পুত্রার্থং যদ্দুঃখং বিস্তরেণাবদদ্দ্বিজঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ো বভাষে তাবায়াতমাশ্রমে মম।
দদামি বাং মহামন্ত্রং বিষ্ণুপ্রীতিকরং পরম্ ॥
তস্মাচ্চ মনোঽভীষ্টং স্যাৎ সফলং নাত্র সংশয়ঃ।
নিষম্য তৌ মহানন্দৌ মার্কণ্ডেয়াশ্রমং গতৌ ॥
আপতুঃ সিদ্ধমন্ত্রং তৌ ভক্ত্যা পরময়া যুতৌ।
তত্র বিষ্ণুং পূজয়িত্বা বৎসরদ্বাদশাবধি ॥
নারায়ণপ্রসাদেনালব্ধপুত্রবরং দ্বিজঃ।
চক্ষুষ্মানিব জন্মান্ধঃ পরমানন্দমানসঃ ॥
কিয়দ্দিনে তস্য ভার্য্যাঽভবদ্গর্ভবতী সতী।
সম্পূর্ণে গর্ভকালে চ সহর্ষৌ বিপ্রদম্পতী ॥
মেষস্থতপনে শুক্লপঞ্চম্যাং চার্ক্ষে সূর্য্যজে।
জাতো বিশ্বনাথসুতঃ সুযোগে সূর্য্যবাসরে ॥
দৃষ্ট্বানন্দযুতো দ্বিজো জাতকর্ম্মাকরোৎ ততঃ।
বিশালন্যগ্রোধচ্ছায়ং বভূব সূতিকাগৃহম্ ॥
ধাত্রীমাহূয় বালস্য নাড়ীচ্ছেদমকারয়ৎ।
স্নানমকারয়ন্নীরে বালকং চাতিসুন্দরম্ ॥
খদিরার্কোদুম্বরাশ্চ শমী চন্দনমিন্ধনম্।
পাদপান্ পঞ্চধাসাদ্য কৃষ্ণবর্ত্মা কৃতস্ততঃ ॥
পুত্রস্যাননমালোক্য কমলা চাতিহর্ষিতা।
দিনে দিনে ববৃধে চ সিতপক্ষে শশী যথা ॥

এই স্থলে বাঙ্গালা পুথিতে আছে,—

দ্বাপরের শেষ ভাগে দ্বারিকা নগরে।
বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণ শ্রীবিষ্ণু সেবা করে॥
কমলা তাহার পত্নী পতিব্রতা সতী।
স্বামী বিশ্বনাথ সহ ধর্ম্মে দেয় মতি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুপরায়ণ।
পত্নী সঙ্গে বিশ্বনাথ পূজে নারায়ণ॥
পুত্র কামনাতে সদা বিষ্ণু সেবা করে।
পুত্র বিনা কিবা সুখ আছয়ে সংসারে॥
বহু দিন গত হল না হয় সন্তান।
তীর্থ পর্য্যটন হেতু কৈল অনুমান॥
বিষ্ণুভক্ত বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণীসঙ্গেতে।
[৭ক] প্রথমেতে উত্তরিলা সরযূতীরেতে॥
সেইখানে কিছু দিন বিষ্ণু আরাধিয়া।
পত্নী সহ পুষ্করেতে উত্তরিল গিয়া॥
পুষ্করে দুষ্কর ব্রত করি আচরণ।
সরস্বতীকূলে গিয়া দিল দরশন॥
তথাপি হরির কৃপা না লভিতে পারি।
অরণ্যেতে প্রবেশিল পত্নী সঙ্গে করি॥
এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন।
পুত্রহীন ঘৃণ্য প্রাণ ত্যজিব এখন॥
এত বলি প্রাণ ত্যাগে হইল উদ্যত।
বাধা দিল মার্কণ্ডেয় আসি ত্বরান্বিত॥
মার্কণ্ডেয় বলে দ্বিজ রাখহ বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ না আছে খণ্ডন॥
এত শুনি সবিশেষ কহিল ব্রাহ্মণ।
মার্কণ্ডেয় বলে শুন মম নিবেদন॥
পত্নী লয়ে মম সঙ্গে চল কুটীরেতে।
শিক্ষা দিব মহামন্ত্র বিষ্ণু আরাধিতে॥
এত শুনি দুইজনে হরিষ অন্তরে।
অরণ্য ছাড়িয়া গেল মার্কণ্ডকুটীরে॥
বিষ্ণু পূজি সেইখানে দ্বাদশ বৎসর।
নারায়ণ নিকটেতে লভে পুত্রবর॥
অকিঞ্চন লভে যথা অমূল্য রতন।
ক্তি দানে যেন হয় অন্ধ জন॥

সেইরূপ বিশ্বনাথ আনন্দিত অতি।
শুভক্ষণে ব্রাহ্মণী হইল গর্ভবতী ॥
দশ মাস দশ দিন পূর্ণ যবে হয়।
প্রসবে কমলা এক সুন্দর তনয় ॥
বৈশাখী সিতপঞ্চমী নক্ষত্র ভরণী।
রবিবার শুভযোগে প্রসবে ব্রাহ্মণী ॥
পুত্র দেখি বিশ্বনাথ হরিষ অন্তরে।
জাতকর্ম্ম [৭ খ] সমাধান করিল সত্বরে ॥
নাড়ীচ্ছেদ করাইল ডাকিয়া ধাত্রীরে।
তাম্রপাত্রে রাখি স্নান করাইল নীরে ॥
প্রসূতি দেখিয়া দ্বিজ ভাবে মনে মন।
পঞ্চ কাষ্ঠ আনিয়া জ্বালিল হুতাশন ॥
খদিরার্ক উড়ুম্ব[র] শমী ও চন্দনে।
জ্বালিল অনল দ্বিজ সূতিকাভবনে ॥
সূতিকামন্দির হয় বটবৃক্ষতলা।
ডাল জুড়ি বৃক্ষ নিজে হইল ছাওলা ॥
সুধীর সুবৃক্ষ বেড়ি করিল চৌতারা।
ছাওয়াতে করিল বৃক্ষ বাড়ী মনোহরা ॥

* * * *

শুক্লপক্ষশশী সম দ্বিজের সন্ততি।
দিনে দিনে বাড়ে অঙ্গ সুগঠন অতি ॥—৯ ক পৃষ্ঠা।

দুর্ব্বাসার অভিশাপ

শ্রুত্বা সানন্দমনসা দুর্ব্বাসাস্তমুবাচ হ।
তবাদরেণ বৎসাহং পরাং প্রীতিমবাপ্নবম্ ॥
দূরাগমনক্লান্তস্য শয়ানস্যাসনে মম।
শ্রান্তিনাশায় সাম্প্রতম্ অঙ্গসংবাহনং কুরু ॥
বালকস্তু তদাকর্ণ্য হর্ষোৎসাহসমন্বিতঃ।
তত্রোপবিশ্য ভক্তিতোঽকরোৎ তস্যাঙ্গসেবনম্ ॥
পরাং নির্বৃতিং প্রাপ্তোঽসৌ ভেজে নিদ্রাং শ্রমাতুরঃ।
বালকো ভক্তিভাবেন শনৈঃ সংবাহয়ন্ বপুঃ ॥
জীর্ণং যজ্ঞোপবীতং তু হবিন্যস্য স্থিতং ভুজে।
বভূব করসংবদ্ধং বালকেন ন জানতা ॥
এতস্মিন্নন্তরে যাবদৈজিজৎ পরিতো মুনিঃ।
তাবচ্ছিন্নমভূদ্‌যজ্ঞোপবীতং কর্ষিতং দ্বিধা ॥

নিদ্রাভঙ্গাৎ সমুত্থায় ক্রুদ্ধো বালমুবাচ হ।
রে মূর্খাধম পাপাত্মন্ বিদ্রূপন্তে ময়া সহ ॥
যথাবমানিতং সূত্রং মদেনান্ধিতচেতসা।
তথৈব মেঽভিশাপেন মাঽবাপ্সীস্ত্বমুপবীতম্ ॥
অথ কেনাপি মদ্বাক্যং খণ্ডিতুং নহি শক্যতে।
বিনৈব ব্রহ্মসূত্রং ত্বং স্থাস্যসি জীবনাবধি ॥
তন্নিশম্য বিপ্রসুতঃ কাতরো দুঃখিতো ভৃশম্।
নিপত্য পাদয়োর্যুগ্মে কথয়ামাস ভক্তিতঃ ॥
ক্ষন্তব্যোঽজ্ঞানতো মেঽসৌ হ্যপরাধঃ সকৃৎ কৃতঃ।
উপায়ং কুরু বিপ্রেন্দ্র প্রসীদ মুনিসত্তম ॥
এবমুক্ত্বা সাশ্রুনেত্রো রুরোদ দুঃখিতান্তরঃ।
অস্মিন্নেবাবসরে তু মার্কণ্ডেয়ঃ সমাগমৎ ॥
দুর্ব্বাসসং সমালোক্য হ্যানন্দান্বিতচেতসা।
আতিথেয়ং সমাচর্য্য দদর্শ শিষ্যরোদনম্ ॥
পপ্রচ্ছ স্বান্তেবাসিনং কিং নু খেদস্য কারণম্।
ততো দুর্ব্বাসা বিস্তার্য্য তস্মৈ সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥
মৃকণ্ডুসুতঃ সংশ্রুত্য দুর্ব্বাসসং প্রতিশ্রুতঃ।
শিষ্যঞ্চাপি সমাশ্বাস্য সাদরং প্রাহ তং দ্বিজম্ ॥

বাঙ্গালা পুথিতে,—

শুনি মুনি প্রীত অতি বলেন রামাঞি প্রতি সৎকারে লভিনু বড় প্রীতি।
আশীর্ব্বাদ করি আমি দীর্ঘজীবী হবে তুমি ধর্ম্মপদে হবে তব মতি ॥
বহু পথ পরিশ্রমে আসিলাম এ আশ্রমে ক্লান্তিবোধ হইল অধিক।
তুমি অতি ভাগ্যবান তৃণশয্যা কর দান অঙ্গসেবা কর প্রাণাধিক ॥
শুনিয়া দ্বিজনন্দন প্রদানিল কুশাসন শয়ন করিল মুনি তায়।
রামাঞি শঙ্কিত মন করে অঙ্গ সংবাহন মুনিবর মহা সুখ পায় ॥
নিদ্রাবৎ অলসেতে রহিল অতি সুখেতে যজ্ঞসূত্র অবিন্যস্ত ছিল।
দুর্ব্বাসা পাশ ফিরিতে লাগি রামাঞের হাতে যজ্ঞউপবীত ছিন্ন হোল ॥
জীর্ণ যজ্ঞসূত্র ছিল দৈবাৎ বিচ্ছিন্ন হোল রামাঞি হইল ভীত মন।
সকলি চক্রীর কর্ম্ম কে বুঝে ধর্ম্মের মর্ম্ম কোন সূত্রে কি করে কখন ॥

[১০ খ]

যজ্ঞসূত্র ছিন্ন জানি শশব্যস্তে উঠি মুনি বিস্তর করিল মনস্তাপ।
সেবিতে কহিনু* অঙ্গ করিলি আমারে ব্যঙ্গ সেই পাপে দিব অভিশাপ ॥
হইয়া ব্রাহ্মণপুত্র ছিন্ন কৈলি যজ্ঞসূত্র কিছুমাত্র নাহি তোর জ্ঞান।
করিলি মম অহিত না পাইবি উপবীত মম বাক্য না হইবে আন ॥

* পুথিতে আছে,—'কহিতে সেবিনু

ছাড়ি যজ্ঞ উপবীত চির জীবনের মত ভূমণ্ডলে করহ ভ্রমণ।
এত বলি মহামুনি নব উপবীত আনি যথাবিধি করিল গ্রহণ॥
শুনি নিদারুণ শাপ পেয়ে বড় মনস্তাপ রামাঞি মুনির পায়ে ধরে।
না বুঝিয়া কোন মর্ম্ম অজ্ঞানে হইল কর্ম্ম মুনিবর ক্ষমা কর মোরে॥
চন্দনের ফোটা ভালে মার্কণ্ডেয় হেন কালে কুটীরেতে দিল দরশন।
আসিয়া দেখে অমনি এসেছে দুর্ব্বাসা মুনি শিষ্য তার করিছে রোদন॥
দুর্ব্বাসারে অভ্যর্থিয়া শুনি সব বিস্তারিয়া কহে শিষ্যে প্রবোধ বচন।
রোদন সম্বর তুমি বিধান করিব আমি ধর বাপ মুনির চরণ॥
দুর্ব্বাসার প্রতি কয় কহ মুনি মহাশয় কি কারণে আসিলে হেথায়।
শুনিয়া কহে দুর্ব্বাসা তোমা নিমন্ত্রিতে আসা যজ্ঞে ব্রতী করিব তোমায়॥

[১১ক]

শুনি মার্কণ্ডেয় বলে যাব সেই যজ্ঞস্থলে নিমন্ত্রণ করিনু গ্রহণ।
রামাঞে রাখি কুটীরে যাইব যজ্ঞ আগারে যাহ তুমি নিজ নিকেতন॥
দুর্ব্বাসা হোল বিদায় রামায়ে মুনি বুঝায় বলে আমি যাব যজ্ঞস্থল।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ ময়ূরক মহানন্দ ভাবে ধর্ম্ম চরণযুগল॥—১১কপৃঃ।

সাবিত্রীর ক্রোধ

সংসদি প্রাহ সাবিত্রী সক্রোধারুণলোচনা।
স্থিতায়াং ময়ি ভো দেবাঃ কর্ম্ম কঃ কৃতবানিদম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবশ্চেদ্বা প্রাপ্নুয়াৎ তৎ ফলং ধ্রুবম্।
কোঽপি ত্রাতুং ন শক্ষ্যস্তে মম ক্রোধাগ্নিদাহনাৎ॥
শূদ্রাণ্যৈ যো মমাসনং দত্বা মামবমন্যত [?]।
স শিলারূপমাস্থায় বর্ত্ততাং সর্ব্বদা ভুবি॥
সাবিত্র্যাভিশাপং শ্রুত্বা রক্ষিতুং তাঃ সতীগিরঃ।
তথাস্ত্বিত্যুক্ত্বাভিশাপমগৃহ্লত নারায়ণঃ॥

বাঙ্গালা পুথিতে,—

হেন কালে সাবিত্রী আসিয়া যজ্ঞস্থানে।
দেখে এক কন্যা বসি বিধির সদনে॥
তাহার করেতে কর দিয়া সৃষ্টিপতি।
সম্পূরণ করে যজ্ঞ দিয়া ঘৃতাহুতি॥
হেরিয়া সাবিত্রী [৫খ] নেত্র আরক্ত করিয়া।
কহে কথা সভা মাঝে ক্রোধান্বিতা হয়্যা॥
কে করিল হেন কর্ম্ম আমি বিদ্যমানে।
সমুচিত শাস্তি তার দিব এই ক্ষণে॥

হয় যদি বিধি বিষ্ণু দেব ত্রিলোচন।
তথাপি নিস্তার নাহি পাবে কদাচন ॥
বিষম বেদনা যেবা দিল মোর প্রাণে।
শিলামূর্ত্তি হয়ে থাক মরতভুবনে ॥
সাবিত্রীর অভিশাপ শুনি নারায়ণ।
তথাস্তু বলিয়া হরি করিল গ্রহণ ॥—৫ম পৃঃ।

ধর্ম্মপূজার অধিকারী

পুরা কূর্ম্মাকৃতির্বিষ্ণুর্দেবেভ্যো দত্তবান্ বরম্।
ততঃ কূর্ম্মশ্চ নাগশ্চ পূজ্যতে সর্ব্বজাতিভিঃ ॥
সাবিত্র্যাশ্চাভিশাপেন শিলারূপী নারায়ণঃ।
স্মৃত্বা পূর্ব্বাং বাণীং স্বস্য কূর্ম্মচিহ্নং দধার হ ॥
অতো রক্তায়সং ধৃত্বা শূদ্রোঽপি পূজয়েৎ শিলাম্।
ধর্ম্মস্য প্রীতিং কাময়ন্ মন্ত্রৈঃ প্রণববর্জ্জিতৈঃ ॥
নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রমুচ্চার্য্য সর্ব্বজাতিভিঃ।
পূজ্যতে হি যথা লোকে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ॥
তাম্রং ধৃত্বা তথা সর্ব্বে ধর্ম্মায় শিলারূপিণে।
নমো ধর্ম্মায়েতি দদ্যুর্ভক্তিপুষ্পাঞ্জলিং কলৌ ॥
ন যাস্যতি জাতিভেদঃ শূদ্রোঽপি স্বজাতিস্থিতঃ।
পণ্ডিতস্য বিধানেন ধর্ম্মাৎ শ্রেয়মবাপ্স্যতি ॥
তস্মাদ্রামায়িণা কৃতৈরপভাষাবিরচিতৈঃ।
মন্ত্রৈঃ পূজ্যন্তে সর্ব্বৈর্হি শিলাঃ কূর্ম্মাদিচিহ্নিতাঃ ॥
রামায়ি ধর্ম্মদাসশ্চ তদ্বংশীয়শ্চ বা দ্বিজঃ।
পূজয়েৎ তাং শিলাং সম্যক্ সাংজ্ঞাতস্য বিধানতঃ

বাঙ্গালা পুথিতে,—

রাখিতে দেবের বাণী পরাৎপর চক্রপাণি কূর্ম্মাকার হৈল বল্লুকাতে।
করিয়া তাম্র ধারণ পূজিবেক সর্ব্বজন প্রণবাদিবর্জ্জিত মন্ত্রেতে ॥
সকল জাতিতে যেন করি নমো উচ্চারণ পূজা করে লিঙ্গরূপী হরে।
সেইরূপ তাম্র ধরি নমো ধর্ম্মায় উচ্চারি পূজিবেক শূদ্র আদি নরে ॥
জাতিভেদ কেন যাবে যে যার স্বভাবে রবে পণ্ডিতের পালিবে বিধান।
কেবল তাম্রের গুণে পরশিবে নিরঞ্জনে ধর্ম্ম-বরে হইবে কল্যাণ ॥
আর কেশবতীসুত জন্মিবে ধর্ম্মপণ্ডিত বংশ যত বাড়িবে তাহার।
যে বিধি আছয়ে তন্ত্রে প্রণবাদি বেদমন্ত্রে পূজিবেক সবে করতার ॥
রামাই বংশসম্ভূত জগতে হইবে খ্যাত কেশবতীগর্ভে জনমিবে।
আর যত দ্বিজগণ করি বেদ উচ্চারণ আদি নিরঞ্জনে পুষ্প দিবে ॥

—২৯ খ পৃঃ।

ধর্ম্ম ঠাকুর ও বিষ্ণু দেবতা

ময়ূরভট্টের গ্রন্থে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ থাকিলেও বিষ্ণু দেবতাই সাবিত্রীর অভিশাপে ধর্ম্মশিলারূপে মর্ত্ত্য ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু পুরাণে প্রেতলোকের অধিকারী যমরাজাই ধর্ম্মরাজ বলিয়া পরিচিত, এবং বীরভূমের স্থানে স্থানে ধর্ম্মের গাজন এই ধর্ম্মরাজ বা মহিষ-বাহনেরই গাজন বলিয়া প্রচলিত। কিন্তু ময়ূরভট্টের গ্রন্থে বা অন্য কোনও ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে মহিষবাহনকে ধর্ম্মের স্থান ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। রাঢ়ের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে, যেখানে অসংখ্য ধর্ম্মশিলার অর্চ্চনা হইয়া থাকে, সেখানেও ধর্ম্ম ঠাকুর ধর্ম্মপুরাণোক্ত ধর্ম্মঠাকুর। তবে স্থানে স্থানে, যেখানে ব্রাহ্মণে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন, সেখানে "নমঃ শিবায়" বলিয়া ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ধর্ম্মমঙ্গলেও ক্বচিৎ ইহাঁকে শিব ঠাকুরের সহিত অভিন্ন কল্পনা করা হইয়াছে এবং ইহাঁর আসন কৈলাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু মুখ্যতঃ ইনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু দেবতা। ইহাঁর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁর ভক্তগণের বৈকুণ্ঠ-যাত্রার পথে যমদূতগণের সহিত বিষ্ণুদূতের বিবাদও দেখা যায়। কিন্তু যমরাজা স্বয়ং ধর্ম্মভক্তদিগের অভ্যর্থনা করেন; তখন যমদূতগণ বিস্মিত হইয়া পড়ে।* ধর্ম্মঠাকুর জতুগৃহে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সমুদ্রে ঐরাবত গজের প্রাণদান করিয়াছিলেন, বিষপানকারী প্রহ্লাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত সুধন্বার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সভামধ্যে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহায় ছিলেন। ধর্ম্মঠাকুর হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই তিনটী মুখ্য পৌরাণিক দেবতার উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যমণ্ডলে ইহাঁর অবস্থিতি। ইনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রাদি-শোভিত। ইনি সত্যযুগে শুক্লপ্রভ, ত্রেতায় রক্তাভ, দ্বাপরে পীতবর্ণ এবং কলিকালে কৃষ্ণবর্ণ। ইনি কখনও সাকার, কভু নিরাকার। ইহাঁর হৃদয়ে কৌস্তুভ দীপ্ত। ইহাঁর নীলোৎপলতুল্য নয়ন, বনমালা-বিভূষিত কণ্ঠদেশ, শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-শোভিত চারি হস্ত। ইহাঁর বামে আদ্যা মাতা প্রকৃতি সদা অবস্থিতা। যে ধ্যানে যে জন ইহাঁর আরাধনা করিতে চাহে, ইনি তাহাই। ইনি অযোধ্যায় রাম, গোকুলে শ্যাম, ইনি চিন্তামণি, ভক্তের ধন। সকলসম্পৎপ্রদা লক্ষ্মী কেশ দ্বারা সর্ব্বদা ইহাঁর চরণ মুছাইয়া দেন। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী দেবী ইহাঁর পদাম্বুজে স্তুতি করেন। ব্রহ্মার রমণী সাবিত্রী ধর্ম্মের কৃপা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মের বরে সূর্য্যদেব 'যমধর্ম্ম' নামে পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ গোপকুলের

* "সংসারে শরীর লয়ে যান যমপুরে। হেন কালে যমদূত দেখা দিল দূরে।
বিনয়বচনে বলে শুন বীর হনু। কে কোথা বৈকুণ্ঠে নিল মরতের তনু।
... ...
দেখে অর্ঘ্য দানেতে আদর কৈল যম। যমদূত সবার ঘুচিল মনোভ্রম।
... ...
রাখিয়া শমনপুরে বায়ুবেগে রথ। সুমেরু সন্ধানে ধরে বৈকুণ্ঠের পথ।" ঘনরাম, ২৭৩ পৃঃ।
"একান্ত পূজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্মফাঁস। ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস।—ঐ, ২৭২ পৃঃ।

সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ইনিই গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়া গোপিনীগণের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। দুর্গা ও গঙ্গা আমিনী হইয়া এবং ইন্দ্র ও শিব ভক্ত হইয়া ধর্ম্মপূজা করেন।

এই সকল বর্ণনা হইতে ধর্ম্মঠাকুরকে আর বিষ্ণু দেবতাকে পৃথক্ ভাবা যায় না। ইনি সর্ব্বদেবময় হইলেও মূলতঃ বিষ্ণুদেবতা।

ধর্ম্মঠাকুর বিষ্ণুদেবতা হইলেও নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত ইঁহার কোনও সম্পর্ক কোনও স্থানে উল্লিখিত দেখা যায় না। ইনি ভাগবতবিখ্যাত বিষ্ণুদেবতা, তবে রাধাকে ইঁহার সঙ্গিনীরূপে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের চৈতন্যপূর্ব্ব বৈষ্ণবযুগেই ইঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জয়দেব এই বিষ্ণুদেবতারই অংশাবতারের লীলাকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর একটা কথা এই যে, ধর্ম্মঠাকুর নিরামিষাশী বৈষ্ণব দেবতা নহেন। সাংখ্যোক্ত আদ্যা শক্তি প্রকৃতি দেবী মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বদাই ইঁহার বামাঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সেই জন্য বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন দ্বারা ইনি 'লুয়ে' নামক উৎকৃষ্ট ছাগকে বলিরূপে গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হন। বাঁকুড়া জেলার বহু স্থানে বৈষ্ণবী দুর্গাদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। আর এই ধর্ম্মদেবতা শক্তি বিষ্ণুদেবতা।

রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব

বল্লুকা নদীর গভীর নীর হইতে যখন রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মশিলা উত্তোলনপূর্ব্বক জগতে ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন করেন, তখন—

"নারায়ণ কর্ম্মী হইল মহেশ দেউলী।
পাটভক্ত্যা ইন্দ্র হইল নীলাম্বর মালী॥
চন্দ্র সূর্য্য হনুমান গরুড় মহাবীরে।
চারি জনে দ্বারী হোল এ চারি দুয়ারে॥
চরিত্রা নামেতে লক্ষ্মী ভারতী বসুয়া।
হইল আমিনী চারি গঙ্গা মহামায়া॥
কিন্নর গায়ক বাদক গজানন।
সন্ধ্যাবটু হইল নারদ তপোধন॥
ভোগবটু বৃহস্পতি নাঠীপাত্র যম।
নবদণ্ডবটু যে হইল বিশ্বকর্ম্ম॥
জলাধিপ বরুণ হইল সেবা করিবারে।
কুবের ভাণ্ডারী হোল ধর্ম্মের ভাণ্ডারে॥
ভকিতা হইল তেত্রিশ কোটি দেবগণ।
মহামহোৎসবে পূজে ধর্ম্মের চরণ॥"—২০ ক পৃষ্ঠা।

ইহা ছাড়া দুর্ব্বাসা, নারদ, মার্কণ্ডেয়, হনুমান্ প্রভৃতি পৌরাণিক ব্যক্তিগণের সহিতই রামাই পণ্ডিতের জীবন যাপিত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের জাতকর্ম্মকালে পুরাণোক্ত মুনিরাই নিমন্ত্রিত দেখা যায়, উপনয়নকালে স্বয়ং বিধাতা আসিয়া তাম্রদীক্ষার ব্যবস্থা দেন।

এই সকল কারণে কেহ কেহ রামাই পণ্ডিতকেও পৌরাণিক ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। সত্যযুগের শ্বেতাই, ত্রেতা যুগের নীলাই ও দ্বাপরের কংসাই যেমন পৌরাণিক ব্যক্তি, রামাই পণ্ডিতও কি সেই প্রকার পৌরাণিক ব্যক্তি ? এইরূপ একটি সন্দেহ সকলের মনেই উদিত হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মপুরাণও একখানি পুরাণ মাত্র। ইহা ইতিহাস নহে। অষ্টাদশাধিক হিন্দু পুরাণের ন্যায় এ পুরাণেওলৌকিকের সহিত অলৌকিকের, পার্থিবের সহিত অপার্থিবের, আধিভৌতিকের সহিত আধ্যাত্মিকের, মর্ত্তবাসীর সহিত ত্রিদিববাসীর, দর্শনের সহিত রাজনীতির, ইতিহাসের সহিত কবিকল্পনার একত্র সমাবেশ রহিয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যেখানে ইন্দ্রাদি দেবগণ ধর্ম্মপূজা করিতেছেন, অথবা বিধাতা পূজার বিধান করিতেছেন অথবা অমরার রাজা হরিচন্দ্র স্বপুত্রের শিরশ্ছেদন করিতেছেন, অথবা যেখানে নবখণ্ড ব্রতের দ্বারা সুচন্দ্র বণিক্ আত্মদেহ খণ্ড খণ্ড করিবার পর পুনরায় জীবন লাভ করিতেছে, অথবা যেখানে লাউসেন হাকন্দখণ্ডে সূর্য্যদেবকে প্রতীপ গতিতে চালাইতেছেন, সেই সমস্ত স্থলের সমগ্রটী বা অংশবিশেষ অলৌকিক বলিয়া ঐতিহাসিকের ত্যাজ্য হইলেও স্থানে স্থানে যে সত্য কথা আছে, সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখা যায় না। সত্যযুগে যখন ব্রহ্মা গৃহাভরণ ব্রত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুরোহিত হইয়াছিলেন শ্বেতাই। ত্রেতাযুগে দৈত্যবধ কামনায় ইন্দ্র যখন এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন পুরোহিত হইয়াছিলেন নীলাই। দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণের গৃহাভরণে পুরোহিত ছিলেন কংসাই। সুতরাং এই তিন জনের ঐতিহাসিক সত্তা অনায়াসে উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রামাই পণ্ডিত কর্ণসেন ও লাউসেন নামক দুই জন ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজার পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনীতে অলৌকিক আখ্যায়িকা সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাঁহাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও হেতু নাই। যীশু খ্রীষ্টের নামের সহিত অলৌকিক আখ্যানাবলীর সংযোগ আছে বলিয়াই তাঁহাকে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না। আধুনিক যুগে চৈতন্যদেবের জীবনীতেও অসংখ্য অলৌকিক কাহিনীর সমাবেশ দেখা যায়। কবি কালিদাস ও ভোজরাজার নামে যত কাহিনী বিরচিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করা কঠিন ব্যাপার। যুগে যুগে মহাপুরুষগণের নামের সহিত অলৌকিক শক্তির আরোপ কেবলমাত্র বঙ্গবাসীর নহে, বিশ্বমানবের প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা। সুতরাং আমি রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্বে সন্দিহান হইবার কোনও উপযুক্ত কারণ দেখি না।

বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিত ও তৎপুত্র ধর্ম্মদাসের ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের ভক্তগণ তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ-বংশ হইতে পতিত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পরোপকারার্থ জীবন যাপন করার বেদনায় এ কাল পর্য্যন্ত সমবেদনায় আকুলচিত্ত। কার্পাসসূত্র অপেক্ষা তাম্রসূত্রের মাহাত্ম্য যতই অধিক হউক না কেন, রামাই যে দুর্ব্বাসার অভিশাপে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার আধুনিক উপাসকবৃন্দের মনোবেদনার কারণ। মূর্ত্তিমান্ পাপ আসিয়া ধর্ম্মদাসকে সুরাপান ও মাংস ভোজন করাইয়াছিল বলিয়া তাঁহার আধুনিক অনুচরগণ অনুতপ্ত। তিনি কেবল মাত্র কালু ডোমের পুরোহিত ছিলেন না, ছত্রিশ জাতির মধ্যেই যে তাঁহার

শিষ্য ছিল, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কলিঙ্গরাজ ও মগধরাজের ন্যায় দেশবিশ্রুত ব্যক্তিও যে ছিলেন এবং গালবাদি মুনিগণও যে বিপাকে পড়িয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা ধর্ম্মদাসের ভক্তগণ ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বর্ত্তমান দারিদ্র্যও যে ধর্ম্মদাসের ইচ্ছাকৃত, তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে অবীরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেও বিনা যৌন সম্পর্কেই ধর্ম্মদাসের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধর্ম্মদাসের বিবাহের সময় বরপণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পাঁচ শত রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে কোনও ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইতেন না। এমত অবস্থায় বিনা পণে বিবাহ করিয়া ধর্ম্মদাস যে উদারতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা আধুনিক যুগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায় না।

এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে রামাই পণ্ডিত বা তৎপুত্র ধর্ম্মদাসের ব্যক্তিত্ব লইয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও 'পণ্ডিত' পদ্ধতি (উপাধি)যুক্ত। তাঁহারা ধর্ম্মদাসের যুগের ন্যায় এখনও ব্রাহ্মণগণের অনুগত। ছত্রিশ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ইহাঁদের কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণের পরেই তাম্রদীক্ষিত পণ্ডিতের স্থান। ব্রাহ্মণের অভিশাপকে ইঁহারা ভয় করেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ ন্যায়-বিগর্হিত হইলেও তাহা অব্যর্থ। ইহাঁদের ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ সাংজাত গ্রন্থও পঞ্চম বেদ নামে খ্যাত। আধুনিক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে এই পঞ্চম বেদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রামাই পণ্ডিতের বংশধরগণের মধ্যে তাহা সংরক্ষিত ছিল। যখন ব্রাহ্মণগণ এই বেদ বা পঞ্চম পুরাণের বিষয় ও ধর্ম্মমাহাত্ম্য অবগত হইলেন, তখন তাঁহারাও ধর্ম্মমঙ্গল রচনা ও ধর্ম্মের গাজনে যোগদান আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টও ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরেও ঘনরাম, রামচন্দ্র, রূপরাম, গোবিন্দরাম, সহদেব প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তান ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন।

রামাই পণ্ডিতের রচনা

ময়ূরভট্টের গ্রন্থ হইতে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুরাণখানি হইতে জানা যায় যে, আপামর সাধারণের ধর্ম্মপূজার সহায়তার জন্য রামাই পণ্ডিত কতকগুলি মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি অপভাষা-বিরচিত, অর্থাৎ সংস্কৃতেতর কোনও ভাষায় লিখিত এবং প্রণবাদি-বর্জ্জিত। কিন্তু যে সকল লেখা রামাই পণ্ডিত বা পণ্ডিত রামের নামে প্রচলিত দেখা যায়, তাহার সবগুলিই যে রামাই-রচিত, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ ধর্ম্ম-পূজাবিধান নামে মুদ্রিত গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত মন্ত্র স্থান পাইয়াছে, তাহা উত্তরকালে সংযোজিত বলিয়াই মনে হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা স্থানান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

ময়ূরভট্টের কালে সামাজিক অবস্থা

ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ময়ূর ভট্টের সময়ে বিবাহে পণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা সত্যবতী মহাভারতীয় সত্যবতীর ন্যায় অতি রূপবতী হইলেও জীর্ণ ও মলিন পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিত। মলিন বস্ত্রের মধ্য হইতে তাহার রূপ

জলধরমধ্য হইতে বিদ্যুতের ছটার ন্যায় ঝলক দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাপি মহাভারতীয় যুগে মৎস্যগন্ধা ধীবরকন্যার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী নৃপতি তাহার রূপে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার একমাত্র গুণবান্ পুত্রকে আজীবন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করাইতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু এ যুগের সত্যবতী রূপে মৎস্যগন্ধাতুল্যা ও বংশমর্য্যাদায় ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও "পঞ্চ শত রৌপ্য মুদ্রার" অভাবে কোনও ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। এ কৌলীন্যমর্য্যাদা কি আদিশূর-প্রতিষ্ঠিত? না বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত? যদি বল্লালসেন-প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে হয় আমাদের কবি বল্লালসেনের পরবর্ত্তী যুগের, না হয়, এ আখ্যানটী উত্তরকালে সংযোজিত।

ময়ূর ভট্টের গ্রন্থে কলিকালের একটী সুন্দর বর্ণনা আছে। সেই বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার যুগের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অধর্ম্মপরায়ণ ছিল, এবং আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার উপাস্য দেবতা ছিল কামিনী ও কাঞ্চন। দ্বিজগণ বেদপাঠ করিতেন না। শূদ্রের দাসত্ব করিতে ব্রাহ্মণগণের কোনও আপত্তি ছিল না। জাতিভেদ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পরনারীহরণ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। স্বগৃহিণীর সমাদর ছিল না। ধর্ম্মঠাকুরকে পুষ্পমাল্য দান করা অপেক্ষা নিজে সেই মাল্য উপভোগ করিবার বাসনা লোকের মধ্যে বলবতী হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিজসন্তান 'বিজাতির ভাষাগান' করিত এবং নিজের জাতি ও মান নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইত না। দুহিতার বিবাহে পণ লইতে চাহিত। দেবতার সম্পত্তি নষ্ট করিত। বিষয় বিভবে সর্ব্বদাই তাহাদের চিন্তা লাগিয়া থাকিত। শূদ্রগণও ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিত না। তাহারা লোভপরায়ণ, অর্থলোভী, কলহরত, ধর্ম্মে মতিহীন ছিল। দেবমন্দির ভগ্ন করিয়া স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে তাহাদের কুণ্ঠাবোধ হইত না। পণ্ডিত অর্থাৎ ধর্ম্মপণ্ডিতগণের কেহ সমাদর করিত না। তাহাদিগকে ভণ্ড বলিত। অর্থব্যয় করিতে পারিলেই রাজদণ্ড এড়াইতে পারা যাইত। রাজা নীচ-কুলসম্ভূত, প্রজাপীড়ক ও লঘু পাপে গুরু দণ্ডবিধায়ক ছিল। মিথ্যাভাষণ, নরহত্যা, ভোগপরায়ণতা সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তির ফলে পুরুষগণ যৌবনে বার্দ্ধক্যগ্রস্ত ও নানা রোগে ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল। ভ্রাতা-ভগিনী, পিতা দুহিতা, বিমাতা-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্ক বিচারিত হইত না। অন্যান্য বহুবিধ আচারভ্রষ্টতা ও যথেচ্ছাচারিতা ছিল। সুরধুনী পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। গাভী দুগ্ধশূন্য, ভূমি শস্যশূন্য, জলাশয় জলশূন্য ও রাজা শাস্তিশূন্য ছিল। দেশে দস্যুভয় ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, 'যবন' বা 'মুসলমানের' কোনও অত্যাচারকাহিনী এখানে নাই। একটা কথা আছে, 'ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিজাতির ভাষাগান'। মুসলমানের ভাষা হইলে তাহা স্পষ্টভাবেই লিখিত হইতে পারিত। আর এ দেশের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক পার্সীভাষার গান গাওয়ার পদ্ধতি এ দেশে কোনও কালে প্রচলিত ছিল কি না, জানি না। তবে কি এটা তেলুগু ভাষার গান? স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে, প্রাচীন কালে উৎকলে বা কলিঙ্গদেশে তেলুগু গানের সমধিক প্রচলন হইয়াছিল। উৎকল-সাহিত্যের প্রাচীন গানগুলি অধিকাংশ স্থলেই তেলুগু ভাবাপন্ন। অথবা অবৈদিক কোনও প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীতও এই কথাটীর লক্ষ্য হইতে পারে। বোধ হয়,

সে গান দেশীয় ভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত নহে। কোনও প্রকার প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইতেও পারে। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয়াসক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য 'বিজাতির ভাষার গান' গীত হইত, তবে তাহা ধর্ম্মসঙ্গীত হইতে পারে না। তাহা তেলুগু ভাষার গান হইবারই অধিক সম্ভাবনা। উৎকল-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের গানগুলিও বোধ হয় অশ্লীল ভাবাপন্ন ছিল। কারণ, উপেন্দ্র ভঞ্জের ন্যায় লেখক অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে পারে না। উপেন্দ্র ভঞ্জের দেশও ওয়াল্‌টেয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, যেখানে এ কাল পর্য্যন্ত তেলুগু ভাষা প্রচলিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে উড়িয়া ভাষাও বিজাতির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যাহাই হউক, এ বিষয়ে স্থির করিয়া কোনও কথা বলা যায় না।

রামাই পণ্ডিত বৃদ্ধ বয়সে একজন অবীরাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কেশবতীর গর্ভে ধর্ম্মদাসের জন্ম। এইরূপে দাসী গ্রহণ করার প্রথা কি সে কালের সাধারণ প্রথার মধ্যে গণ্য ছিল? কলিকালের বর্ণনা উপলক্ষে যে পরকীয়া-প্রীতি ও স্বকীয়া-বিরতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে এ প্রথা ছিল না বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে দেশের নৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়াই মনে হয়। ধোয়ীর পবনদূত গ্রন্থ ও ঐ সময়ের অন্যান্য গ্রন্থের বিবরণ হইতে ইহাই বুঝা যায়। শূদ্রগণের প্রণব উচ্চারণে অধিকার ছিল না। মদ্যপান ও মাংসভোজন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চলিত না।

(১) সদ্‌গোপ, (২) কৈবর্ত্ত, (৩) গোয়ালা, (৪) তাম্বুলী, (৫) উগ্রক্ষত্রিয়, (৬) কুম্ভকার, (৭) একাদশ তিলী, (৮) যুগী, (৯) আশ্বিন তাঁতী, (১০) মালী, (১১) মালাকার, (১২) নাপিত, (১৩) রজক, (১৪) দুলে, (১৫) শাঁখারী, (১৬) হাড়ি, (১৭) মুচি, (১৮) ডোম, (১৯) কলু, (২০) চণ্ডাল, (২১) মাঝি, (২২) বাগ্‌দী, (২৩) মেটে, (২৪) স্বর্ণকার, (২৫) সুবর্ণবণিক্, (২৬) কর্ম্মকার, (২৭) সূত্রধর, (২৮) গন্ধবেণে, (২৯) ধীবর, (৩০) পোদ্দার, (৩১) ক্ষত্রিয়, (৩২) বারুই, (৩৩) বৈদ্য, (৩৪) পোদ, (৩৫) পাকমারা, (৩৬) কায়স্থ, (৩৭) কেওড়া প্রভৃতি জাতি ছিল। মুসলমান বা মুসলমান সম্পর্কে পতিত কোনও জাতির উল্লেখ নাই। কুষ্ঠ ব্যাধির উল্লেখ বহু স্থলে দেখা যায়। 'অষ্টাদশ কুষ্ঠ' ছিল। ডোমের পৌরোহিত্য করিলে ব্রাহ্মণকে সমাজে পতিত হইতে হইত। খণ্ডব্রত করিলে পাপ হইত। "ব্রাহ্মণে ও পণ্ডিতে ভেদ নাই" বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। অহিংসা ধর্ম্ম সম্ভবতঃ দেশমধ্যে সমাদৃত ছিল। কারণ, ধর্ম্মপূজায় ছাগবলি প্রবর্ত্তনের জন্য একটা কৈফিয়তের চেষ্টা দেখা যায়।

"সর্ব্বজীবে যাহার সমান দয়া রয়। ধর্ম্মরূপে ভগবান্ ভূতলে উদয়॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তাহার বিধান। তবে কেন তার কাছে ছাগ বলিদান॥"—৫৩খ।
"বিধান রহিল আজ হইতে জগতে। দেবীপূজায় ছাগবলি রাজসিক মতে॥"—৫৫ক।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি*

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, তদ্দ্বারা আধুনিক বাঙ্গালার (বিশেষতঃ চলিত ভাষার) রূপ, স্বর-ধ্বনি বিষয়ে অন্যান্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছে। গত ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্বরধ্বনির বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্কৃতে এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারে অজ্ঞাত, সুতরাং এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা বাঙ্গালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির আলোচনা বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধু-ভাষা ও চলিত-ভাষার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্যগ্‌ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্দ্ধ-তৎসম (অর্থাৎ বিকৃত বা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবর্ত্তিত সংস্কৃত) শব্দগুলির পরিবর্ত্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ নিয়ম কয়টীর সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই সকল নিয়ম মৎপ্রণীত Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪—৪০২, এবং অন্যত্র)। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বাহুল্য-ভাবে পুনরবতারণা করিবার আবশ্যকতা নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই—অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই; কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশই হয় নাই; এবং বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে কেহও নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াও দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ সূত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা ইংরেজী, ফরাসী, জারমান প্রভৃতি ভাষায় আজকাল সাধারণ ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার এই উচ্চারণ-রীতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে সর্ব্বত্র গ্রহণের জন্য সংস্কৃত ধাতু-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন শব্দ—হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্টী এবং তেলুগু কানাড়ী তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় ব্যবহারের যোগ্য। বিষয়টীকে সুবোধ্য করিবার জন্য উপর্য্যুল্লিখিত উচ্চারণ-রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য্য হইবে।

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নিম্নলিখিত কয়টী পর্য্যায়ে বা শ্রেণীতে এই সব পরিবর্ত্তনকে ফেলা যায়। যথাঃ—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৩ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

(১) চলিত ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নূতন সাহিত্যের ভাষায়, নিম্নে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যথা—'দেশী'> 'দিশি'; 'ছোরা', হ্রস্বার্থে 'ছোরী' স্থানে 'ছুরী'; 'ঘোড়া', স্ত্রীলিঙ্গে 'ঘোড়ী' স্থলে 'ঘুড়ি'; 'দে' ধাতু—আমি 'দেই' স্থলে 'দিই, দি', কিন্তু সে 'দেএ' স্থলে 'দেয়' (দ্যায়); 'শো' ধাতু—আমি 'শোই' না হইয়া আমি 'শুই', কিন্তু সে 'শোয়'; 'শুন্' ধাতু—আমি 'শুনি', কিন্তু সে 'শুনে' স্থলে সে 'শোনে'; 'কর্' ধাতু—আমি 'ক-রি' স্থলে 'কোরি', কিন্তু সে 'করে'—এখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয় নাই; 'বিলাতী'> 'বিলেতি'> বিলিতি'; 'উড়ানী > 'উড়্নী'; সংস্কৃত 'শেফালিকা'> প্রাকৃত 'শেহালিআ'> অপভ্রংশ 'শেহলিঅ'> বাঙ্গালা 'শিউলি'; ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন, 'একটা, দুইটা তিনিটা'> 'এক্‌টা, দুটা, তিন্‌টা'> 'একটা, দুটো, তিনটে'; 'ইচ্ছা'> 'ইচ্ছে', 'চিঁড়া'> 'চিঁড়ে', 'মিথ্যা'> 'মিথ্যে', 'ভিক্ষা'> 'ভিক্ষে'; 'পূজা'> 'পূজো', 'মূলা'> 'মূলো', 'তুলা'> 'তুলো', ইত্যাদি।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় আজকাল সাধারণ, কিন্তু এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গদেশেরই কথ্য ভাষার লক্ষণ ছিল। শব্দের মধ্যেকার বা অন্তের ই-কার বা উ-কারের, পূর্ব্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যঞ্জনের পূর্ব্বেই আসিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব (পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি উপভাষা ব্যতীত অন্যত্র সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার ই-কারে রূপান্তরিত হইয়া যায়)। যথা,—'আজি, কালি'> 'আইজ্, কাইল্'; 'গ্রন্থি'> 'গণ্ঠি'> গাঁঠি'> 'গাঁইট'; 'সাধু'> 'সাউধ, সাইধ'; 'রাখিয়া'> 'রাইখ্যা'; 'সাধুআ' > 'সাউধুআ'> 'সাইধুআ'; 'করিতে'> 'কইর্‌তে'; 'করিয়া'> 'কইর‍্যা', 'হরিয়া'> 'হইর‍্যা'; 'জলুআ'> 'জউলুআ, জইলুআ'; 'চক্ষু'> 'চখু'> 'চউখ, চইখ্'; ইত্যাদি।

(৩) তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষতঃ ভাগীরথী নদীর তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত ভাষায় বিশেষ প্রবল। বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত; বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায়, এবং ক্বচিৎ পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তের ভাষায়। এই পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার। শব্দের মধ্যে বা অন্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্ব্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে তাহা পূর্ব্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়। যথা—'আজি, কালি'> 'আইজ, কাইল' <'এজ, কেল' (প্রাচীন গ্রাম্য উচ্চারণ, কলিকাতার আশে পাশে চব্বিশ-পরগণায় হুগলীতে ৮০।১০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল—'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বাহুল্য অর্থাৎ বাহাউল্লা নামে যে মুসলমান পাত্রটীর কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ প্যারীচাঁদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন,—শিক্ষা ও সাধুভাষার প্রভাবে এই প্রকারের উচ্চারণ এখন আর স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে শ্রুত হয় না); 'চারি'> 'চাইর'> 'চের', যথা 'চাইরের; পাঁচ'> 'চেরের পাঁচ' = ৪; 'গাঁঠি'> 'গাঁইট'> 'গেঁট'—যথা 'মনে মনে গেঁট দিচ্ছে; গেঁটের কড়ি'; 'সাধু'> 'সাউধ'> 'সাইধ' —'সেধ', যথা 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের'; 'রাখিয়া'> 'রাইখ্যা'> 'রেখ্যা'> 'রেখে'; 'সাধুআ'> 'সাউধুআ'> 'সাইধুআ'> 'সেধো'; 'করিতে'> 'কইর্‌তে'> 'ক'র্‌তে' =

স্বরধ্বনির উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সমাবেশ

জিহ্বা সম্মুখভাগে বা অগ্রে প্রসৃত—তালব্য স্বরধ্বনি
(ই, এ, অ্যা, আ')

জিহ্বা অভ্যন্তরে বা পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষিত—কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি
(উ, ও, অ, আ)

(উচ্চ)—ই
(মধ্য)—{ এ, অ্যা }
(নিম্ন)—আ'

উ—(উচ্চ)
ও, অ }—(মধ্য)
আ (নিম্ন)

ই, এ, অ্যা, (আ')
উ, ও, অ, আ

স্বরধ্বনির পরস্পর সম্বন্ধ
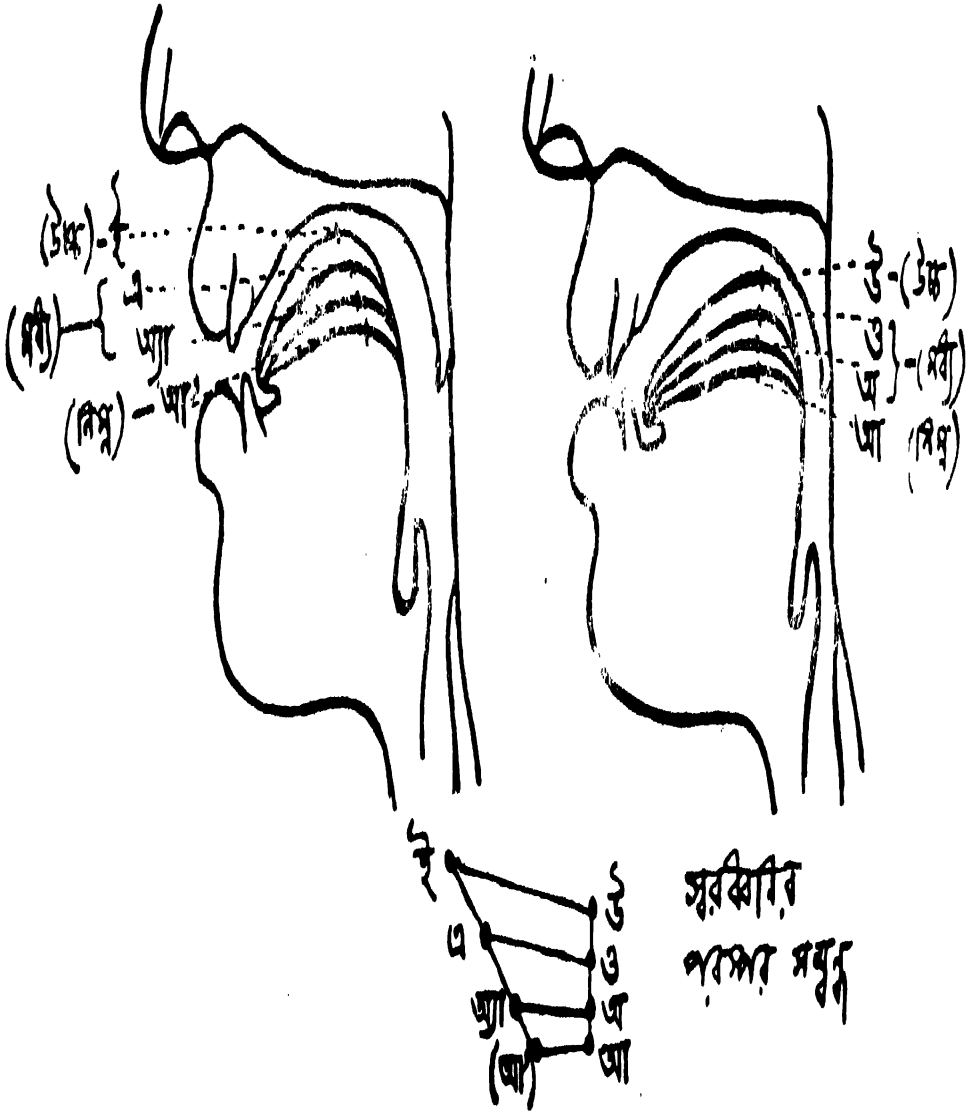
অ্যা = পশ্চিম বঙ্গে উচ্চারিত 'দেখা, এক, ত্যাগ' প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি।

আ' = পরবর্ত্তী ই-কার লুপ্ত বা অর্দ্ধলুপ্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী আ-কারের বিকৃত ধ্বনি (পশ্চিমবঙ্গের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়) যথা—'কা'ল <কাইল্, <কালি; আ'জ <আইজ, <আজি'; ইত্যাদি। 'কা'ল <কাইল্ < কাল; আ'জ <আইজ, <আজি';

'কোর্‌তে' ; 'করিয়া'> 'কইর‍্যা' <'ক'র‍্যা'> ক'রে='কোরে' ; 'হরিয়া'> 'হইর‍্যা'> 'হ'র‍্যা' > 'হ'রে'='হোরে' ; 'জল্‌আ'> 'জইলুআ'> 'জ'লো'='জোলো' ; 'চক্ষু'> 'চখু'> 'চউখ্', 'চইখ্'> 'চোখ' ; ইত্যাদি।

চলিত ভাষার প্রভাবে এবম্প্রকার পরিবর্ত্তনাত্মক বহু রূপ সাধুভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে ঃ যথা—'ছালিয়া'>'ছেলে' ; 'মাইয়া'> 'মেয়ে' ; 'থাকিয়া'> 'থেকে ; 'জলুয়া'> 'জ'লো' ; 'জ্বালিয়া'> জেলে' ইত্যাদি।

(৪) চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন অন্য ধরণের—প্রথম তিনপ্রকারের পরিবর্ত্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন সংস্কৃতে মেলে। যথা—'চল্‌' ধাতু—'চলে', কিন্তু ণিজন্ত 'চালে' (এতদ্ভিন্ন অন্য ণিজন্তও আছে—'চলায়', 'চালায়') [তুলনীয় সংস্কৃত 'চলতি—চালয়তি'] ; 'পড়্‌' ধাতু পতনে—'পড়ে',ণিজন্ত 'পাড়ে' ; 'টুট্‌' ধাতু—'টুটে', ণিজন্ত 'তোড়ে'। এখানে অবস্থাগতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—'চল্‌—চাল', 'পড়—পাড়', 'টুট—তোড়'।

এক্ষণে উপর্য্যুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্ত্তন-রীতির অন্তর্নিহিত কারণ বা প্রেরণাটী কি, তাহা বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কি কি নাম দেওয়া সমাচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক।

(১) প্রথম প্রকারের পরিবর্ত্তন শব্দ-মধ্যস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। 'দেশী> দিশি'—এখানে প্রথম অক্ষরের এ-কার পরবর্ত্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, পরবর্ত্তী ই-ধ্বনির সহিত সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ই (ঈ)-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রসৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠে ; এ-কারের বেলায়, উচ্চে উঠে না, একেবারে নিম্নেও নামে না, মাঝামাঝী অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্ত্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ব্ববর্ত্তী এ-কার উচ্চারণের সময়েই এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে, জিহ্বা উত্তোলিত হইয়া পড়ে ; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্ত্তন ঘটে। উ-কার এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে ; মুখাভ্যন্তরে আকর্ষিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। 'ছোরা' শব্দের হ্রস্বার্থে ঈ-প্রত্যয়-জাত 'ছোরী' শব্দের উচ্চারণে, প্রথম অক্ষরের ও-কার পরবর্ত্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং ঈ বা ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া ও-কারও উচ্চে আনীত হয়, ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্ত্তন। তদ্রূপ—'করে, করা' পদে, এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থানজাত, আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থানজাত ; এই জন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কার নিম্নেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া স্বরূপ বদলায় না ; কিন্তু 'ক-রি=কোরি', এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময় জিহ্বা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়। তদ্রূপ 'কর্‌-উক্‌, 'ক-রুক্‌=কোরুক্‌'—এখানে ক-এর অ-কার, 'উক্‌'-এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিয়াছে।

পার্শ্বের সংলগ্ন চিত্রদ্বারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সন্নিবেশ দেখিতে

পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত 'ই, উ'র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও কার উ-কার হয়, এবং এই প্রকারের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালা শব্দের অভ্যন্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর ই উ-র প্রভাবে মধ্যাবস্থিত স্বর এ, ও এবং আ অ যথাক্রমে ই, উ এবং এ, ও-তে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর এ, অ্যা তথা ও,অ-র প্রভাবে পড়িয়া উচ্চাবস্থিত স্বর ই. উ মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া যথাক্রমে এ এবং ও হইয়া যায়। উঁচু নীচুকে উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া লয়—ইহাই হইতেছে এই প্রভাবের মূল কথা। এই অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

ধাতুতে স্বরধ্বনি

'অ ই উ এ ও'

থাকিলে, প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে যদি 'ই উ' আইসে তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতুর স্বরধ্বনি যথাক্রমে

'ও ই উ এ (ই) উ'

রূপে অবস্থান করে; এবং

প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে 'এ (বা য়), আ, অ, ও' গ্রাসিলে, ধাতুর স্বর যথাক্রমে

'অ এ ও অ্যা (এ) ও'

রূপে অবস্থান করে। যথা—

'চল্' ধাতু—'চল্'+'অহ' = 'চলহ, চলো'; 'চল্'+'এ' = 'চলে'; 'চল্+'ই' = 'চলি = 'চোলি'; 'চল'+'আ' = 'চলা'; 'চল'+'উক্' = 'চলুক্' = 'চোলুক্'; 'চল'+'অন্ত = চলন্ত';

'কিন্' ধাতু—'কিন্'+'এ' = 'কিনে = 'কেনে'; 'কিন্'+'অহ' = 'কিনহ, = কেন' (তুমি ক্রয় কর); 'কিন্ +'ই' = 'কিনি'; 'কিন্'+উক্' = 'কিনুক'; 'কিন্'+'আ' = 'কিনা, কেনা;'

'শুন্' ধাতু—'শুন্'+'এ' = 'শোনে'; 'শুন্'+ অহ' = 'শুনহ', 'শুন' = শোনো' (তুমি শ্রবণ কর); 'শুন্'+'ই' = 'শুনি'; 'শুন্'+'উক্' = 'শুনুক'; 'শুন্'+'আ' = 'শুনা = শোনা';

'দেখ' ধাতু—'দেখে' = 'দ্যাখে' (এ> অ্যা); 'দেখহ'> = দ্যাখো; 'দেখি, দেখুক'; 'দেখা = দ্যাখা';

'দে' ধাতু—'দেয় = দ্যায়'; 'দেই = দিই'; 'দেঅহ'> 'দেও> দ্যাও', পরে 'দাও'; 'দেউক'> দিক্' 'দেআ' = দেওয়া';

'দোল' ধাতু—'দোলে; দোল; দুলি; দুলুক, দোলা';

'শো, ধাতু—'শোয়; শোও; শুই; শুক; শোয়া;

পরবর্ত্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য যেমন প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে, পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্ত্তী স্বরেরও পরিবর্ত্তন হয়। যথা—'বিনা'> 'বিনে' (ই-র আকর্ষণে আ-কারের উচ্চে এবং মুখের সম্মুখ-ভাগে আনয়ন, ফলে এ-কারে পরিবর্ত্তন); তদ্রূপ 'ইচ্ছা—ইচ্ছে, চন্তা—চিন্তে, হিসাব—হিসেব, গিয়া—গিয়ে, দিয়া—দিয়ে, বিলাত—'বিলেত'; ইত্যাদি। এবং পূর্ব্ববৎ অ গামী-

উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্ত্তন ঘটে ; যথা—'পূজা—পূজো, ধুনা—ধুনো, সুতা—সুতো, জুয়া—জুও,' ইত্যাদি।

এই পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম-হেতু বাঙ্গালার পূর্ণরূপ শব্দগুলি (খাঁটী বাঙ্গালা, তৎসম ও বিদেশী) চলিত ভাষায় বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যথা—'বিলায়তী> বিলাতী> বিলেতি> বিলিতি ; পিঠালী> পিঠলী> পিঠোলী> পিঠুলী ; উড়ানী> উড়োনী> উড়্নী ; উনানী> উনোনী> উনুন ; সন্ন্যাসী> সন্নিয়াসী> সন্নেসী> সন্নিসী ; কুড়ালী> কুড়োলী> কুড়ুলী> কুড়ুল ; মাদল+ঈ=মাদলী> মাদোলী> মাদুলী ; উৎসর্গ> উচ্ছুগগ> উচ্ছুগ্‌গু ; নিরামিষ্য> নিরামিষ্যিয় <নিরেমিষ্যি, নিলেমিষ্যি> নিলিমিষ্যি (গ্রাম্য, স্ত্রীলোকের ভাষায়)' ; ইত্যাদি।

এইরূপ পরিবর্ত্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায়? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ভাষায় ইহার অস্তিত্ব দেখা যায় ; যথা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—'চোর—চোরিণী' হইতে 'চুরিণী','কোয়েলী' হইতে 'কুয়িলী', 'ছিনারী'-'র পার্শ্বে 'ছেনারী,' 'পুড়ি'র পার্শ্বে 'পোড়া,' ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্ত্তন অন্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। যেমন তুর্কীতে at 'আৎ' মানে ঘোড়া, at-lar 'আৎ-লার' ঘোড়াগুলি, ev 'এভ্' মানে বাড়ী ev-ler 'এভ্-লের' মানে বাড়ীগুলি ; এখানে at শব্দে আ-ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়ে-ও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী lar রূপে সংযুক্ত হইল : এবং ev শব্দে এ-ধ্বনি থাকায় প্রত্যয়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত ler। উরাল-গোষ্ঠীয় ভাষায়, আল্‌তাই-গোষ্ঠীয় ভাষায় (তুর্কী যাহার অন্তর্গত), তেলুগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্যত্র এই রীতি মেলে। এই পরিবর্ত্তন আবার স্বরের উচ্চারণকে কেবল নিম্ন হইতে উচ্চে বা উচ্চ হইতে নিম্নে আনয়ন করিয়াই হয় না—জিহ্বাকে অগ্র-ভাগ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সম্মুখ ভাগে আনয়ন করিয়া, ও অধরোষ্ঠকে প্রসৃত বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে—এবং ফলে ওষ্ঠদ্বয়কে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত 'উ' 'ও' 'অ'-র এবং অধরোষ্ঠকে সঙ্কুচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 'ই' 'এ' 'অ্যা'র বিকারে নানা প্রকার অদ্ভুত স্বরধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে—যে সকল স্বরধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্যকমত রোমান বর্ণমালায় ö ü ä y ɯ প্রভৃতি নানা অক্ষরের সাহায্যে সেগুলি দ্যোতিত হয়।

এইরূপ পরস্পরের প্রভাবে জাত স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তনকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ Vocalic Harmony বা Harmonic Sequence বলিয়াছেন (জারমানে Vokalharmonie, ফরাসীতে Harmonie vocalique, বা Assimilation vocalique). বাঙ্গালায় এই রীতির নাম স্বর-সঙ্গতি দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি।

একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার—যেখানে আদ্য অ-কার নিষেধ-বাচক, সেখানে ইহার উচ্চারণ 'অ'-ই থাকে, স্বর-সঙ্গতি হয় না ; যথা—'অ-তুল' (কিন্তু নাম অর্থে 'ওতুল'), 'অ-সুখ', 'অ-ধীর', 'অ-স্থির', 'অ-দিন' (কিন্তু 'অতিথি'-র উচ্চারণ 'ওতিথি') ; ইত্যাদি। এই পার্থক্যটুকু ধরিতে না পারিয়া চলতি ভাষা ব্যবহারের সময়ে অনেকেই, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ, ভুল করিয়া 'ও' উচ্চারণ করেন।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি লইয়া খুঁটীনাটী আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণবিপর্য্যয়—ই-কার বা উ-কার, ব্যঞ্জনের পরে নিজ স্থান

ত্যাগ করিয়া ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে আইসে ; যেমন 'কালি'> 'কাইল্', 'সাধু'> 'সাউধ্'। কিন্তু ইহা কেবল বর্ণ-বিপর্য্যয় মাত্র নহে—এক হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্ব্বাভাস-হেতুক আগমও বটে : যেমন 'সাথুআ'> 'সাউথুআ' : এখানে 'থু'-এর 'উ' রহিয়া গেল, ওদিকে 'থ'-এর পূর্ব্বেও উ-কার আসিয়া গেল। তদ্রূপ, 'করিয়া'> 'কইরা' : এখানেও 'রি'-র ই-কার একেবারে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'র'-এর আগে চলিয়া গেল না, 'র'-এর আগে পূর্ব্বাভাসের মত, ই-কার আসিয়া গেল—উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। সুতরাং কেবল মাত্র বর্ণ-বিপর্য্যয় অথবা ই-কার (বা উ-কার) আগম বলিলে চলে না। 'পূর্ব্বাভাস-আগম' বলিলে কতকটা ব্যাখ্যা হয় বটে। সংস্কৃতে এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক আগম দেখা যায় না, কিন্তু সংস্কৃতের স্বস্থানীয় অবেস্তার ভাষায় মিলে : যথা—সংস্কৃতে 'গিরি' = অবেস্তায় 'গইরি' (মূল ইরাণীয় রূপ '*গরি') ; সংস্কৃতে 'গচ্ছতি'—অবেস্তায় 'জসইতি' (মূল ইরাণীয় রূপ—'*জসতি') ; সংস্কৃতের 'সর্ব্ব', অর্থাৎ 'সর্উঅ'—অবেস্তার 'হউর্ব্ব' অর্থাৎ 'হউর্উঅ' (মূল ইরাণীয় রূপ '*হর্ব = হর্উঅ')। ভারতবর্ষে বৈদিকের বিকারে জাত প্রাকৃতেও কচিৎ এইরূপ পূর্ব্বাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের ব্যত্যয় বা বিপর্য্যয় হইত, তাহারও প্রমাণ আছে : যথা—সংস্কৃত 'কার্য্য = কার্ইঅ' শব্দ প্রাকৃত অর্দ্ধ-তৎসম রূপে '*কাইর্ইঅ, '*কাইর্অ = *কাইর' তে প্রথম রূপান্তরিত হয় ; পরে সন্ধি করিয়া দাঁড়ায় '*কাইর> কের'—ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হিসাবে প্রাকৃতে এই কের-পদ প্রচলিত হয় ; 'পর্য্যন্ত = পর্য়ন্ত = পর্ইঅন্ত = পরিঅন্ত> *পইরন্ত> পেরন্ত' ; 'পর্ব্ব = পর্ব = পর্উঅ'> *পউর্উঅ> পউর> পোর' ; ইত্যাদি দুই চারিটী পদ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, এবং এগুলি এই পূর্ব্বাভাসাত্মক বিপর্য্যয়ের বা আগমের ফল।

ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বরধ্বনির এই প্রকারের গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis (ফরাসীতে Épenthèse)। শব্দটী গ্রীক ভাষার একটী প্রাচীন শব্দ। গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবল মাত্র 'আগম', এবং এই প্রকার পূর্ব্বাভাসাত্মক আগমকেও জানাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হইত : যথা—bainō, পূর্ব্বরূপ *baniō ; leipō, পূর্ব্বরূপ *lepiō ; eimi, পূর্ব্বরূপ emmi, তৎপূর্ব্বে *esmi ; ইত্যাদি। অক্স্‌ফোর্ড ডিক্‌শনারীর মতে, ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল 'আগম' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—অন্তঃস্থ বর্ণের পূর্ব্ব অক্ষরে আনয়ন। গ্রীক Epenthesis শব্দটি ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বাভাসাত্মক ধ্বনি-বিপর্য্যয় বা ধ্বন্যাগমকে স্বল্পাক্ষর সুখোচার্য্য একপদময় নামের দ্বারা বাঙ্গালায় অভিহিত করিতে হইলে, গ্রীক Epenthesis শব্দের অনুরূপ একটী শব্দ, গ্রীকের স্বস্থানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, এবং সংস্কৃতে বিদ্যমান না থাকিলে গ্রীক শব্দটীর ধাতু ও প্রত্যয় ধরিয়া অনুরূপ সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় যোগে নূতন একটী শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক Epenthesis শব্দটীর বিশ্লেষ এই—epi উপসর্গ + in উপসর্গ + thesis শব্দ ; thesis শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক the (থে) ধাতুতে -sis প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। epi উপসর্গের অর্থ 'উপরে', 'অধিকন্তু' (upon, in addition to) ;

en-এর অর্থ 'ভিতরে'; thesis অর্থে, এবং 'স্থাপন', বা 'রক্ষণ'। গ্রীক epi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 'অপি';—'উপরে' অর্থে 'অপি' উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 'নিকটে, সংযোগে, অধিকন্তু, অভ্যন্তরে'—এই সকল অর্থেও ব্যবহৃত হইত; 'অধিকন্তু'—এই অর্থে এই উপসর্গের অব্যয়-রূপে ব্যবহারও আছে; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর সঙ্গে 'অপি' ব্যবহৃত হইয়া 'অপিধান' এবং 'অপিধি' এই দুই পদ বিদ্যমান ছিল—যাহাদের অর্থ 'আবরণ'; 'অপি' উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া 'পি' রূপ ধারণ করিয়াছিল—যথা—'অপিধান—পিধান'; 'অপি'+'নহ'='পিনহ'; ইত্যাদি। en-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই; en-এর অর্থ 'ভিতরে'; ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে 'নি' (যেমন—'নি-হিত, নি-বাস', ইত্যাদি;) গ্রীক ধাতু the-র প্রতিরূপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু 'ধা', এবং -sis প্রত্যয়ের সংস্কৃত রূপ 'তিস্' বা '-তঃ'; thesis='ধিতিস্'; বৈদিক ভাষায় 'ধিতি' পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় 'হিতি'। তাহা হইলে দাঁড়ায়, epi-en-thesis **অপি-নি-হিতি** বাঙ্গালার বিশিষ্ট এই পূর্ব্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্য্যয়কে অতএব **অপিনিহিতি** বলা যাইতে পারে;—'উপরে বা অধিকন্তু আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'—এইরূপ অর্থ এই নবসৃষ্ট শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ অনায়াসে দ্যোতিত হইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থ-গত সমতাও পাওয়া যাইবে। 'অপিনিহিতি'-র বিশেষণে 'অপিনিহিত' শব্দ (epenthetic অর্থে) প্রযুক্ত হইতে পারিবে

(৩) তৃতীয় প্রকারের পরিবর্ত্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' বা 'উ' আগে চলিয়া আইসে, তাহা পূর্ব্বের অক্ষরে অবস্থিত 'অ' বা 'আ' বা অন্য স্বরের পার্শ্বে বসিয়া, তাহার সঙ্গে একযোগে diphthong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি করে;—যেমন, 'রাখিয়া'> রাইখ্যা'—এখানে সংযুক্ত স্বর 'আই'; 'করিয়া'>'কইর‍্যা'—এখানে সংযুক্ত-স্বর 'অই' (স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'অই'-এর 'অ' ও-কারে পরিবর্ত্তিত হয়, ফলে উচ্চারণে ('ওই'); 'দীপরুক্ষ'>'দীঅরুক্খ'> 'দিঅরুখা'>'দিঅউরখা'>'দেউর্ খা' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'এউ')>'দেইর্ খো'> 'দের্ খো'; 'মাছুয়া'>'মাউছুয়া' (এখানে সংযুক্ত-স্বর 'আউ')>'মাইছুয়া' (এখানে 'আউ'-এর 'আই'-তে পরিবর্ত্তন)>'মেছো'; ইত্যাদি। এই সকল সংযুক্ত-স্বরের দ্বিতীয় অঙ্গ 'ই' (মূল 'ই', এবং উ-কারের পরিবর্ত্তনে জাত 'ই') পূর্ব্ব-স্বরের সহিত সন্ধিযোগে মিশিয়া যায় ('রাইখ্যা'>'রেখ্যা'>'রেখে'; 'মাউছুয়া'> মাইছো'> মেছো'), কিম্বা লুপ্ত হইয়া যায় ('দেউর্ খা'>'দেইর্ খো >দের্ খো'; 'কইর‍্যা'> 'কর‍্যা>'ক'রো)। অ-কারের পরে এই অপিনিহিত 'ই' আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্ব্বস্থিত অ-কারকে ও-কারে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া, এই অপিনিহিত 'ই' নিজ প্রভাব-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যায়। য-ফলার 'য়' (=ইঅ)-তে যে ই-ধ্বনি বিদ্যমান আছে, [illegible] মধ্যযুগের বাঙ্গালায় (ও মধ্যযুগের উড়িয়ায়) অপিনিহিত হইয়া উচ্চারিত হইত; যথা—'সত্য=সত্তিঅ> সইত্তিঅ, সইত্ত; পথ্য= পৎথিঅ> পইথিঅ> পইথ, বাহ্য=বাজ্ঝিঅ> বাইজ্ঝ (মধ্যযুগের উড়িয়ায় 'বাহিজ').;

যোগ্য = যোগ্‌গ্অ> যোইগ্‌গিঅ> যোইগ্‌গ'। আধুনিক বাঙ্গালায় এইরূপ অপিনিহিত য-ফলা বিদ্যমান আছে,—পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অস্তিত্ব এখনও লুপ্ত হয় নাই (যেমন 'সত্য> সইত্ত, পথ্য> পইৎথ, বাহ্য = বাইজ্ঝ, যোগ্য = যোইগ্‌গ'); চলিত ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং লোপের পূর্ব্বে স্বরসঙ্গতি-অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী মূল অ-কারকে ও-কারে, মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে, নয় প্রথম অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূর্ব্ব-স্থানে পূর্ণ ই-কারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—'সত্য = সত্তিঅ> সইত্তিঅ সইত্ত> (১) সোইত্ত, (২) সোইত্তিঅ> (১) সোত্তো (শোত্তো), (২) সোত্তি (শোত্তি—'সত্যি'রূপে লিখিত হয়); পথ্য = পৎথিঅ> পইথিঅ, পইথ> (১) পোইথ, (২) পোইথিঅ> (১) পোথো, (২) পোথি (= পথ্যি); বাহ্য = বাজ্ঝিঅ, বাইজ্ঝ> (১) বাজ্ঝো, (২) বাজ্ঝি, বাজ্ঝে; যোগ্য = যোগ্‌গিঅ> যোইগ্‌গিঅ, যোইগ্‌গ> (১) যোইগ্‌গ, (২) যোইগ্‌গি> (১) যোগ্‌গো, (২) যুগ্‌গি'; ইত্যাদি। 'ক্ষ'-র উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল 'খ্য' ('ক্ষ'—এই সংযুক্ত অক্ষরের নাম বা বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়—'ক-য়ে মূর্দ্ধণ্য-ষয়ে = খিঅ'), এবং 'জ + ঞ = জ্ঞ'-এর উচ্চারণ ছিল 'গ্যাঁ'; উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও সত্যকার য-ফলার মত কার্য্য করে, যথা—'লক্ষ = লখ্য = লক্‌খিঅ> লইক্‌খিঅ, লইক্‌খ> লোক্‌খি (কলিকাতার 'গ্রাম্য' উচ্চারণে), লোক্‌খো; রক্ষা = রক্‌খিআ> রইক্‌খিআ, রইক্‌খা> রোক্‌খ্যা রোক্‌খে, রোক্‌খা; আজ্ঞা = আগ্যাঁ = আগ্‌গিআঁ> আইগ্‌গিআঁ, আইগ্‌গাঁ> এঁগ্‌গেঁ আঁগ্‌গেঁ আঁগ্‌গাঁ'; ইত্যাদি।

পুরাতন বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিনিহিতি ও তদনন্তর এই প্রকারের পরিবর্ত্তনে নূতন আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে; যেমন -'বৎস-রূপ> বচ্ছরূব> বচ্ছরূঅ> বাছরূ, বাছরু> বাছউর্> বাছোউর্> * বাছুউর, বাছুর'; 'কামরূপ> কামরূব> কাবঁরূঅ> কাবঁরূ, কাবঁরু> কাবঁউর্> কাবোঁউর্> *কাবুঁউর, কাবুঁর'—বাঙ্গালা পুথিতে 'কাঙুর' (কাঙুর কামিখ্যা), সপ্তদশ শতকের ইংরেজ ভ্রমণকারীর লেখায় Caor।

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব্ব-স্বরের পরিবর্ত্তন—ইহাই হইল আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বনি-বিকারের মূল কথা। বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য কোনও কোনও আর্য্যভাষায় মিলে। যেমন, ছোটনাগপুরে প্রচলিত ভোজপুরিয়াতে 'কাটি, মারি' (= কাটিয়া, মারিয়া)> 'কাইট্, মাইর্'; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে ইহা পাওয়া যায়ঃ 'জঙ্গল' শব্দের প্রথমাতে 'জঙ্গলু> *জঙ্গউল্> জঙ্গুল্', সপ্তমীতে 'জঙ্গলি> *জঙ্গইল্> জঙ্গিল্'; গুজরাটীতে ক্বচিৎ মেলে, যেমন, 'ঘরি (= গৃহে)> *ঘইর্> ঘের'। এবং সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্ত্তন খুবই সাধারণ।

ভারতের বাহিরের বহু ভাষায়ও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়। ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য্য) ভাষার জরমানীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই সাধারণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনিবিকারের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। ইংরেজী ও জারমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রাচীন ইংরেজী *Franc-isc> Frencisc (isc-এর i (ই)-কারের

অপিনিহিতি, *Fraincsc রূপে পরিবর্ত্তন, পরে a(আ)-কারের i(ই)-কারের প্রভাবে পড়িয়া e (এ)-কারে পরিণতি) > আধুনিক ইংরেজী French ; প্রাচীন ইংরেজী একবচনে mann (= মানুষ), বহুবচনে *mann-i, তাহা হইতে menn, আধুনিক ইংরেজী man—men ; fōt (= পা)—বহুবচনে *fōt-iz—পরে fœt, যাহা হইতে fēt, আধুনিক foot - feet ; প্রাচীনতম ইংরেজী *haria (হারিয়া = সেনা), প্রাচীন ইংরেজী here (= হেরে, এখন এই শব্দটী লুপ্ত) ; তদ্রূপ brother—brether (bretheren), জারমানের Bruder—বহুবচনে Brüder (Brueder), এই নিয়মে।

এই ধ্বনি-পরিবর্ত্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায় ? জারমান ভাষায় ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জারমান পণ্ডিতেরা ইহার একটী বেশ নামকরণ করিয়াছেন, (Klopstock ক্লপ্‌ষ্টক্ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম সৃষ্ট হইয়া ব্যবহৃত হয়)। নামটী হইতেছে Umlaut (উম্-লাউৎ) ; এবং এই শব্দ ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে ; ইংরেজীতে আর একটী নাম ব্যবহৃত হয়—Vowel Mutation (ফরাসীতে Mutation Vocalique)। Umlaut শব্দটী জারমান উপসর্গ um (যাহার অর্থ 'চতুর্দ্দিকে, অভিতঃ,' প্রতি, উপরে, এবং সংস্কৃত 'অভি' উপসর্গ হইতেছে যাহার প্রতিরূপ), ধ্বনি-বাচক শব্দ Laut-এর সহিত যুক্ত হইয়া Umlaut শব্দের সৃষ্টি ; মোটামুটি অর্থ, 'ঘুরিয়া পরিবর্ত্তিত ধ্বনি'। এই Umlaut শব্দের আধারের উপর ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি। আধুনিক জারমান Laut বিশেষ্য শব্দ ; Laut-এর ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে loud (বিশেষণ শব্দ) ; Laut, loud এই উভয়েরই আদি জারমানিক মূল-রূপ হইতেছে *hluda বা *xluðáz (খ্‌লুদাস্) এবং ইহার আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মূল হইতেছে *klutós (ক্লুতোস্)—সংস্কৃতে যাহার পরিণতি হইতেছে śrutáḥ 'শ্রুতঃ' ; শব্দটীর ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় *kleu বা *klu সংস্কৃত śru 'শ্রু'। Umlautএর উপসর্গ ও ধাতু-প্রত্যয় ধরিয়া ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অভি-শ্রুত'। যথা—

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় *m̥bhi-klutós (ম্ভি-ক্লুতোস্)

সংস্কৃত	প্রাচীন জরমানীয়	গ্রীক
abhi-śrutáḥ 'অভিশ্রুতঃ'	*umbi-xluðáz → আধুনিক জারমান Umlaut.	amphi-klutós (আম্ফি-ক্লুতোস্)

'অভিশ্রুত' কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা-সূচক পদ নহে, ইহার রূঢ়ী অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে 'বিখ্যাত'। 'অভি+শ্রু' ধাতুর অর্থ হইতেছে 'সম্যক্ রূপে শোনা', এবং এই অর্থে 'অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রুত্য' পদের প্রয়োগ আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার জন্য, Umlautএর আক্ষরিক প্রতিরূপ 'অভিশ্রুত' শব্দ ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় ক্তটীকে বদলাইয়া ক্তি-প্রত্যয়যুক্ত **অভিশ্রুতি** শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। 'শ্রুতি' শব্দ উচ্চারণ-তত্ত্বে পূর্ব্বেই প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা জৈন প্রাকৃতের 'য-শ্রুতি' ('বচন > বঅণ > বয়ণ', 'মদন > মঅণ,ময়ণ,' দুই উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে

য-কারের আগম)। এইরূপ য-শ্রুতি বাঙ্গালাতেও আছে—যথা 'কেতক> কেঅঅ> কেয়া', কচিৎ 'কেওয়া = কেবা'; এবং য-শ্রুতির অনুরূপ 'ব-শ্রুতি'-ও প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলিতে আছে—যেমন, 'কেতক-ট> কেঅঅড> কেবঅড> কেবড় = কেওড়া', ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'য-শ্রুতি' আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 'ব-শ্রুতি' ও মেলে এবং পারিভাষিক শব্দ 'ব-শ্রুতি'-ও চলিবে; 'অভিশ্রুতি'তে তদ্রূপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। 'অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণতত্ত্বের আর একটী সংজ্ঞা প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অভিনিধান'—পদের অন্তে হলন্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে এই বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শব্দ দ্বারা দ্যোতিত হইত।

(৪) চতুর্থ প্রকারের পরিবর্ত্তন ধাতুর মূল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া। এই পরিবর্ত্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি আর্য্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন—'চলে <চলই <চলদি <চলতি; চালে <চালেই <চালেদি <চালেতি <*চালয়্তি <চালয়তি; চল> চলঃ; চাল> চালঃ; টুটে <টুটই> টুট্টই টুট্টদি <টুট্টতি <ত্রুট্যতি; তোড়ে <তোড়েই <তোড়েদি <তোডেতি <তোটেতি <তোটয়তি <ত্রোটয়তি—টুট = ত্রুট্, তোড় = ত্রোট; মন—মান; দিশা—দেশ <দিশ্, দেশঃ'। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই প্রকারের পরিবর্ত্তন বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না,—'চল—চাল', 'পড় পাড়' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে 'অ আ'-র অদল-বদল যেখানে দেখা যায়, সেখান ছাড়া অন্যত্র স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন ধাতুগত স্বর-ধ্বনির নিয়মিত পরিবর্ত্তনকে উলট্পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আর্য্য-ভাষাতেও এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়; যথা—'মর্না> মার্না, খিঁচ্না> খৈঁচ্না, তপ্না> তাব্না (তপ্যতে—তাপয়তি> তপ্পই—তাবেই> তপে—তাবে), জল্না—বার্না (জ্বলতি—জ্বালয়তি> জলই—বালেই> জলে—বারে), নিকল্না—নিকাল্না, কাট্না—কট্না, পাল্না—পল্না;' ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অনুসারে ধাতুস্থ স্বরধ্বনির নূতন রূপ গ্রহণ করা, আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি নহে—প্রাকৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু একটী বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ, এই তিনটী সংজ্ঞা দ্বারা এই পরিবর্ত্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন।

নিম্নে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কার্য্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু	মূলরূপ	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
বদ্ ধাতু		বদ্ (বদতি, বশংবদ)	বাদ্ (অনুবাদ)	উদ্ (অনূদিত)
যজ্ ধাতু		যজ্ (যজতি, যজ্ঞ)	যাজ্, যাগ্ (যাজক, যাজ্ঞিক, যাগ)	ইজ্ (ইজ্যা, ইষ্টি)
বিদ্ ধাতু	বিদ্ (বিদ্যা)	বেদ্ (বেদ)	বৈদ্ (বৈদ্য)	
শ্রু ধাতু		শ্রউ = শ্রব্, শ্রো (শ্রবণ, শ্রোতা)	শ্রাব্, শ্রৌ (শ্রাবক, শ্রৌত)	
দুহ্ ধাতু	দুহ্, দুঘ্ (দুগ্ধ)	দোহ্, দোঘ্ (দোহন, দোগ্ধ)	দৌহ্, দৌঘ্, দৌগ্ধ	
নী ধাতু	নী (নীতি)	নই = নয়্, নে (নয়ন, নেতা)	নৈ, নায়্ (নৈতিক, নায়ক)	

ধৃ ধাতু ধৃ, ধৃ (ধৃতি)　ধর্ (ধরণ, ধরা)　ধার্ (ধারণ)
কৢপ ধাতু কৢপ্ (কৢপ্তি)　কল্প্ (কল্পনা)　কাল্প্ (কাল্পনিক)

ধাতুর স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্ত্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের যাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মেলে ; এইরূপ পরিবর্ত্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর এক অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ; যথা—

গ্রীকে—

péda (= পাৎ, পাদ)	póda	pōs	epi-bd-ai
dérkomai (*দর্শামি)	dedorka (= দদর্শ)		é drakon (অদর্শম্)
tithēmi (= দধামি)	thōmos (= ধামঃ)		thetós (= হিতঃ)

লাটিনে—

fido (= বিশ্বাস করি)	foedus	fides (বিশ্বাস)
dō (দদামি)	dōnum (দানম্)	datus (দত্তঃ)
canō (গান করি)	cecini (আমি গাহিলাম)	cantus(গান)

গথিকে—

bindan (= bind বন্ধ ধাতু)	band	bundum	bundans
baíran (= bear ভৃধাতু)	bar	bērum	baurans
saíxwan (= see সচ ধাতু)	saxw	sēxwum	saíxwans (x = h)
lētan (let)	laílōt	laílōtum	lētans

ইংরেজীতে—

bind	bound	bounden	
bear	bore	boren	
see	saw	seen	
sing	sang	sung,	song

প্রাচীন আইরীশে—

-tíag (আমি যাই),	techt (গমন)
melim (চূর্ণ করি),	mlith (চূর্ণ করা)
saidid (ব্যবস্থা করে)	síd (সন্ধি)
il (বহু)	uile (সকল)
lín (সংখ্যা),	lān (পূর্ণ)

প্রাচীন স্লাভে—

vedǫ (নয়ন করি)　(voje-)voda　věs = ved-som　pro-važdati = vadjati

tekǫ (দৌড়াই)　tokŭ　tečiti　texŭ = teksom　pri-těkati, ras-takati

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল-স্বর অবিকৃত থাকিত না, নানা অবস্থায় তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্ত্তনের ধারাটী নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারার

অন্তর্নিহিত সূত্রটীরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর স্বরধ্বনির যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহাদের গ্রন্থন-সূত্রটী হইতেছে এই : ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, প্রত্যয় বা বিভক্তির দ্বারায় যুক্ত হইয়া পদ-রূপে ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent বা স্বরাঘাত এবং pitch accent বা উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে পড়িয়া, সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবর্ত্তনে নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং ক্বচিৎ বা স্বরাঘাতের একান্ত অভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত ; যথা,—

মূল ধাতু ed (= সংস্কৃত 'অদ্')—প্রকৃতিগত বা গুণগত পরিবর্ত্তনে হইল od, এবং এই হ্রস্ব রূপ, মূল ed ও তাহার বিকারজাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ēd, ōd ; এবং স্বরাঘাতের একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -d রূপ লইয়া দাঁড়াইল ; ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই,—

ed od ēd ōd d

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের e, o, a এই তিনটী হ্রস্ব ধ্বনি সংস্কৃতে একটী মাত্র রূপ a বা অ-কারে পর্য্যবসিত হয়, এবং তদ্রূপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ ē ō ā ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ ā বা আ-কারে পর্য্যবসিত হয় ; সুতরাং—

হ্রস্ব ed, od এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad = 'অদ্', ও দীর্ঘ ēd ōd এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ād = 'আদ্' ; এইরূপে 'অদ্' ধাতুর ফল হইল, 'অদ্' (গুণ), 'আদ' (বৃদ্ধি) ও 'দ্' ; যথা—

'অদ্-তি = অত্তি' ; 'অদ্-অনম্ = অদনম্' ; 'অদ্-ন = অন্ন' ; 'আদ' (লিট্) ; 'অদ্ > 'দ্' + '-অন্ত্' (শতৃ) = 'দন্ত' (= যাহা খাদন ক্রিয়া করে)।

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ—ইহাদের এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্ত্তনের সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূলরূপে থাকে, এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘীকরণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা 'গুণ' পাই ; যেখানে ইহার নিজ মূল প্রকৃতির বা পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে পাই 'বৃদ্ধি' ; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে 'য র ল ব' (অর্থাৎ 'ই+অ, ঋ+অ, ঌ+অ, উ+অ') স্থলে যেখানে 'য়্, র্, ল্, ব্' বা 'ই, ঋ, ঌ, উ' পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্ত্তনকে বলে সম্প্রসারণ। আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে, ইহাই হইল গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা।

সমগ্র ব্যাপারটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটী ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জারমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮১৯ সালে জারমান ভাষাতত্ত্ববিৎ Jakob Grimm য়াকোব্ গ্রিম্ জারমান ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাতত্ত্বানুসারী ব্যাকরণ লেখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্ত্তনের নামকরণ করিবার জন্য জারমান ভাষায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlaut শব্দের অনুরূপ) একটী শব্দ সৃষ্টি করেন—শব্দটী হইতেছে Ablaut ; উপসর্গ ab-এর সঙ্গে পূর্ব্ব-

বর্ণিত laut শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে off, ও সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অপ'। সম্পূর্ণ শব্দটীর সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অপশ্রুত'; কিন্তু, Umlautএর প্রতিরূপ হিসাবে যেমন 'অভিশ্রুত' না ধরিয়া 'অভিশ্রুতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রূপ এখানেও অপশ্রুত না বলিয়া 'অপশ্রুতি'কেই গ্রহণ করিতে চাহি। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল শ্রুতির—অপ-গমন বা বিকার,—ইহাই হইবে 'অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ। প্রাকৃত ব্যাকরণের 'য-শ্রুতি,' তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'ব-শ্রুতি', এবং নবসৃষ্ট 'অভিশ্রুতি'র পাশে এই 'অপশ্রুতি' শব্দ ধ্বনি বা উচ্চারণগত পরিবর্তনের সংজ্ঞা হিসাবে সহজ ভাবেই এক পর্য্যায়ের হইয়া দাঁড়াইবে। Ablaut বা অপশ্রুতির অন্য কয়েকটি নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে ইংরেজী Vowel Alternance, বা 'স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্তন', ফরাসীতে alternances vocaliques; কিন্তু ইংরেজীতে Ablaut শব্দটীই বহুশঃ গৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবং এতদ্ভিন্ন, Ablaut-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া নূতন একটী শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন; বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাঁহারা জারমান Ablaut শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ alternance vocalique অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ab-এর গ্রীক প্রতিরূপ apo, এবং Lautএর গ্রীক প্রতিশব্দ phōnē, এই দুই মিলাইয়া, গ্রীক apophōnēia, তাহা হইতে লাটিন apophonia শব্দ কল্পনা করিয়া, এই apophonia শব্দকে ইংরেজীতে Apophony এবং ফরাসীতে Apophonie রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ 'অপশ্রুতি' দ্বারায় বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে আশা করা যায়। 'চল—চাল', 'টুট—তোড়', 'দিশা—দেশ', 'পড়—পাড়', প্রাচীন বাঙ্গালার 'বিদু (=বিদ্বৎ) · বেজ (=বৈদ্য)'—এই প্রকারের স্বরবৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 'অপশ্রুতি'র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্য যে সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তাহাদের নাম বিদ্যমান আছে; যথা—লোপ ও আগম (আদ্য, মধ্য, অন্ত্য), এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (anaptyxis)। এগুলি লইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত **স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি** ও **অপশ্রুতি** ভাষায় চলিতে পারিবে কি না, সুধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

নেপালে ভাষা-নাটক*

বিগত ১৩২৪ সালে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" শীর্ষক এক বই প্রকাশ করেছেন। এই বইয়ে চারখানি নাটক আছে—বিদ্যা-বিলাপ, মহাভারত, রামচরিত্র ও মাধব-কামকন্দলা। ননী বাবু বলেছেন যে, প্রথম তিনখানি নাটকের ভাষা একটু পুরাণ ছাঁদের বাঙ্গলা এবং চতুর্থ নাটকখানি যেন একটু বেশী বেশী হিন্দী ছাঁদে বা মৈথিলী ছাঁদে লেখা। ভাষা অনেক স্থানেই যে বাঙ্গলা, তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু একই নাটকে অন্য ভাষাও দেখা যায়। কোন নাটকই এক ভাষায় লেখা নয়। যেমন মহাভারত নাটকে কোথাও—

চল তবে মুনিবর মুদিত সুবেশ
জপ তপ করয়িতে, নাহি মোর ক্লেশ
তপোবন জায় পঢ়ব হমে বেদ—(পৃঃ ৪৩)

অথবা— গমন করব নিজগৃহ আনন্দে আজ

কিন্তু অন্যত্র— কি কহব তুঅ গুণধাম, নাগর
তুঅ তুলনা নহি কেও জগ আন—(পৃঃ ৩৯)

অথবা— দেখি নয়ন-চকোরা মন ভুলল মেরা (পৃঃ ৬৫)

যে দুটী বিভিন্ন কথিত ভাষায় লেখা, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম ভাষাটী বাঙ্গলা এবং দ্বিতীয়টীকে হিন্দী নয়, বরং মৈথিলী বলা চলে। সুতরাং "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" না বলে "ভাষা-নাটক" বলাই সমীচীন। আমি সম্প্রতি এ জাতীয় কতকগুলি নাটকের খোঁজ পেয়েছি। তাদের বেশীর ভাগই নেপাল রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত। বাকী কয়েকখানির সন্ধান অন্যত্র পেয়েছি। এই সব নাটকের কথা বল্‌তে গেলে নেপালে সুকুমার সাহিত্য-চর্চ্চার কথা উঠে পড়ে। সুতরাং গোড়ার কথা কিছু না বল্‌লে মধ্য-যুগের নেপালের এই সাহিত্যিক আন্দোলন সম্যক্ বোঝা যায় না।

মিথিলার রাজা হরিসিংহদেব ১৩২৩ কিংবা ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী মুসলমানদের হাতে নিগ্রহের ভয়ে নিজের দেশ ছেড়ে নেপালে উপস্থিত হন। নেপালের সঙ্গে মিথিলার সম্বন্ধ আরও প্রাচীন। সুতরাং হরিসিংহ নেপালই সব চেয়ে নিরাপদ্ স্থান মনে করে হিন্দু-ধর্ম্মের পতাকা সেখানে উড্ডীয়মান রাখ্‌তে বদ্ধপরিকর হলেন। নেপাল সহজেই তাঁর করায়ত্ত হল ও তিনি সেখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করলেন। এই থেকে মিথিলা ও বাঙ্গালার প্রভাব নেপালে নূতন যুগ সৃষ্টি করতে সুরু করল। হরিসিংহদেব নিজে বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। যে মিথিলা তিনি ত্যাগ করে এসেছিলেন, সেটা ছিল তখন বিদ্যার একটী স্মরণীয় পীঠস্থান। নেপালেও তিনি একটী ছোটখাটো মিথিলা গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। এ কাজ যে নেপালের প্রাচীন অধিবাসীদের দিয়ে হবে না, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, নেপালের অধিবাসীরা তিব্বতী জাতির শাখা-

---

* ১৩৩৬, ২৯এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিশেষ। তাদের ভাষাও তিব্বতীভাষা থেকে উদ্ভূত। শুধু সে ভাষায় সংস্কৃত কথা বহু ঢুকেছিল, এই যা প্রভেদ। সুতরাং হরিসিংহদেবের সঙ্গে যে সব মৈথিলী বা বাঙ্গালীরা নেপালে গিয়াছিলেন, তাঁরাই এ কাজে ব্রতী হলেন। হরিসিংহদেবের মন্ত্রী ঠাকুর চণ্ডেশ্বর "স্মৃতিরত্নাকর" এবং "কৃত্য-চিন্তামণি" নামক দুখানি স্মৃতিগ্রন্থ সম্পাদন করালেন। এই স্মৃতি অনুসারে নেপালের সমাজ ও ধর্ম্ম চালিত হতে থাকল।

হরিসিংহদেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর বংশের রাজপুত্রী রাজল্ল দেবীর সহিত নেপালের প্রাচীন মল্লবংশের জয়স্থিতি মল্লের বিবাহ হয় ও জয়স্থিতি নেপালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই থেকে মল্লরাজাদের পুনরুত্থান হল। মল্লরাজারাও নানা ভাবে মিথিলার সহিত সংবদ্ধ ছিলেন। জয়স্থিতি মল্লের রাজত্বকাল ১৩৮০—১৩৯৪ খৃঃ অঃ। জয়স্থিতি রাজা হয়ে হরিসিংহদেবের প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করতে সুরু করলেন। হরিসিংহের অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করতে প্রচেষ্ট হলেন ও ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনিয়ে নেপালের সমাজ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ কীর্ত্তিনাথ উপাধ্যায়, রঘুনাথ ঝা, শ্রীনাথ ভট্ট, মহীনাথ ভট্ট ও রমানাথ ঝা। এঁদের ভিতর অধিকাংশই ছিলেন মিথিলার লোক। এঁদের উপর নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পাদনের ভার দেওয়া হল। এবং এই থেকেই নেপালের সঙ্গে মিথিলার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠল। মিথিলার রাজসভা তখন বিদ্যাপতির সঙ্গীতে মুখরিত হচ্ছে। এই সঙ্গীতও যে ক্রমে নেপালে গিয়ে পৌঁছিবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু সুকুমার সাহিত্যে প্রথম চেষ্টা হল সংস্কৃতে। জয়স্থিতি মল্ল হরিসিংহের মতই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিশেষ ভাবে তিনি নাটক ভালবাসতেন। রাজল্ল দেবীর সহিত তাঁর বিবাহের সময় নাট্যশাস্ত্রে পারদর্শী মণিকের রচিত ভৈরবানন্দ নাটক অভিনীত হয়। মণিক ছিলেন রাজবর্দ্ধনের পুত্র এবং তাঁরা খুব সম্ভব মিথিলা থেকে নেপালে এসেছিলেন। জয়স্থিতির পুত্রের জন্মোৎসবে পুনরায় রাজ-সভায় নাটক অভিনীত হল। এ নাটক চারি অঙ্কের রামায়ণ নাটক, নাট্যকার ধর্ম্মগুপ্তের রচিত। ধর্ম্মগুপ্ত প্রথমে মিথিলার রাজা যুথসিংহের সভায় ছিলেন। তাঁর পিতা রামদাস রাজগুরু হয়ে নেপালে আসেন। এর কিছু পূর্ব্বে লিখিত আর একখানি নাটকের খোঁজ পাওয়া যায়। হরিসিংহদেবের সমসাময়িক কবিশেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ধূর্ত্তসমাগম নামক নাটক রচনা করেন। জ্যোতিরীশ্বর নাট্যশাস্ত্রেও অধিকারী ছিলেন। তিনি কথিত ভাষায় বর্ণন-রত্নাকর নামক একখানি নাট্যশাস্ত্রের বইও লিখেছিলেন। সুতরাং হরিসিংহদেবের নেপাল আগমনের সময় থেকে সুকুমার সাহিত্যচর্চ্চা সুরু হয় এবং সেই সময় থেকে (১৩২৪—১৪০০ খ্রীঃ অঃ) চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত নাটক লেখা হয়, তা সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু এ সংস্কৃত-যুগ বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই কথিত ভাষায় সুকুমার সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু হয়। এই পরিবর্ত্তনের কারণও খুব গূঢ় নহে। তখন মিথিলায় বিদ্যাপতি ও বঙ্গে জয়দেব ও চণ্ডীদাস নূতন যুগের সৃষ্টি করেছেন। নেপালের কবিরাও যে এই যুগ-প্রবর্ত্তকদের রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার বহু প্রমাণ আছে।

কিন্তু নেপালের "কথিত ভাষা" সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট করে বল্‌বার দরকার। পূর্ব্বেই বলেছি, নেপালের সাধারণ লোকের ভাষা ছিল তিব্বতী থেকে উদ্ভূত—নেওয়ারী ভাষা। এ ভাষায় কোন প্রাচীন রচনা পাওয়া যায় না। দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই ভাষায় কোন কোন দানপত্র, শিলালিপি বা তাম্রপত্র লেখা হত। তার উদ্দেশ্য ছিল—সেগুলিকে সাধারণের বোধগম্য করা। কিন্তু সাহিত্য লিখিত হত প্রথমে সংস্কৃতে ও পরে অন্য ভাষায়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যে ভাষায় সাহিত্য রচনা হতে আরম্ভ হল, তার আভাস এই প্রবন্ধের গোড়ায়ই দিয়েছি। তাহা কখনও প্রাচীন মৈথিলী, কখনও বা প্রাচীন বাঙ্গলার অনুরূপ। তার একমাত্র যুক্তিযুক্ত কারণ মনে হয় যে, নেপালের প্রাচীন রাজবংশ ও প্রভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষার ভাষা ছিল মৈথিলী। কারণ, তাঁদের অনেকেই মিথিলা থেকে গিয়েছিলেন। কেহ কেহ যে বাঙ্গলা দেশ থেকেও গিয়েছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং রাজারা বাঙ্গলা ভাষাও জান্‌তেন বা পড়তেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গলা ও মৈথিলীর ভিতর প্রভেদ খুব কম এবং দুই দেশের শিক্ষায় যথেষ্ট আদান-প্রদান ছিল। শিক্ষার এই উভয় স্রোতই নেপালে গিয়ে পৌঁছেছিল। শিক্ষিত নেওয়ারেরাও রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এই ভাষা বুঝতেন এবং পরবর্ত্তী কালে নেওয়ারী ভাষাতেও যে এইরূপ সাহিত্য-চর্চ্চার চেষ্টা হয়েছিল, সে কথা পরে বল্‌ব। নেপালে বর্ত্তমান কালেও রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে নেওয়ারদের এই প্রকার সম্বন্ধই দেখা যায়। পার্ব্বতীয়া নেওয়ারদের শিক্ষার ভাষা।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কোন রচনা আমি এখনও পাই নাই। তবে এই শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা দেখ্‌লে মনে হয়, তার পূর্ব্বেও নেপালে ঐ ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চা হয়েছিল। জয়স্থিতির বংশধর যক্ষমল্ল ১৪৯৬ খৃঃ অঃ নিজের রাজ্য তিন ভাগে ভাগ করে তিন পুত্রকে দিয়ে যান। এই সময় থেকে রাজারা তিন রাজধানী—কাটমণ্ডু, ভাতগাঁও ও বনেপা থেকে রাজত্ব শাসন করতে থাকেন। বনেপার রাজা জয়রণমল্লের রচিত এক সংস্কৃত নাটক পাওয়া যায়। এই নাটকের নাম পাণ্ডববিজয়। সভাপর্ব্ব নাটক নামেও এ নাটক পরিচিত। এই নাটক পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৪৯৫—৯৬ খৃঃ অঃ রচিত হয়েছিল। কিন্তু সুকুমার সাহিত্য চর্চ্চায় ভাতগাঁওএর রাজারাই সব চেয়ে বেশী নাম করেছিলেন। ভাতগাঁওএর রাজা, রাজা বিশ্বমল্ল ও তৎপুত্র ত্রৈলোক্যমল্লের সময়ে রচিত নাটকের সন্ধান আমি পেয়েছি। ত্রৈলোক্যমল্লের অন্য নাম ত্রিভুবনমল্ল। ইঁহারা উভয়ে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ও শেষভাগে নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে বিশ্বমল্লের সময়ে রচিত এক নাটক রক্ষিত আছে। নাটকটী অসম্পূর্ণ। নাটকের নাম বিদ্যাবিলাপ নাটক। ননী বাবু যে বিদ্যাবিলাপ নাটক ছেপেছেন, তা' পরবর্ত্তী সময়ে ভূপতীন্দ্রমল্লের লিখিত। ভূপতীন্দ্রমল্লের বিদ্যাবিলাপ বোধ হয়, এই বিদ্যাবিলাপের অনুকরণে লিখিত হয়েছিল। এই নাটক যে বিশ্বমল্লের সময়ে লেখা হয়েছিল, তার প্রমাণ প্রথম পত্রেই পাওয়া যায়। সূত্রধার বল্‌ছেন,—"শ্রীমৎ শ্রীভক্তপত্তননগরী সকল গুণিজন শোভিত, তার মহিমা শুন * * * শ্রীশ্রীবিশ্বমল্লো নৃপতী ··· শ্রীশ্রীজয়বিশ্বমল্লদেবস্য সভাকে মহিমা শুন *** শ্রীভক্তপত্তননগরে বিদ্যাবিলাপ নাটক প্রবর্ত্ত হৈলো, তা দেখি নিমিত্ত আন্মে জাবো।"

ত্রিভুবন বা ত্রৈলোক্যমল্লের সময়ে রচিত এক নাটকের কয়েক পত্র আমি দেখেছি। তা'তে নাটকের নামের উল্লেখ পাই নাই। তবে কৃষ্ণচরিত্র নিয়েই এ নাটক রচনা হয়েছিল। রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা ছাড়া সুধু নাটকের গানগুলিই লিখিত রয়েছে। গদ্যাংশ লেখা নাই। তার প্রধান কারণ, অভিনেতাদের সুধু গানগুলিই মুখস্থ রাখতে হত। গদ্যাংশ অভিনয়ের সময় মুখে মুখে তৈরী হত। নেপালে যত নাটক পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশ পুথিতেই সুধু নাটকের গানগুলি পাওয়া যায়। অবশ্য এ নাটকগুলিও ছিল সঙ্গীতবহুল—এক জাতীয় গীতিনাট্য। ত্রৈলোক্যমল্লের সময়ে রচিত এই কৃষ্ণচরিত্র-সম্বন্ধীয় নাটকের ভিতরে যে সব গান আছে, তার ভণিতায় কবি রামচন্দ্র ও বীরনারায়ণ নামের উল্লেখ পাই। উভয়েই হয় ত একই ব্যক্তি। এই কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। কারণ, তিনি জয়দেবের একটী পদ "শ্রিত-কমলাকুচমণ্ডল—ধৃতকুণ্ডল এ।" ইত্যাদি সম্পূর্ণ তুলে দিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের গানগুলি বিদ্যাপতির মৈথিলীতেই রচিত। এ গানগুলির দুই একটী অতি উচ্চ কবিত্বের নিদর্শন। যথা,—

কমল নয়ন মোহি বিসারল
সুন মধুরিকা সখি।
বসন্ত দারুণ, কাল গমাউব
কৈসেন জীবন রাখি।
দক্ষিণ পবন, মেঘ সুধাকর
ভেল সভ কিছু আনি।
চন্দন শীতল, বোলিলে গাবলু
রেণু উড়ে লহ লাগি।
বেদনিহে হরি বিনু বড় হয় দুখ।
চরণ কমল যদি ছাড়ল তা দিন গয়ল সুখ।
সকল রয়নি, জাগি গমাবলি
ন ছাড়ে নীর নয়ান।
অবশ্য আবত হরি মহাগুণী
বীরনারায়ণ ভান।

বিরহ বর্ণনা করতে একই কবি পুনরায় বলছেন,—

সঘন বরিসে মেহা
সুমরি সুবন্ধু মহা।
জীব চুটুপুটু নীদ ন আবে
বিরহ দগধ দেহা ॥
মন পংক্ষি হয়া জাবো
জাহা গিয়া পায়িবো।
হাতে ধরিয়া পায় পড়িয়া
গলা তুলিয়া লয়িবো ॥

চন্দন চিরণ ভাবে
কুসুম সাজ (?) সোহাবে।
অঙ্গ মোরি মোরি আঙ্গন ঠাকি
মন চৌদিক ধাবে।

ত্রৈলোক্যমল্লের পরবর্ত্তী রাজা জগজ্জ্যোতির্ম্মল্ল নিজে বিদ্বান্ ও নাট্যকার ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (১৬১৭-১৬৩৩ খৃঃ অঃ)। সঙ্গীতশাস্ত্রের তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বহু চেষ্টায় সুদূর দাক্ষিণাত্য হতে তিনি "সঙ্গীতচন্দ্র" নামক এক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়ে আনান। সঙ্গীতচন্দ্র সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ। মিথিলার পণ্ডিত বংশমণি ওঝার সাহায্যে জগজ্জ্যোতি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ও নেওয়ারী ভাষায় সঙ্গীতভাস্কর নামক এক টীকা লেখেন। এই টীকা এখনও নেপালের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। জগজ্জ্যোতির অধীত শাস্ত্রের মধ্যে কামশাস্ত্রও বাদ যায় নাই। তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিত পদ্মশ্রীজ্ঞান-প্রণীত নাগরকসর্ব্বস্ব অতি যত্নের সহিত পাঠ করেন ও তার এক ভাষ্য লেখেন। পদ্মশ্রীজ্ঞান এই শাস্ত্র বাসুদেব নামক এক ব্রাহ্মণের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। অধ্যয়ন শেষ করে জগজ্জ্যোতি নিজে সুকুমার সাহিত্যচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রণীত প্রথম নাটক হচ্ছে মুদিতকুবলয়াশ্ব। এই নাটক ১৬২৮ খৃঃ অব্দে প্রণীত হয়েছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই নাটকের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন। তার কারণ, এই নাটকে মল্লদের রাজপরম্পরার সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। মুদিতকুবলয়াশ্ব সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে লেখা নয়, ইহা অনেকটা গীতিনাট্য।—পুথিতে সুধু গানগুলি আছে। গদ্যাংশ অভিনেতারা মুখে মুখে তৈরী করতেন। এ নাটকের ভাষা পুরাণ মৈথিলী ধাঁচের। ১৬২৯ খৃঃ অব্দে জগজ্জ্যোতি হরগৌরীবিবাহ নামক আর এক নাটক লেখেন। ইহাও গীতিনাট্য। জগজ্জ্যোতির রচিত কুঞ্জবিহার নাটক নামক আর এক নাটক আমি দেখেছি। এ নাটকও বোধ হয়, প্রায় ঐ সময়েই রচিত হয়েছিল। এই নাটক কৃষ্ণ, রাধা ও গোপীদিগের লীলা নিয়ে রচিত। এর ভাষার পরিচয় একটী গান থেকেই আপনারা পাবেন— সূত্রধার বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেলেন,—

কুঞ্জ বিহার হরি ছাজরে,
গোপী সবে হরসিত আজরে।

অমনি রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে প্রবেশ করে গাইলেন,—

জাহি বহ জমুনাতীর, শীতল সুরহি সমীর।
নবদলে তরুঅরে সোহ, মধুকরধুনি সব মোহ।
তাহি বিদিরা বন মাঝ, হমর হৃদয় গুণে বাঝ।
তাহা গএ করিএ বিলাস জাঞা পহু পুরাবএ আস।
নৃপ জগজ্জ্যোতিমল্লবাণী, মোর গতি একে ভবানী।

তার পর ষড়্ঋতুর বর্ণনা, গোপীদের উক্তি, রাধিকার উক্তি ইত্যাদি।

জগজ্জ্যোতির পর রাজা জগৎপ্রকাশ মল্লের রচনাও কিছু কিছু পাওয়া যায়। এঁর রাজত্বকাল হ'ল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজা প্রতাপমল্ল এই সময়েই কাটমণ্ডুতে

রাজত্ব করছিলেন। তিনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জগৎপ্রকাশের রচিত ভবানীস্তব ১৬৬২ খৃঃ অঃ এক শিলালেখতে পাওয়া যায়। ১৬৬৭ খৃঃ অঃ তিনি গরুড়ধ্বজ বা নারায়ণের এক স্তব রচনা করেন। জগৎপ্রকাশের রচিত মলয়গন্ধিনী নামক নাটক আমি দেখেছি। এ নাটক অসম্পূর্ণ এবং পুষ্পিকা নাই। কিন্তু ইহা যে জগৎপ্রকাশের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নান্দীতে আছে,—"জগতপ্রকাশ ভনে নাটক নাথে" এবং সূত্রধারও বল্‌ছে,— "শ্রীশ্রীজয়জগৎপ্রকাশমল্লক আজ্ঞা ভেলচ্ছ…মলয়গন্ধিনী নাটক অভিনয় করু।" সূত্রধার আরও বল্‌ছে,—মহারাজশ্রীশ্রীনিবাস মল্লের দেবী মহোৎসব উপলক্ষে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। মহারাজ শ্রীনিবাস মল্ল ভাতগাঁওএর রাজা। ইনি কিছু দিন জগৎপ্রকাশের সহিত মিত্রতা রক্ষা করেন। কিন্তু এই মিত্রতার সম্বন্ধ ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল এবং ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে শত্রুতায় পরিণত হয়েছিল। এই ক্ষণস্থায়ী মিত্রতার যুগেই নাটকখানি লেখা হয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। জগৎপ্রকাশ রাজবর্ণনায় নিজেই তাঁর যশ বর্ণনা করছেন,—

চৌখণ্ড নরপতি তোহর বখন।
ত্রিভূবন মহীপতি সম নহি আন॥
নিরমলমতি তুঅ গাঁগ (?) জলধর
গল গজরাজ মোতি সুন্দর হার।
চৌষঠি কলাপর সরূপহি কাম।
শরদেক শশীমুখ বড় অভিরাম।

শিরি নিবাস ভূপতি, শরণ লেলো জগতপ্রকাশমতি। তাহ সুখ দেলা।

রাজবর্ণনার পরই সূত্রধার পুনরায় বল্‌ছে,—"হে প্রিয়ে এহেন রাজা শ্রীশ্রীশ্রীনিবাসমল্ল। উহ্নিক জশবর্ণনা ভক্তাপুরক রাজা শ্রীশ্রীজগতপ্রকাশমল্ল সতত করথি।" জগৎপ্রকাশের রচিত আর এক নাটক পাওয়া যায়। এ নাটকের নাম মদনচরিত নাটক। সংবৎ ৭৯০, ১৬৭০ খ্রীঃ অব্দে লেখা এই নাটকের এক পুথি আমি দেখেছি। তার অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব্বে এই নাটক রচিত হয়েছিল। কারণ, ১৬৬৩ খ্রীঃ অঃ জগৎপ্রকাশের পুত্রকে রাজসিংহাসনে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই নাটকের পুষ্পিকা থেকেই জানা যায় যে, জগৎপ্রকাশ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র উগ্রমল্লের উপনয়নের সময় এই নাটক লিখেছিলেন ও অভিনয় করিয়েছিলেন। "ইতি শ্রীশ্রীজয়জগৎপ্রকাশমল্লকৃতং কনিষ্ঠপুত্রশ্রীশ্রীউগ্রমল্লস্য উপনয়নস্যার্থে মদন [চরিত্র]নাটকং সমাপ্তং।" এ নাটকের ভাষাও পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকের ভাষার অনুরূপ।

"সূত্রধর বল্‌ছে,—হে প্রিয়ে এতয় আও।

নটী—হে নাথ হমর প্রণাম। কী আজ্ঞা করৈচ্ছিঅ।

সূত্র—হে প্রিয়ে শ্রীশ্রীজয়জগতপ্রকাশমল্লদেবক জ্যেষ্ঠরাজকুমার শ্রীশ্রীজয়জিতামিত্রমল্লদেবক আজ্ঞা ভেল আছ।"

গানের ভাষা আবার একটু অন্যরূপ,—

"অথির কলেবর, কমলপাতক জলতুলে।
ভবন কনকজন রজত আদি জপ থির নহি রহ সব জনে,
সুত মিত সর ধন সুখদুখসরি অথির জানর মনে।"

জগৎপ্রকাশের রচিত আর কোন নাটক আমি দেখি নাই। তবে তাঁর পুত্র রাজা জিতামিত্রমল্লদেবের রচিত তিনখানি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জিতামিত্রের রচিত অশ্বমেধ নাটকের উল্লেখ করেছেন। নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে এই নাটকের কোন পুথি আমি দেখি নাই। কিন্তু জিতামিত্রের আর দুইখানি নাটকের পুথি আছে। এক নাটক হচ্ছে মদালসা হরণ নাটক। এর পুথি সম্বৎ ৮০৭ = ১৬৮৭ খৃঃ অব্দে লেখা। এই পুথি যে মৌলিক পুথি, তা লেখার ধরণ দেখ্‌লে মনে হয়। তা ছাড়া প্রতি গানের পাশে সুরের উল্লেখ আছেই, তালের উল্লেখও আছে। ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকের ভাষা থেকে বিভিন্ন নয়।

প্রথম পৃষ্ঠায়ই,— বিমল বহয় শির সুরসরিধার
নাচত মগন শশিশেখরা
সুমতি জিতামিত্র কহ নৃপ ঈশ
দেখু সদাশিব অভয়বরা।

অন্য এক স্থানে কুবলয়াশ্ব ইন্দুমুখীকে বল্‌ছেন,—

প্রিয় শুন ইন্দুমুখী তেজ তোহে মান,
তোরিত অধরমধু দেহ রতিদান।
তুঅ সম সীমন্তিনী ন দেখল আন
দরশনে ভেল মোর থাকিতে পরাণ।

এই নাটকের একটা বিশেষত্ব আছে। প্রতি অভিনেতাকে যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, তা নেওয়ারী ভাষায় লিখিত। প্রতি গানের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম গানকে বলা হয়েছে মেপু১, দ্বিতীয়কে মেপু২ ইত্যাদি। মেপু নেওয়ারী কথা—অর্থ, গান। জিতামিত্রের আর একখানি নাটক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ নাটকের নাম গোপীচন্দ্র নাটক। এই নাটকের দু'খানি পুথি আমি দেখেছি। একখানি ১৬৯০ (সম্বৎ ৮১০) এবং অন্যখানি ১৭১২ (৮৩২ সম্বৎ) খ্রীঃ অঃ লেখা। ১৬৯০ খৃঃ অঃ জিতামিত্র রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোপীচন্দ্র নাটক এর কিছু পূর্ব্বেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। গোপীচন্দ্র নাটক বাঙ্গলাদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নিয়ে রচিত। এই নাটকের রাজা গোপীচন্দ্র, রাণী উদুনা ও পদুনা এবং ময়নামতীর ভূমিকা রয়েছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নাটকগুলির ন্যায় এ নাটক সঙ্গীতবহুল নয়। গদ্যাংশ বেশ বিস্তৃত। ভাষা যে প্রাচীন বাঙ্গলা, তা'তে সন্দেহ নাই। একটা উদাহরণ দিলেই আপনারা বিচার করতে পারবেন।

কোটোয়াল বল্‌ছেন,—"বঙ্গদেশের অধিপতি মহারাজা গোপীচন্দ্র তার কোটবার কলিঙ্গা নাম অমী আছে।

ভাগি খোর। ভাল কহিলেন। অহে খেতু মহাপাত্র কলিঙ্গা কোটবার আমার এক বচন অবধান করো।

খেতু। সর্ব্বথা।

ভা। সমস্ত লোক বধিয়া দাড়িয়া লুটিয়া আনিয়া এমন এমন কর্ম্ম করিয়া সুখভোগ করিয়া থাকিলো আমার সমান ভাগীখোর নাম আর না আছে।

খে। সত্য কহিলেন। অহে কলিঙ্গ কোটবার তুমার হমার রাজা গোপীচন্দ্র আছে তার দর্শন করিতে জায়বো চলো।"

জিতামিত্রের পর রাজা ভূপতীন্দ্রমল্ল ভাতগাঁওএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৯৫ থেকে ১৭২২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ভূপতীন্দ্রের রচিত অনেক গান ও নাটক পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে মনে হয়, ভূপতীন্দ্র খুব বিদ্বান্ ছিলেন, এবং সুকুমার সাহিত্যে তাঁর সত্য অধিকারই ছিল। তাঁর রচনার মধ্যে উঁচুদরের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর রচিত নাটকের কথা তুলবার আগে তাঁর গানগুলির কথা বলা দরকার। নেপালে রাজকীয় পুস্তকালয়ে ভাষাসঙ্গীত নামক এক পুথি রক্ষিত আছে। এ পুথি অসম্পূর্ণ, কিন্তু যতটা আছে, তা'তে ৮১টী গান পাওয়া যায়। সবগুলির ভণিতাতেই ভূপতীন্দ্রমল্লের নাম। সেগুলি যে তাঁরই রচনা, তা'তে সন্দেহ নাই। প্রতি গানের সঙ্গেই সুর ও তালের উল্লেখ আছে। প্রায় ৪০টী বিভিন্ন সুর উল্লিখিত হয়েছে। তার ভিতর দুই একটী সুর স্থানীয় বলে মনে হয়। গানগুলির ভাষা মৈথিলীর অনুরূপ। এর দুই একটা আপনাদের উপহার দেব।

ভক্ত ভূপতীন্দ্রমল্ল গাইছেন,—

হে দেবি শরণ রাখ ভবানি।
মন বচ করম করও মান কিছু
সে সবেতু আপদ জানি,
হমে অতি দিনখীন তুঅ সেবা
রাখ হরি যজন ঠানি।
অভিনয় মোর অপরাধ সম্ভব
মন জনু রাখহ আনি,
অওর ইতর জন জগ জত সে সবে
গুণ রসমক সে বাণি।
তুঅ পদকমল ভমোর মোর মানস
জনমে জনমে রহো মানি।
ভূপতীন্দ্র নৃপ এহো রস গাবে
জয় গীরিজাপতি রানি।

ভূপতীন্দ্রমল্ল শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণনা করছেন,—

কি মাধব ন তেজহ অবলাঅ আমি। ধ্রু
শরদ যামিনী হমে হরিলো হে চৌদিশে
দেখি শশি দাহ পরাণ।
নাহ অপনহি কট মনে ভাবিয়
মলয় পবন হন চান॥
মধুকর ভমি ভমি বিপিন কুসুম রমি
ধুরি পিবয় কর রাব।

যুবতি হৃদয় দল, প[র]ম কঠিন মন,
পাহ ন তহ অতি ভাব।
সরসিজ সরবরে ভ্রম ভয় পিকধুনি
সুনি জীব কাঁপয় মোর।
ভবন আসন ঘন, ভল ন শভাবয়
খনে খনে চিতি থিতি মোর।
কবন গুণে পরবস, রয়নি গমাওল
আতুরে অথির গেয়ান,
পতীন্দ্র নরপতি ভন সুন মানিনি
রতিরস হোয়ত নিধান॥

ভূপতীন্দ্র বহু নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে মাধবানল, রুক্মিণীপরিণয় এবং আরও দুইখানি নাটকের অসম্পূর্ণ পুথি নেপালের রাজপুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। ননী বাবু ভূপতীন্দ্রের আরও দুইখানি নাটক ছেপেছেন—বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারত। ননী বাবু বলেছেন, বিদ্যাবিলাপ কাশীনাথ রচিত এবং মহাভারত নাটক কৃষ্ণদেবকৃত। কিন্তু তিনি ভুল করেছেন। এই ভুলের কারণ, বিদ্যাবিলাপ নাটকের এক স্থানে কাশীনাথের নাম এবং মহাভারত নাটকের এক স্থানে কৃষ্ণদেবের নাম আছে। কিন্তু বিদ্যাবিলাপের ও মহাভারত নাটকের সব গানগুলির ভণিতায় ভূপতীন্দ্র মল্লের নাম রয়েছে। সুধু রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা শীর্ষক যে দুটী গান আছে, তাতে কবি কাশীনাথ ও কৃষ্ণদেবের নাম রয়েছে। তার একমাত্র কারণ যে, নিজের এবং নিজের রাজধানীর গুণগ্রাম নিজে বর্ণনা করাটা রাজা অশোভনীয় হবে বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং ননী বাবুর প্রকাশিত বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারত নাটক যে ভূপতীন্দ্র মল্লের লেখা, তাতে সন্দেহ নাই। ভূপতীন্দ্রের লেখা আর দু'খানি নাটকের অসম্পূর্ণ পুথির কথা পূর্ব্বে বলেছি। এই পুথির শেষ পত্র না থাকায় নাটকের নামের কোন খোঁজ পাই নাই। এই দুইখানি নাটকের প্রথমখানি সুমতি জিতামিত্রের জীবদ্দশায়ই লেখা। খুব সম্ভব, ১৬৯৫ খৃঃ অঃ (৮১৫ সম্বৎ)। কারণ, রাজবর্ণনা করতে গিয়ে ভূপতীন্দ্র জিতামিত্রেরই গুণ বর্ণনা করেছেন। এই নাটকের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে যে ক'জনের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন বজ্রবাহু, ঋষভ যোগী, পদ্মা, চিত্রাঙ্গদ। এই নাটকের ভাষা অন্যান্য নাটকের ভাবার অনুরূপ। উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন,—

তোহে প্রভু নাগর সুগুণ আগর
রূপে মদন সমান।
সোরহ চউগুণ কলাক আগর
রসিক গুণগণ জানহে।
নারি অলপমতি আন নাহি গতি
কামে দহত শরীর

জনম সফল কর আজ পহু মোর
শ্রীভূপতীন্দ্র ভণ বীরহে।

এই সঙ্গে যে আর একখানা নাটক আছে, তার মাত্র দুইখানি পাতা আমি দেখেছি। নাটকে প্রভু জিতামিত্র মল্লের নাম আছে। তাতেই মনে হয়, পিতার জীবদ্দশায়ই ভূপতীন্দ্র এই নাটক লিখতে সুরু করেন। নাটকের বিষয় হচ্ছে ষড়্দর্শন। ভাষা হচ্ছে নেওয়ারী। নেওয়ারী ভাষায় বোধ হয়, নাটক লিখবার চেষ্টা এই প্রথম হয়েছিল। কিন্তু ভূপতীন্দ্র এ ভাষায় নাটক লিখতে আর দ্বিতীয় চেষ্টা করেন নাই। কারণ, এ চেষ্টায় তিনি সফলকাম হন নাই।

মাধবানল নাটক ভূপতীন্দ্র ১৭০৪ খৃঃ অব্দে (৮২৪ সম্বৎ) রচনা করেন। ননী বাবু যে মাধবানলকামকন্দলা নামক নাটক ছেপেছেন, তা পরবর্ত্তী কালে রণজিৎ মল্ল রচনা করেন। ভূপতীন্দ্রের মাধবানল অন্যান্য নাটকের ভাষাতেই রচিত। অর্থাৎ গদ্যাংশ পুরাণ বাঙ্গলার ধাঁচে এবং পদ্যাংশ মৈথিলীর ধাঁচে লেখা। এই নাটকের রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা কবি কৃষ্ণদেবের লিখিত। ননী বাবুর প্রকাশিত মহাভারত নাটকেও এই কবি কৃষ্ণদেবের নাম পাওয়া যায়। ভূপতীন্দ্রের আর একখানি নাটক রুক্মিণী পরিণয়। এ নাটকের ভাষাও অন্যান্য নাটকের ভাষার অনুরূপ। যথা,—

"জগত জলধিতট তরি নাহি হোয়ি
শিবক ভজন বিনু অওর ন কোয়ি॥"

ভূপতীন্দ্রের আর দুখানি নাটক বিদ্যাবিলাপ ও মহাভারত, যা ননী বাবু প্রকাশ করেছেন, তার সম্বন্ধে বিশেষ করে আর বল্‌বার প্রয়োজন নাই। মোট কথা, ভূপতীন্দ্রমল্লের রচনাগুলি দেখলে মনে হয়, তিনি সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত গানের আজকালও চল্‌তি আছে। গানগুলির দুই একটীতে এমন মধুর শব্দবিন্যাস হয়েছে যে, মনে হয়, সেগুলির আজকালও আদর হতে পারে।

নৃপতীন্দ্রের বংশধর রণজিৎ মল্ল ১৭২২ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বেই ভাতগাঁওএর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ভাতগাঁওএর মল্লবংশের শেষ রাজা, কিন্তু সুকুমার সাহিত্য চর্চ্চায় তিনি তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের চেয়ে কোন হিসাবে কম ছিলেন না। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তিনি বহু নাটক রচনা করেন। এ সব নাটকের কিছু কিছু খোঁজ পাওয়া যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর অধিকার ছিল এবং তাঁর গানগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট পদাবলীও মেলে।

ননীবাবুর প্রকাশিত রামচরিত্র ও মাধবকামকন্দলা নাটক রণজিৎ মল্লের রচিত। ননীবাবু এ দুখানিকে কবি গণেশ ও ধনপতির রচিত মনে করেছেন। তাঁর এই ভুলের কারণ, এই দুই নাটকের রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনার ভণিতায় গণেশ ও ধনপতির নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এই দু'টী পদ বাদ দিলে সমস্ত পদেই নৃপ রণজিৎ মল্লের নাম। সুতরাং এই দুই নাটক যে রণজিৎ মল্লের লেখা, তাতে সন্দেহ নাই। এই দুই নাটকের ভাষায় মৈথিলীর চেয়ে বাংলার ধাঁচই বেশী স্পষ্ট দেখা যায়। যেমন রামচরিত্র নাটকে লোমপাদ বল্‌ছেন—

"লোমপাদ নৃপ আমি নটনভবনে
দিলাম প্রবেশ অবে সহ পরিজনে।
ললিতাঙ্গী প্রিয়া মোর, শান্তা নাম কন্যা
কনকমঞ্জরী সখি গুণগণধন্যা।
বর্ণন করিলেন রণজিত ভূপ।
নৃপতিমুকুটমণি-মনসি[জ] রূপ॥

রণজিৎ মল্লের রচিত আমি আরও ছ'খানি নাটক দেখেছি। উষা-হরণ নাটক, অন্ধকাসুর বধোপাখ্যান নাটক, কৃষ্ণচরিত্র নাটক, মদনচরিত-কথা নাটক, কোলাসুর বধোপাখ্যান নাটক, এবং রামায়ণ নাটক। এ সব নাটকের ভাষা অন্য নাটকের অনুরূপ। এ ছাড়া নেওয়ারী ভাষায় রচিত একখানি নাটকও আমি পেয়েছি। এ নাটক হচ্ছে গোরখোপাখ্যান কথা, গোরখনাথের কীর্ত্তি-কলাপ নিয়ে রচিত। নেওয়ারী-ভাষায় লিখিত হলেও এ নাটক অন্যান্য নাটকের অনুকরণে রচিত।

উষা-হরণ নাটক, ৮৭৪ সম্বৎ বা ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে রচিত হয়েছিল। এই নাটক নয় অঙ্কে শেষ এবং এর অভিনয় যে এক দিনে শেষ হয়েছিল, তা' মনে হয় না। রণজিৎ মল্ল নিজের ইষ্টদেবতার মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করবার সময় এই নাটক অভিনয় করিয়েছিলেন। সূত্রধারের কথায় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সূত্রধার সংস্কৃতে বলছেন,—

"শ্রীশ্রীজয়রণজিন্মল্লদেবমহারাজাধিরাজেন শ্রী৩ স্বেষ্টদেবতাপ্রীত্যুত্তর তস্যা দেবালয়াৎ বহির্দ্বারজীর্ণোদ্ধারতাম্রোপরি সুবর্ণলেপিততোরণচ্ছদি খড়্গাকলশছত্রাবরোহণকোট্যাহুতি-যজ্ঞার্থং উষাহরণনামকনাটকমভিনেতুমহমাজ্ঞপ্তোঽস্মি।"

এ কোন্ দেবালয়, তা' ঠিক বলা যায় না। তবে ভাতগাঁওএর রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন ভবানীমন্দিরের সুবর্ণদ্বারের কথাই মনে হয়। অন্ধকাসুরবধোপাখ্যান ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে (৮৮৮ সম্বৎ) অভিনীত হয়েছিল। এ নাটকও ইষ্টদেবের প্রীতিকামনায় অভিনয় করা হয়েছিল। কারণ, সূত্রধার বলছেন,—"শ্রীজয়রণজিন্মল্লদেবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজেন শ্রীশ্রীস্বেষ্টদেবতাপ্রীত্যুত্তরপূর্ব্বসঙ্কল্পিত অন্ধকাসুরবধোপাখ্যাননাম নাটকমভিনেতুমহমাজ্ঞপ্তোঽস্মি।" কৃষ্ণচরিত্র নাটক ইষ্টদেবতার মন্দিরে বৃহৎ ঘণ্টা নিবেদনের সময় ১৭৩৮ খৃঃ অঃ (৮৫৯ সম্বৎ) অভিনয় করা হয়েছিল ("ইষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া বৃহদ্ঘণ্টানিবেদনার্থং" ইত্যাদি)। মদনচরিত-কথা নাটকের পুথি অসম্পূর্ণ। জগৎপ্রকাশ মল্লের রচিত মদনচরিত্র নাটকের অনুকরণেই বোধ হয়, এ নাটক লেখা হয়েছিল। কোলাসুরবধোপাখ্যান নাটক ইষ্টদেবতা ভবানীকে নীলোৎপলমালা নিবেদনের সময় অভিনীত হয়েছিল (ইষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া নীলোৎপলশতপুষ্পমালালক্ষৈস্তস্যা চরণারবিন্দে পূজাসঙ্গতার্থং)। রামায়ণ নাটক বিপুল। ৪৩ অঙ্কে সম্পূর্ণ। সমস্ত বাল্মীকি রামায়ণকে নাটকাকারে লেখা হয়েছে। এ নাটকের অভিনয় যে দীর্ঘকাল ধরে হয়েছিল, তা'তে সন্দেহ নাই। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে (৮৮৫ সম্বতে) লিখিত এই নাটকের এক পুথি দেখেছি। কবি কাশীনাথ রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা করেছেন। কবি কাশীনাথের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। ইনি ভূপতীন্দ্রমল্লের সময় থেকেই কবি পদবী পেয়েছিলেন।

পূর্ব্বেই বলেছি, রণজিৎ মল্লের ভাষা বাংলার একটু বেশী কাছাকাছি। দুই একটী উদাহরণ দিলেই আপনারা বুঝবেন। –

অন্ধকাসুরবধোপাখ্যানে রাণী শশিরেখা বল্‌ছেন,—

শশি। হে প্রাণনাথ হমরো বিনতী শুন।

অন্ধ। প্রিয়তমা কহু।

ভীমা (মন্ত্রী)। হে দানবাধিপ হমরো বিনতী অবধান করু।

অন্ধ। ভীমানন্দ কহু...

অন্ধ।... শশিরেখা প্রিয়ে চলু আপ সদনে।
কনক ঘরে রহি বিলাস মদনে॥"

রামচরিত্র নাটকে বিষ্ণু বল্‌ছেন,—

জলধিসুতা মোর প্রিয়তমা রাম।
লয় পরবেশ দেব নটবর ধাম।
তীনি ভুবন নহি হমর সমান।
ভন জয় রণজিত নৃপ গুণমান।

আবার ব্রজবুলীর ঢঙ্গে,—

হরষে বৃন্দাবনে জায় দেখব।
কোকিলধুনি শুনি বেণু বজাব।
মিলত গোপিনী সবে আয়।

রামচরিত্রে— "রমণির স্বামী তুমি রসের নিধান
কি করিব গোচর গুণের নিধান।
আমি তো তুমার দাসি করো সমাধান।
জীবন ধন তুমি করো সমাধান
জীবন ধন তুমি কি জানে বিধান।"

মাধবানলকামকন্দলায় একটু মৈথিলী ঢঙ্গ বেশী,—

অবে নাহু চলু পদমাকরহী
শোভা দেখু পিয় সখি তীর রাহি।
জায়ব উলাস কয় গমনে জিনেয় করী।
ত্বরিতহি আওব পানিওব ভরী॥

এ পর্য্যন্ত আমি ভাতগাঁওয়ের রাজাদের সাহিত্য-চর্চ্চা নিয়ে আলোচনা করলাম। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই অন্যূন দু' শ বছর ধরে ভাতগাঁ সাহিত্যচর্চ্চার একটা বড় কেন্দ্র হয়েছিল এবং এ চর্চ্চার মূলে ছিলেন ভাতগাঁওয়ের মল্লরাজারা স্বয়ং। কিন্তু এই সময়ে নেপাল উপত্যকায় অন্যান্য স্থানেও যে কিছু সাহিত্য-চর্চ্চা চল্‌ছিল, তার প্রমাণ আছে। কাটমণ্ডুর মল্লরাজারাও সুকুমার সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। অবশ্য ভাতগাঁওএর রাজাদের মত নিপুণ কবি তাঁরা কেউ ছিলেন না। তবুও তাঁদের রচনার উল্লেখ না করলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কাটমণ্ডুর রাজা প্রতাপমল্ল ভূপতীন্দ্রমল্লের সমসাময়িক। তাঁর রাজত্বকাল ১৬৩৯ হইতে ১৬৮৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং নিজেও কিছু বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি কবিতা রচনার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর রচিত কয়েকটি সংস্কৃত স্তোত্র এখনও পাওয়া যায়। সেগুলি অবশ্য উচুদরের কবিতা নয়। প্রতাপমল্লের সভায় বংশমণি নামক এক কবি ছিলেন। ১৬৫৫ খৃঃ অঃ রাজা প্রতাপমল্ল তুলাপুরুষদান ব্রত করেন। সেই উপলক্ষে বংশমণির রচিত গীতদিগম্বর নামক নাটক অভিনীত হয়। গীতদিগম্বর জয়দেবের গীত-গোবিন্দের অনুকরণে রচিত। এই নাটকের মধ্যে একটী পদ তুলসীদাসের হিন্দীর অনুরূপ ভাষায় লিখিত।

প্রতাপমল্লের পৌত্র ভূপালেন্দ্রমল্লের রচিত নলচরিত্রনাটকের এক পুথি রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। ভূপালেন্দ্র ১৬৮২ খ্রীঃ অঃ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়েই এই নাটক অভিনীত হয়েছিল মনে হয়। এ নাটকের ভাষা মৈথিলী ঢংএর।

তেরো বদন মাতো শশধর
মেরো নয়ন চকোরা।
দেখত মোহএ অধিক সোহএ
কহহু বচন মেরা।
দেখিতে সুন্দর চপল লোচন
কাজর শোভারী।
মনো পঙ্কজ ভমর সোহত
পবন সে লঘুচারী।
পার্থিবেন্দ্রসুত নৃপ ভূপালেন্দ্র কহত
এহো বিচারী।
উচিত সময় মিলহুঁ নাগরি
পতি সে মতি সমারী।

কাটমণ্ডুর শেষ রাজা জগজ্জয়মল্ল রণজিৎমল্লের সমসাময়িক। জগজ্জয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাটমণ্ডুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। জগজ্জয় পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে এক যাত্রার আয়োজন করেন। এই যাত্রায় নানা স্থান থেকে পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা এসেছিলেন। এই যাত্রায় অভিনবপ্রবোধচন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনীত হয়। এই নাটকের এক অসম্পূর্ণ পুথি দেখেছি। কিন্তু রচয়িতায় নামের কোন খোঁজ পাই নাই। এই নাটক সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুকরণেই লিখিত। সূত্রধার সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের উদ্দেশ্য জানাচ্ছেন,—

"...শ্রীশ্রীশ্রীযুতজগজ্জয়মল্লভট্টারকেন
নিখিলসুরাসুরমুকুটমণি-মঞ্জরীবিরাজিতচরণপঙ্কজস্য
সুরনদীসংশোভিতপিঙ্গলজটাভারভাস্বরস্য
দেবাধিদেবস্য শ্রী৩পশুপতিভট্টারকস্য যাত্রাপ্রসংগেন
দিগন্তবাসিনো বিবুধা বেদান্তিনস্তপস্বিনঃ সমাগতাঃ।

ইদানীং বয়মপি কৃতকৃত্যাঃ যতঃ—

হত্বা বলেন সমরে পরিপন্থিবর্গং
যজ্ঞং বিধায় বিবিধং বলিপূজনং চ।
প্রাপ্তোঽস্মি শৈলশিখরে সুখদং সুরাক্ষং
নাতঃপরং কিমপি মে করণীয়মস্তি॥
তদস্মৎকৃতমভিনবং প্রবোধচন্দ্রোদয়ং নাম
নাটকং অভিনেতব্যং ভবতেতি।"

যে ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে, তা'কে বাংলা ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না—

"ব্রহ্মা—অয়ি প্রিয়ে অমী এথায় বিশ্রাম করিবো।
মায়া—অহে পরব্রহ্ম আপনে এথায় অবশ্য বিশ্রাম করো।
ব্রহ্ম—অয়ি প্রিয়ে মায়া তুমি আমার মহিমা শুন।"

এইবার এই সব নাটকের সম্বন্ধে দু' একটী সাধারণ কথা বলেই আমার প্রবন্ধ শেষ করবো। এই সব নাটক যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে সংস্কৃত নাটক সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন নি। কারণ, নাটকগুলি অনেক স্থানে বহু অঙ্কে লেখা হ'ত। নাটকের প্রথমেই সংস্কৃতে নান্দী পাঠ হ'ত। তার পর সূত্রধারের প্রবেশ, সূত্রধারও সংস্কৃতে কথা বল্‌তেন। সূত্রধারের অষ্টমঙ্গলা ও পুষ্পাঞ্জলি-শ্লোক পাঠ করবার পর নটী প্রবেশ করতেন। নটী প্রাকৃত ভাষাতেই কথা কইতেন। এর পর কথিত ভাষাতে, কখনও কখনও সংস্কৃতেও রাজবর্ণনা ও দেশবর্ণনা হ'ত। এটাও সূত্রধার করতেন। নাটকের নায়ক-নায়িকারা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে প্রথমে নিজেদের পরিচয় দিতেন, সেটা কখনও সংস্কৃতে, কখনও কথিত ভাষায় হ'ত। এর পর অভিনয় চল্‌ত। অভিনয় কখনও একদিন, অনেক সময় বেশী দিন ধরেও চল্‌তো।

এইরূপ নাটক পুরাণ বাংলায় এখনও পাওয়া যায় নি। তবে বাংলা দেশে প্রাচীন যাত্রাও হয় ত এই ধরণের ছিল। আসামীয় ভাষায় শঙ্করদেবের লেখা এইরূপ একখানি নাটক পাওয়া গেছে। শঙ্করদেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। পারিজাতহরণ নামক তাঁর এক নাটক সম্প্রতি ছাপা হয়েছে। এ নাটক এক অঙ্কেই সম্পূর্ণ। এ নাটকেও গদ্যাংশের চেয়ে পদ্যাংশ বেশী। অভিনয় বেশীর ভাগই গানে চল্‌ছে। কিন্তু সূত্রধার মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোকে দেবতাদের বর্ণনা করছেন।

এই ধরণের নাটক খোঁজ করলে হয় ত আরও পাওয়া যাবে। এবং এরই ভিতর দিয়ে সংস্কৃত নাটক ও বর্ত্তমান যুগের যাত্রার মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হবে বলে আমার মনে হয়। সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের এই নাটকগুলি ঐতিহাসিকদের নিকট আদর পাবে আশা করি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী।

"নেপালে ভাষা-নাটক" সম্বন্ধে মন্তব্য

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁহার প্রবন্ধে ভাষা-সাহিত্যের একটী অজ্ঞাত পরিচ্ছেদ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে নেপালের ভাষা-নাটক সম্বন্ধে তিনি বহু নূতন তথ্য আমাদের দিয়াছেন; বিষয়-গৌরবে, এবং প্রথম বিচারপূর্ণ আলোচনা বলিয়া, তাঁহার প্রবন্ধটী মূল্যবান্। ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি, তবে দুই চারিটি বিষয়ে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব।

পৃষ্ঠা ১৭০—ননীগোপাল বাবুর "নেপালে বাঙ্গালা নাটক"-এ ভাষা সম্বন্ধে অভিমতের প্রতিবাদ কুমার শ্রীযুক্ত গঙ্গানন্দ সিংহ ইতিপূর্ব্বেই এশিয়াটিক্-সোসাইটী-অভ্-বেঙ্গল-এর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

মগধ ও গৌড় তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হইবার পূর্ব্বেই গৌড়ের সঙ্গে নেপালের যোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তাহা না হইলে পালবংশীয় রাজাদের সময়ের পুথি-পত্র নেপালে যাইত না। নেপালের শিল্প বহুশঃ গৌড়-মগধ শিল্পেরই রূপভেদ মাত্র।

পৃষ্ঠা ১৭১—জ্যোতিরীশ্বর কৃত বর্ণ-রত্নাকর। মৈথিল-ভাষার প্রাচীনতম পুস্তক, ইহার একমাত্র খণ্ডিত পুথি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীতে আছে। বইখানি কথকতার পুথি, নাট্য-শাস্ত্রের নহে। ইহার বিষয় ও ভাষা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া ১৯২৭ সালে প্রয়াগে Fourth All-India Oriental Conference-এ আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে (Proceedings of the 4th All-India Orintal Conference, Vol. II., Allahabad, 1928, পৃষ্ঠা ৫৫৩—৬২১)।

পৃষ্ঠা ১৭৬—গোপীচন্দ্র নাটক। Cecil Bendall কৃত Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library of Cambridge (1883) পুস্তকের পৃঃ ৮৩।৮৪তে সন্ধান পাইয়া, বিলাতে অবস্থানকালে ১৯২১ সালে কেম্ব্রিজে গিয়া এই নামে একখানি ভাষা-নাটক দেখি, এবং ইহা হইতে অনেকটা অংশ উদ্ধার করিয়া আনি। (এই নাটক সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৯২৩ সালে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম)। নাটকের ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু নেওয়ারী ধরণে লেখা বলিয়া বানান-বিভ্রাট প্রচুর। নেপালের অন্য ভাষা-নাটকে যেমন দেখা যায়, এটীতেও তেমনি পাত্র-পাত্রীর অভিনয় নির্দ্দেশ নেওয়ারী ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। কেম্ব্রিজে রক্ষিত এই গোপীচন্দ্র নাটকে কিন্তু জিতামিত্রমল্লের কোন উল্লেখ নাই;—দুই জায়গায় আছে (২ক ও ৬১ক পৃষ্ঠায়) ললিতাপাটনের রাজা সিদ্ধি নরহরি বা সিদ্ধি নৃসিংহের কথা। এই রাজার রাজত্বকাল আনুমানিক ১৬২০ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। একই বিষয়ে দুইখানি পৃথক্ নাটক হওয়া আশ্চর্য্য নহে, তবে মিলাইয়া দেখিতে হইবে। গোপীচাঁদ রাজার আখ্যায়িকার আলোচনায় নেপালের এই দুই নাটক হইতে নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে।

পৃষ্ঠা ১৮৩—নেপালে রচিত এই ধরণের ভাষা-নাটক ইউরোপের নানা পুস্তকালয়ে (ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে, এবং সম্ভবতঃ অন্যত্র) অন্ততঃ ১০।১২ খানি আছে, বেশীও হইতে পারে। ১৮৯১ সালে August Conrady 'হরিশ্চন্দ্রনৃত্যম্' নামে এই শ্রেণীর একটী নাটক প্রকাশ করেন, লাইপ্‌জিক্ নগর হইতে (Hariccandranrityam—ein altnepales. Tanzspiel, mit ein. grammat. Einleit)। ইহার গানগুলি মৈথিলে, গদ্য অংশ বাঙ্গালায়, এবং নির্দ্দেশবচন নেওয়ারীতে। কনরাডি সাহেব বাঙ্গালা ও মৈথিল অংশ দেবনাগরীতে ও নেওয়ারী অংশ রোমানে ছাপাইয়াছেন। বোধ হয়, এই শ্রেণীর নাটকের এই বইয়েই প্রথম আলোচনা হয়। ১৯২৩ সালে Josef Oster নামে একজন জারমান ভদ্রলোক কলোন Cologne (Koeln) নগরে এইরূপ নেপালী ভাষা-নাটকের আলোচনা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা সম্পাদ্যমান একখানি নাটকের পাণ্ডুলিপি আমি দেখিয়াছি—বইখানি এখনও বাহির হইয়াছে কি না, জানি না। এই নাটকখানি সিদ্ধ-নরসিংহের পুত্র শ্রীনিবাস মল্লের সভায় লেখা, নাটকখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত ললিত-কুবলয়াশ্ব-মদালসোপাখ্যান-শিবমহিমা-নাটকম্'। ইহারও গদ্য অংশ নেওয়ারী বাঙ্গালায় ও গানগুলি মৈথিলে লেখা।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

শব্দ-চয়ন *

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখ্‌তে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধ'রে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হ'ল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জ্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারতঃ ইংরেজীতে 'সিম্প্যাথি'-র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলা-তেও আমরা ব'লতে আরম্ভ করেছি—'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত, 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক্—সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়—যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথিটিক্'-এর কী তর্জ্জমা হ'তে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানু-ভূতিশীল', বা 'সহানুভূতিমান্'? ভাষায় যেন খাপ খায় না—সেই জন্যেই আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটা শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্চে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়—যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হ'লে সেই তারটা অনুকম্পিত ও অনুধ্বনিত হয়। এই ত 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই ত ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুস্কিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েচে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পার্‌ত যে, কানের এক সোনায় যদি মূর্দ্ধন্য ণ লাগ্‌ল, তবে অন্য শোনায় কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের রফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্দ্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েচে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জ্জন ক'রে 'সোনা' হ'ল, তখন মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েচেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা—এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা

---

* সন ১৩৩৬, ২৫শে মাঘ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধান-কর্ত্তা ছিলেন —সে দিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্দ্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয়নি।

কিছু কাল পূর্ব্বে যখন ভারতশাসনকর্ত্তারা 'ইণ্টার্‌ন্' সুরু ক'রলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হ'য়ে গেল —'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externmentকে কি ব'ল্‌তে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার ক'রলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা'। প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যা-লাভই হচ্চে শিক্ষার মূলে—তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্'। তথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবা-মাত্র বোঝা যায় জিনিসটা কি। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত'—কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পাল্‌সারি এডুকেশন'-এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা', 'কম্পাল্‌সারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি প্রতিবর্গে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজিতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতি-শব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হ'য়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয় ত তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'—যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি—'ওভারপপ্যুলেশন'—বিষয়টা আজ-কাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়; —সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট', 'নন্‌রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেবো কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান ক'রলে পাওয়া যায় 'আবাসিক', 'অনাবাসিক'। সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ করেছিলাম। যা সংগ্রহ ক'রতে পেরেচি, তা শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমারের প্ররোচনায় প্রকাশ করবার জন্য তাঁর হাতে অর্পণ ক'রলুম। অন্ততঃ এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাজে লাগ্‌বে ব'লে আমার বিশ্বাস।

অকর্ম্মান্বিত—unemployed

অক্ষিভিষক্—oculist

অঘটমান—incongruous, incoherent

অঙ্কূয়ৎ—moving tortuously—অঙ্কূয়ন্তী নদী

অঙ্গারিত—charred

অতিকথিত, অতিকৃত—exaggerated
অতিজীবন—survival
অতিদিষ্ট—overruled
অতিনেমিষ চক্ষু—staring eyes
অতিপরোক্ষ—far out of sight
অতিপ্রজন—over-population
অতিভৃত—well filled
অতিষ্ঠা—precedence
অতিষ্ঠাবান্—superior in standing
অতিসর্গ—act of parting with
অতিসর্গ দান করা—to bid any one farewell
অতিসর্পণ—to glide or creep over.
অতিসারিত—made to pass through
অতিস্রুত—that which has been flowing over
অত্যন্তগত—completely pertinent, always applicable
অত্যন্তীন—going far
অত্যূর্ম্মি—bubbling over
অর্থপদবী—path of advantage
অধঃখাত—undermined
অধিকর্ম্মা—superintendent
অধিজানু—on the knees
অধিবক্তা—advocate
অধিষ্ঠায়কবর্গ—governing body
অনপক্ষেপ্য—not to be rejected
অনপেক্ষিত—unexpected
অনাখ্য—impersonal
অনার্ত্তব—unseasonable
অনাপ্ত—unattained
অনাপ্য—unattainable
অনাবাসিক—non-resident
অনাবেদিত—not notified
অনায়ক—having no leader
অনায়তন—groundless
অনায়ুষ্য—fatal to long life
অনারত—without interruption

অনালম্ব—unsupported
অনাস্থান—having no basis or fulcrum
অনিকামতঃ—involuntarily
অনিজক— not one's own
অনিন—feeble, inane
অনির্বিদ—undesponding
অনিভৃত— not private, public
অনিষ্ঠা—unsteadiness
অনীহা— apathy
অনুকম্পায়ী—condoling
অনুকল্প—alternative
অনুকাঙ্ক্ষা—longing
অনুকাল—opportune
অনুকীর্ণ— crammed
অনুকীর্ত্তন—proclaiming, publishing
অনুক্রকচ—serrated.
অনুগামুক—habitually following
অনুজ্ঞা—permission
অনুজ্ঞাত—allowed
অনুতুন্ন—muffled (sound)
অনুদত্ত—remitted
অনুদেশ—reference to something prior
অনুপর্ব্বত—promontory
অনুপার্শ্ব—lateral
অনুযাত্র—retinue.
অনুরথ্যা—side-road
অনুলাপ—repetition
অনুষঙ্গ—association
অন্তশ্ছেদ—intercept
অন্তর্জাত—inborn
অন্তঃপাতিত—inserted
অন্তর্ভৌম—subterranean
অন্তম—intimate
অন্তর্য্য—interior
অন্তরায়ণ—internment

অন্তরীয়--under-garment

অপক্ষেপ--reject

অপচেতা--spendthrift

অপণ্য—not for sale, unsalable

অপপাঠ—wrong reading

অপম—the most distant

অপলিখন—to scrape off

অপশব্দ—vulgar speech

অপহাস—a mocking laugh

অপাটব—awkwardness

অপ্রতিষ্ঠ—unstable

অপ্রভ—obscure

অপ্সুদীক্ষা—baptism

অবঘোষণা—announcement

অবশ্চ্যুত—trickled down

অবর্জ্জনীয়—inevitable

অবধূলন—scattering over

অবমতি--contempt

অবমন্তব্য—contemptible

অবরপুরুষ— descendant

অবরার্দ্ধ— the least part

অবস্থাপন— exposing goods for sale

অবিতর্কিত—unforeseen

অবুদ্ধিপূর্ব্ব—not preceded by intelligence

অবেক্ষা—observation

অভয়দক্ষিণা—promise of protection from danger

অভয়পত্র—a safe conduct

অভিজ্ঞানপত্র— certificate

অভিসমবায়—association

অভ্যাঘাত—interruption

অর্ম— ruins, rubbish

অরত—apathetic

অল্পোন—slightly deficient

অশ্রি—angle, sharp side of anything

অসংপ্রতি—not according to the moment

অস্তব্যস্ত—scattered, confused

আকরিক, আখনিক—miner

আকল্প—design

আকৃত—shaped

আগামিক—incoming

আঙ্গিক—technique—আঙ্গিক ভাব

আচয়—collection

আচিত—collected

আত্মনীয়
আত্মনীন — one's own, original

আত্মতা—essence

আত্মবিবৃদ্ধি—self-aggrandisement

আত্যয়িক—urgent

আনৈপুণ্য—clumsiness

আপতিক—accidental

আপাতমাত্র—being only momentary

আবাসিক—resident

উক্তপ্রত্যুক্ত—discourse

উচ্চয় অপচয়—rise and fall

উচ্চণ্ড—very passionate

উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিতি—elevation

উচ্ছিষ্টকল্পনা—stale invention

উদ্‌গর্জ্জিত—bursting out, roaring

উদ্‌ঘোষ—loud-sounding

উত্তত—stretching oneself upwards

উত্তম্ভিত—upheld, uplifted

উদ্ধর্ষ—courage to undertake anything

উদ্যোগসমর্থ—capable of exertion

উৎপারণ—to transport over

উদ্বাসিত—deported

উন্মিতি—measure of altitude

উপস্কর—apparatus

উন্মুখর—loud-sounding

উন্মুদ্র—unsealed

উন্মৃষ্ট— rubbed off

উপজ্ঞা—untaught or primitive knowledge

উপধূপন—fumigation.

উপনদ্ধ—inlaid

উপনিপাত—national calamities.

উপপাত—accident

উপপুর—suburb

উল্বণ নাদ—shrill sound

ঊনতা—deficieney

উর্ম্মিমান, উর্ম্মিল—undulating

একতৎপর—solely intent on

একায়ন—footpath

ঐকাঙ্গ—bodyguard

ঐকাত্ম্য—identity

ঐচ্ছিক—optional

ঐতিহ্য—tradition, traditional

কণাকার—granular

কম্র—loving, beautiful

কম্বুরেখা—spiral

করণতা—instrumentality

কাব্যগোষ্ঠী—a conversation on poetry

কাম্য ব্রত—voluntary vow (with special aim)

কারু, কারুক artisan

কালকরণ—appointing time

কালসম্পন্ন—bearing a date

কালাতিক্রমণ—lapse of time

কালান্তর—intermediate time

কির্ম্মির
কির্ম্মীর — variegated colour
কির্ম্মীরিত

কুটিল রেখা—curved line

কুলব্রত—family tradition

কুশলতা—cleverness

কুণিত—contracted

কৃতাভ্যাস—trained

কৃশিত—emaciated
কেলিসচিব—minister of the sports
কেবলকর্ম্মী—performing mere works without intelligence
ক্রমভঙ্গ – interruption of order
ক্রয়লেখ্য—deed of sale
ক্ষয়িষ্ণু—perishable
ক্ষিপ্রনিশ্চয় —one who decides quickly
গর্গর—whirlpool, eddy
গণক-মহামাত্র –finance minister
গীতক্রম—arrangement of a song
গুম্ফন—grouping.
গৃহব্রত—devoted to home
গেহেশূর—carpet-knight
গোত্রপট—genealogical table
গোপ্রতার—ox-ford :(যেখানে গোরু পার করে)
গ্রন্থকুটী—library
গ্রামকূট—congestion of villages.
গ্লান—tired, emaciated
চক্রচর—world trotter
চটুলালস—desirous of flattery
চরিষ্ণু—movable
জড়াত্মক—inanimate, unintelligent
জড়াত্মা— stupid
জনপ্রিয় popular
জনসংসদ—assembly of men
জনাচার—popular usage
জরিষ্ণু – decaying
জ্ঞানসন্ততি—continuity of knowledge
তনিকা—string, বীণার তার
তনুবাত—rarified atmosphere
তরঙ্গরেখা – curved line
তন্ত্রী string, বীণার তার
তরস্বতী
তরস্বিনী } — quick moving
তরস্বী

তরস্থান—landing place

ত ণমা—juvenility

তাৎকালিক—simultaneous

তাৎকাল্য—simultaneousness

তীর্ণপ্রতিজ্ঞ—one who has fulfilled his promise

দিবাতন—diurnal

দুর্গত কর্ম্ম—relief work, employment offered to the famine-stricken

দুর্ম্মর—dying hard (die-hard)

দুরভিসম্ভব—difficult to be performed

দৃপ্ত—arrogant

দ্রপ্স—a drop

দ্রপ্সী—falling in drops

দ্রব্যত্ব—substance, substantiality

দ্রাংক্ষণ discordant sound

দ্রাঘিত—lengthened

দ্রোহবুদ্ধি—maliciously minded

দ্বয়বাদী—double-tongued

দ্বারকপাট—leaf of a door

ধূম্রিমা obscurity

নঙর্থক—negative

নভস—misty, vapoury

নাব্য—navigable

নিঃকাসিত—expelled

নির্ণিক্ত—polished

নিমিশ্ল—attached to

নীরক্ত—colourless, faded

পণ্যসিদ্ধি—prosperity in trade

পতিম্বরা—a woman who chooses her husband

পর্ণশিরা—vein of a leaf

পর্য্যায়চ্যুত—superceded, supplanted

পরাচিত—nourished by another, parasite

পরিলিখন—outline or sketch

পরিস্রাবণ—filtering

পরুত্তন—belonging to the last year

পাদাবর্ত্ত—a wheel worked by feet for raising of water
পারণীয়—capable of being completed
পিচ্চট—pressed flat, চাপটা
পুটক—pocket
পুনর্ব্বাদ—tautology
পুরন্ধ্রী—matron
পূর্ব্বরঙ্গ—prelude or prologue of a drama
পৃচ্ছনা } —spirit of enquiry
পৃচ্ছা
পৃথগাত্মা—individual
পৃথগাত্মিকতা—individuality
প্রচয়—collection
প্রচয়ন—collecting
প্রচয়িকা—collection
প্রচিত—collected
প্রণোদন—driving
প্রতিক্রম—reversed or inverted order
প্রতিচারিত—circulated
প্রতিজ্ঞাপত্র—promissory note
প্রতিপণ—barter
প্রতিপ্রতী—a counterpart
প্রতিবাচিক—answer
প্রতিভা—কারয়িত্রী—genius for action
প্রতিভা—ভারয়িত্রী—genius for ideas, or imagination
প্রতিমান—a model, pattern
প্রতিলিপি—a copy, transcript
প্রতীপগমন—retrograde movement
প্রত্যক্ষবাদী—one who admits of no other evidence than perception by the senses
প্রত্যক্ষসিদ্ধ—determined by the evidence of the senses
প্রত্যভিজ্ঞা } —recognition
প্রত্যভিজ্ঞান
প্রত্যভিনন্দন } —returning a salutation
প্রত্যর্চন
প্রত্যরণ্য—near or in a forest

প্রত্যুজ্জীবন—returning to life
প্রথম কল্প—a primary rule
প্রপাঠ—chapter of a book
প্রবাচন—proclamation
প্রলীন—dissolved
প্রসাধিত—ornamented
প্রাগ্রসর—foremost, progressive
প্রাণবৃত্তি—vital function
প্রাণাহ—cement used in building
প্রাতস্তন—matutinal
প্রাতিভজ্ঞান—intuitive knowledge
প্রেক্ষার্থ—for show
প্রেক্ষণিকা exhibition
প্রোল্লোল—moving to and fro
প্রৌঢ় যৌবন—prime of youth
বর্ত্তিষ্ণু—stationary
বস্তুমাত্রা—mere outline of any subject
বাগ্‌জীবন—buffoon.
বাগ্‌ডম্বর—grandiloquence
বাতপ্রাবর্ত্তিম—irrigation by wind-power
বাগ্‌ভাবক—promoting speech, with a taste for words
বিচিতি—collection
বিষয়ীকৃত—realised
বৃত—elected
বশঙ্গম—influenced
ভঙ্গীবিকার—distortion of features.
ভবিষ্ণু—progressing
ভিন্নক্রম—out of order
ভূমিকা = বাড়ীর তলা, যথা চতুর্ভূমিক –four-storied
ভেষজালয়—dispensary
ভ্রাতৃব্য—cousin
মণ্ডল কবি—a poet for the crowd
মনোহত—disappointed
মায়াত্মক—illusory
মুদ্রালিপি—lithograph

মুমূর্ষা—desire of death
মৃদুজাতীয়—somewhat soft, weak
মৌল—aboriginal
যথাকথিত—as already mentioned
যথাচিন্তিত—as previously considered
যথাতথ—accurate
যথানুপূর্ব্ব—according to a regular series
যথাপ্রবেশ—according as each one entered
(সভাপ্রবেশ সম্বন্ধে)
যথাবিত্ত—according to one's means
যথামাত্র—according to a particular measure
যন্ত্রকর্ম্মকার—machinist
যন্ত্রগৃহ—manufactory
যন্ত্রপেষণী—grinding mill, যাঁতা
যমল গান—duet song
রলরোল—wailing
রোচিষ্ণু—elegant
লঘুখট্বিকা—easy chair
লোককান্ত—popular
লোকগাথা—folk-verses
লোকবিরুদ্ধ—opposed to public opinion
শক্তিকুণ্ঠন—deadening of a faculty
শঙ্কাশীল—diffident, hesitating
শয়নবাস—sleeping garment
শিঞ্জা, শিঞ্জান—tinkling sound
শিথির—flexible, pliant
শিথির—loose
শিল্পজীবী—artisan
শিল্পবিধি—rules of art
শিল্পালয়—art ;institute
শ্মীল—winking, blinking
শ্লক্ষ—slippery, polished
শ্লথোদ্যম—relaxed effort
সংকেতমিলিত—met by appointment
সংকেতস্থান—place of assignation

সংক্রমণকা—a gallery
সংরাগ—vehemence
সংলাপ—conversation
সৎকলা—a fine art

সদ্যস্ক } —belonging to the present day
সদ্যস্তন }

সময়চ্যুতি—neglect of the right time
সমাহর্তা—collector-general
সমূহকার্য—business of a community
সম্প্রতিবিদ্—knowing only the present, not what is beyond

সহজপ্রণেয়—easily led
সহধুরী—colleague
সাত্ত্বিক ভাবক—promoting the quality of purity, natural
সাংকথ্য—conversation
সীতাধ্যক্ষ—the head of the agricultural department
সীমাসন্ধি—meeting of two boundaries
সৃপ্ত—slipped
সৃপ্র—lithesome, supple
সূক্ষ্ম—delicate
সৌচিক—tailor
স্ত্রীদ্বেষী—misogynist
স্ত্রীময়—effiminate
স্ফায়িত—expanding
স্ফির—tremulous
স্বগোচর—one's own range or sphere
স্বচর—self-moving
স্বপ্রভুতা—arbitrary power
স্ববহিত—self-impelled
স্ববিধি—one's own rule or method
স্বমনীষা—own judgment or opinion
স্বয়ংবশ—independent
স্বয়ংবহ—self-moving

স্বয়ম্ভৃত } —self-supporting
স্বয়ম্ভর }

স্বয়মুক্তি—voluntary testimony

স্বসম্বেদ্য—intelligible to one's self

স্বসিদ্ধ—spontaneously effected

স্বাবমাননা—self-contempt

স্বৈরবর্ত্তী—following one's own inclination

স্রস্তর, স্রস্তরা—couch, sofa

স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম—water-power motion irrigation

হস্তপ্রাবর্ত্তিম—hand-power motion irrigation

হৃদয়ভাবক—promoting the feelings and sensations, moved by sentiments

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুস্তকখানি লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনেক দিক্ দিয়া পুথিখানির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। লিপিতত্ত্ব লইয়া একাধিক বিশেষজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বোধ হয়, আজিও চলিতেছে। কিন্তু ইহার রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আজও পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আমরা এই দিক্ দিয়া কিছু চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রথম কথা, ইহা ঝুমুর গানের পুথি। পালাগুলি ঝুমুরের পালা হিসাবে সাজানো। ঝুমুর বলিতে প্রাচীন কালে—

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদু।
একৈব ঝুমরীলোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥"—(সঙ্গীত-দামোদর)।

শৃঙ্গাররসপ্রধান, মাধ্বীকের ন্যায় মধুর এবং মৃদু, বর্ণাদির বাঁধা-ধরা নিয়মহীন গানকে বুঝাইত। ঝুমুরে দুই দলের ভিতর পরস্পরের একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়। এই সম্বন্ধ দুই দলে দুই জন, তিন জন অথবা চারি জনের মধ্যেও হইতে পারে। পরে এই সম্বন্ধ অনুসারে প্রশ্ন, উত্তর, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, গালাগালি, রঙ্গ-রহস্য ইত্যাদি লইয়া গান চলিয়া থাকে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার উদাহরণ প্রচুর। রাধিকা বলিলেন, "বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইল রান্ধন",—কিন্তু এইটুকু বলিয়াই পরিত্রাণ নাই। পরে ইহার জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে. কি ভাবে রন্ধন আউলাইয়াছে অর্থাৎ তিনি রান্ধিবার সময় কি কি ভুল করিয়াছেন, তাহার এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়া তবে রেহাই পাইয়াছেন।

এইরূপ প্রশ্ন, উত্তর, প্রতিউত্তর অসংখ্য। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের, কৃষ্ণের ও রাধার সঙ্গে বড়াইএর কথোপকথন প্রশ্ন উত্তরই ইহার পালাগুলির প্রধান উপজীব্য। রাধা প্রশ্ন করিতেছেন,—

বড়ায়ি,

হাথে ভাগু মাথে করী চান্দ চন্দন চর্চ্চিত গাএ।
যমুনার তীরে কদমের তলে কেনা বাঁশী বোলাএ॥

বড়াই উত্তর দিতেছেন,—

রাধা,

পায়ে মগর খাড়ু হাথে বলয়া মাথে ঘোড়া চুলা।
ধুলাএ ধুসর নীল কলেবর সেই সে নান্দের বালা॥

---

* ১৩৩৬, ২রা চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রশ্ন হইল,—

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ তোর সঙ্গে নিতি আলী।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী॥

উত্তর পাওয়া গেল,—

রাধা তোঁঞ্র মুগধী আবালী গোআলী না জাণ কাহ্নের গুধী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞি পাতএ আশেষ বুধী॥

প্রশ্ন—

আতি মনোহর বাজাএ সুসর সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি কেমণে তাক বাজাএ॥

উত্তর—

বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর মান্দের সুন্দর বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥

কানু কেমন করিয়া বাঁশী বাজান, তাহাও রাধা জানেন না। এমন উদাহরণ অনেক। যাঁহারা কবি বা ঝুমুরের পাল্লা শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও কৃষ্ণের মামী ও ভাগিনেয় সম্বন্ধ, এবং পরস্পরের উত্তর প্রতি-উত্তর সে কালের ঝুমুরের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কৃষ্ণ সাজিয়া কেহ প্রথমে আসরে নামিয়াছেন, প্রতিপক্ষ রাধা। দ্বিতীয় ভাগে রাধা সাজিয়া অন্য জন আসর লইয়াছেন, কৃষ্ণ তাহার প্রতিপক্ষ। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড প্রভৃতি প্রথম ভাগ, এবং বালখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড প্রভৃতি প্রধানতঃ দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড প্রভৃতিতে ইহার সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে।

ঝুমুর গানে জয় পরাজয় আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পালায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কৃষ্ণের অনেক কাকুতিতে এবং বশ্যতা স্বীকারে প্রথম দিকে যেমন কৃষ্ণের পরাজয় সূচিত করে, উত্তর ভাগে তেমনি রাধার পরাজয় লক্ষিত হয়। এখনকার দিনে যেমন যাত্রা বা কীর্ত্তনে যে পালাই গীত হউক, শেষে মিলন না করানো দোষের বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেরূপ দেখা যায় না। ভারখণ্ডে, কালিয়দমনখণ্ডে যমুনাখণ্ডে, হারখণ্ডে ইহার উদাহরণ মিলিবে। বংশীখণ্ডের শেষে পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—ইহার মধ্যে "মঙ্গল কাব্যের" ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি যে, সে কালে বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতির পূজা প্রচলিত ছিল এবং এই সব দেবতার মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলগাথা গাহিয়া লোকে রাত্রি কাটাইয়া দিত। মনসামঙ্গলের কানা হরিদত্ত, ধর্ম্মমঙ্গলের ময়ূর ভট্ট, চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবিকঙ্কণকে আমি চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক বলিয়াই মনে করি। মঙ্গলকাব্য দুইটী ধারায় বিভক্ত ছিল। একটী ধারায়—এক দেবতার ভক্ত অন্য দেবতার পূজা করিতে চাহিতেন না। দুই দেবতার ভক্তের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইত, তাহাতে এক পক্ষ জয়লাভ

করিতেন, অন্য পক্ষের পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটিত। ধর্ম্মমঙ্গল এই ধারার অন্তর্গত। অন্য ধারায় দেবতা আপন বিরুদ্ধ পক্ষের সাধককে নানারূপ ছলে কৌশলে আপনার অনুরক্ত করিয়া লইতেন, আপনার ভক্ত করিয়া তুলিতেন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিকে এই ধারার মধ্যে ফেলিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা যেন একটী বিরুদ্ধপক্ষীয়া ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার অনুরাগিণী করিতে চাহেন, তাঁহার মিলন কামনা করেন। শ্রীরাধা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কত কঠোর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শেষে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইয়াছে, মিলন ঘটিয়াছে, রাধিকা তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছেন। প্রত্যাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মিনতি করিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, তিনিই ত্রিদশের নাথ—তিনিই দশাবতারে দশ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারই ভয়ে কংস নিদ্রা যায় না। ঠিক যেন মনসা বা চণ্ডী,—চাঁদ অথবা ধনপতি সদাগরকে বলিতেছেন, আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করি, আমিই ত্রিদশেশ্বরী, ইত্যাদি। সে কালে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব এতই ছিল যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণীত রামায়ণ সুস্পষ্টরূপে মঙ্গলকাব্যের ধারায় চিহ্নিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে নাই, এমন সব উপাখ্যান, ভাব—যথা তরণীসেন বধ, বীরবাহুর প্রচ্ছন্ন ভক্তিভাব এবং রাবণের মুক্তি কামনায় রামের স্তুতি ইত্যাদি কৃত্তিবাসের রামায়ণে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এ বিষয়ে আর একটা দিক্ লক্ষ্য করিবার আছে যে, বৈষ্ণব রসকাব্যে এই যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ভাব, ইহা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে পাওয়া যায় না। জয়দেব এবং বিল্বমঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যদ্যোতক শ্লোকের অভাব নাই। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের দিক্ দিয়া মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের সঙ্গে বিল্বমঙ্গল—বিশেষ করিয়া জয়দেবের এই ভাবের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কতখানি, তাহাও বিচারের কথা। চণ্ডীদাসের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে গীতগোবিন্দের কয়েকটী প্রসিদ্ধ গান ও শ্লোকের অনুবাদ ও ভঙ্গীর অনুকরণ ইহার অকাট্য প্রমাণ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, ইত্যাদি খণ্ডান্ত নাম দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ইত্যাদির কথা মনে হয়। জয়দেবের অনুকরণে কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টতঃ পতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন,—

"তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী॥"—(কালীয়দমন খণ্ড),
"চরণে পড়োঁ দূতী আণি দেহ প্রাণপতী।"—(রাধাবিরহ)

প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। মঙ্গলকাব্যের ভক্ত-ভাবের উদাহরণ যথা—

"ভকতী দাসিক তেজহ কেহে।"—(কালীয়দমন খণ্ড)।
"আনুগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।"—(রাধাবিরহ)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে তৃতীয় কথা—ইহার কাব্যকথা। কৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি আদিরসের কাব্য। সে কালের ঝুমুর গান শৃঙ্গাররসপ্রধান ছিল। অবশ্য শৃঙ্গাররসপ্রধান কাব্য তার চেয়েও পুরাণ, এমন কি, স্মরণাতীত কালের পুরাতন। সুতরাং বলিতে

হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুরের ধাঁচায় একখানি আদিরসের কাব্য। ঝুমুরের সম্বন্ধ পাতানো আছে, প্রশ্ন, উত্তর, প্রতিউত্তর আছে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, গালাগালি আছে, আবার শৃঙ্গার-রসপ্রধান কাব্যের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ দুইটী ভাগেরই কিছু কিছু আছে। সম্ভোগের বিচারে বিশেষ কিছু ধরা যাইবে না, কিন্তু বিপ্রলম্ভের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কবি,—বীরভূমের কবি, সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের রচনা হইলে তাহাতে তৎসাময়িক বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ছাপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে প্রণীত, ইহার কাব্যপ্রকৃতিই তাহার প্রমাণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই শৃঙ্গারের দুইটি দিক্ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে;—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। মহর্ষি ভরত বলেন, শৃঙ্গারের দুই অবস্থা—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের বিভাব ঋতুমাল্যানুলেপনাদি, অনুভাব নয়নচাতুরী, ভ্রূবিক্ষেপাদি। নাট্য-শাস্ত্রে সম্ভোগের ব্যভিচারী ভাবে আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সা, এই তিনটী বর্জ্জিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভের নির্ব্বেদ, গ্লানি, শংকা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, স্বপ্ন, বিরোধ, ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, জাড্য, মরণাদি অনুভাব।

"অত্রাহ। যদ্যয়ং রতিপ্রভবঃ শৃঙ্গারঃ কথমস্য করুণাশ্রয়িণো ভাবা ভবন্তি অত্রোচ্যতে। পূর্ব্বমেবাভিহিতং সম্ভোগবিপ্রলম্ভকৃতঃ শৃঙ্গার ইতি। বৈশিকশাস্ত্রকারৈশ্চ দশাবস্থোঽভিহিতঃ। তস্য সামান্যাভিনয়ে বক্ষ্যামঃ।

করুণস্তু শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিভবনাশবধবন্ধসমুত্থো নিরপেক্ষভাবঃ। ঔৎসুক্য-চিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণোঽন্যশ্চ বিপ্রলম্ভ ইতি। এবমেষ সর্ব্বভাবসংযুক্তঃ শৃঙ্গারো ভবতি।"

যদিও দণ্ডী এবং ভামহ প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই, তথাপি ইহা যে অপ্রচলিত ছিল, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। পরবর্ত্তী আনন্দবর্দ্ধন এবং রুদ্রট প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন এবং তাঁহার টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে অঙ্গীভূত (প্রধানীভূত) শৃঙ্গারের প্রথমতঃ দুইটী ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের প্রকারভেদ অনেক—সুরত (চতুঃষষ্টিক আলিঙ্গন প্রভৃতি), বিচরণ (উদ্যান গমন), জলক্রীড়া, পানগোষ্ঠী, চন্দ্রোদয়-ক্রীড়া প্রভৃতি। বিপ্রলম্ভের চারিটী ভাগ—অভিলাষ, ঈর্ষা, বিরহ, প্রবাস।

(১) নায়ক নায়িকা উভয়ের মধ্যে জীবিতসর্ব্বস্ব প্রাপ্তির ন্যায় রতির উদ্ভব হইলে ও কোনো কারণে মিলনের বিঘ্ন ঘটিলে অভিলাষ বিপ্রলম্ভ হইবে।

(২) প্রণয়ভঙ্গে খণ্ডিতা নায়িকার ভাব ঈর্ষা-বিপ্রলম্ভ।

(৩) নায়ক নানা উপায়ে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, নায়িকা প্রসন্ন হইলেন না, নায়ক চলিয়া গেলেন, তখন প্রিয়-সমাগম লাভের জন্য উৎকণ্ঠিতা নায়িকার যে অনুতপ্ত অবস্থা, তাহার নাম বিরহ-বিপ্রলম্ভ।

(৪) প্রোষিতভর্তৃকার প্রিয়বিচ্ছেদ, প্রবাস-বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভাদি—এই আদি পদের দ্বারা শাপাদিকৃত বিপ্রলম্ভও বুঝিতে হইবে।

রুদ্রট বলেন—শৃঙ্গারের দুই ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভের চারিটী ভাগ—(১) প্রথমানুরাগ, (২) মান, (৩) প্রবাস, (৪) করুণ।

(১) প্রথমানুরাগ—আলোকনাদি মাত্রে নায়ক নায়িকার গুরু রাগ সঞ্জাত হইলে পরস্পরের অপ্রাপ্তি হেতু ব্যাপারসমূহ। প্রথমানুরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মরণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

(২) মান—নায়িকান্তরসম্বন্ধ-নিবন্ধন নায়কের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণা নায়িকার চিত্তবিকার।

(৩) প্রবাস—পরদেশগত বা গমনোদ্যত বা ভবিষ্য কালে গমনেচ্ছু নায়কের অবস্থা (এবং তদনুরাগিণী নায়িকার বিচ্ছেদদুঃখ)।

(৪) করুণ—নায়ক নায়িকার মধ্যে একতরের মৃত্যু হইলে বা অন্যতর মৃতকল্প হইলে করুণ বিপ্রলম্ভ হয়।

আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে বিপ্রলম্ভের পাঁচটী ভাগ করিয়াছেন—(১) অভিলাষ, (২) বিরহ, (৩) ঈর্ষ্যা, (৪) প্রবাস, (৫) শাপহেতুক।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিতেছেন,—

"বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ।
যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ।
স চ পূর্ব্বরাগমানপ্রবাসকরুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।

*	*	*	*

তথ করুণঃ। যুনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে। বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ। যথা কাদম্বর্য্যাং পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাবৃত্তান্তে। পুনরলভ্যে শরীরান্তরেণ বা লভ্যে তু করুণাখ্য এব রসঃ। কিঞ্চেত্যাকাশসরস্বতীভাষানন্তরমেব শৃঙ্গারঃ। সঙ্গমপ্রত্যাশয়া রতেরুদ্ভবাৎ। প্রথমস্ত করুণঃ এব ইত্যভিযুক্তা মন্যন্তে। যচ্চাত্র সঙ্গম-প্রত্যাশানন্তরমপি ভবতো বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্য প্রবাসাখ্যো ভেদ এব ইতি কেচিদাহুঃ। তদন্যে মরণরূপবিশেষসম্ভবাত্তদ্ভিন্নমপি মন্যন্তে।"

বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শৃঙ্গারের প্রকারভেদ এবং তাহার পরিভাষা লইয়া আলঙ্কারিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইঁহারা প্রায় একই অর্থে বিষয়টীর বিভাগ ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন আর একজনের সংজ্ঞাকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও যথাযথ অন্বর্থ করিলেও নূতন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। নিম্নের তালিকা হইতে মোটামুটী একটা ধারণা পাওয়া যাইবে:—

বিপ্রলম্ভের বিভাগ বণ্টন

	১	২	৩	৪	৫
আনন্দবর্দ্ধন—	অভিলাষ,	ঈর্ষা,	বিরহ,	প্রবাস	(শাপহেতুক)
রুদ্রট—	প্রথমানুরাগ,	মান,	প্রবাস,	করুণ,	
মম্মট ভট্ট—	অভিলাষ,	বিরহ,	ঈর্ষা,	প্রবাস,	শাপহেতুক
বিশ্বনাথ কবিরাজ—	পূর্ব্বরাগ,	মান,	প্রবাস,	করুণ	

অভিলাষ এবং প্রথমানুরাগ বা পূর্ব্বরাগ একই অবস্থার নাম। ঈর্ষা ও মান প্রায় সমার্থক, প্রবাস সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু বিরহ ও করুণের অর্থ একরূপ নহে। 'করুণ' সম্বন্ধে রুদ্রট এবং বিশ্বনাথ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আনন্দবর্দ্ধন ও মম্মট ভট্টের বিরহ হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। আমার মনে হয়, রুদ্রট এবং বিশ্বনাথ বিরহ-বিপ্রলম্ভ ও শাপহেতুক বিপ্রলম্ভ পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার না করিয়া এই দুইটীকে করুণেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণেও বিপ্রলম্ভের চারিটীর অধিক অবস্থা স্বীকৃত হয় নাই। অগ্নিপুরাণে উল্লিখিত আছে,—

"সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ তাবপি দ্বিবিধৌ পুনঃ॥
বিপ্রলম্ভাভিধানো যঃ শৃঙ্গারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
পূর্ব্বানুরাগমানাখ্যঃ প্রবাসকরুণাত্মকঃ॥"

জানি না, এই করুণের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? ভরতের "কথমস্য করুণাশ্রয়িনো ভাবা ভবন্তি" এবং "ঔৎসুক্যচিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণোহন্যশ্চ বিপ্রলম্ভ ইতি" ইহার মূল কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। সাহিত্যদর্পণকার করুণের উদাহরণে কাদম্বরীর পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যুবক যুবতীর একজনের লোকান্তর ঘটিলে এবং পুনরায় মিলন ঘটিলে তবেই তাহা করুণ-বিপ্রলম্ভ হইবে। যদি মিলন না ঘটে বা শরীরান্তরে মিলন ঘটে, তবে তাহা করুণ রসের বিষয়ীভূত হইবে, করুণ বিপ্রলম্ভের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এ বিষয়ে রুদ্রট একটু ভিন্নমত বলিয়াই মনে হয়। উদাহরণে তিনি কুমার হইতে রতিবিলাপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মতান্তরে রতি-কামের পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছিল,—তাহা সাধারণের চক্ষে শরীরান্তরে হইলেও রতির চক্ষে নহে। তিনি প্রদ্যুম্নকে কাম বলিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাও করুণ বিপ্রলম্ভ। এই হিসাবে পৌরাণিক তপতী ও সম্বরণের, পুরুরবা ও উর্ব্বশীর এবং রুরু ও প্রমদ্বরার কাহিনীও স্মরণযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীমতী রাধিকা ও গোপীগণের সহিত পুনর্ম্মিলন এই করুণ-বিপ্রলম্ভের পর্য্যায়ে আনা যায় কি না, তাহাও বিচার্য্য। আমাদের এই আলোচনাটী মনে রাখিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আলোচনা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইব যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাস তাঁহার সমসাময়িক বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পরবর্ত্তী উজ্জ্বলনীলমণি বা অলঙ্কারকৌস্তুভের কোনো প্রভাব লক্ষিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিপ্রলম্ভের যে চারিটী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা তাহাদের নাম—অভিলাষ বা পূর্ব্বরাগ, ঈর্ষা বা মান, করুণ এবং প্রবাস বা বিরহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে একটী খণ্ডের নামই রহিয়াছে "রাধা-বিরহ।" এই খণ্ডে কৃষ্ণ-বিরহাতুরা রাধিকার আক্ষেপ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন, কৃষ্ণের মথুরা গমন, রাধার অনুরোধে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য বড়াইয়ের মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ বর্ণনা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর পুথি খণ্ডিত, সুতরাং পুনর্ম্মিলন কি ভাবে হইয়াছিল, জানিবার

উপায় নাই। যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, চণ্ডীদাস প্রবাস ও বিরহ এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ বা পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। বড়ায়ির প্রতি কৃষ্ণের উক্তি,—

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥
পরাণ আধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ধ্রু॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের তাম্বূলখণ্ডে যদিও কবি কামশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া কামাচার উপায়ন-স্বরূপ তাম্বূল প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে প্রধানতঃ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ভরত কামসূত্রোক্ত বৈশিক শাস্ত্রের উল্লেখে দশাবস্থার কথা তুলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে কামশাস্ত্রের লক্ষণ কবির পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ, রাধাকে না দেখিয়া মাত্র তাঁহার রূপের কথা শুনিয়াই অনুরাগী হইয়াছেন। পদাবলীর রাধার পূর্ব্বরাগে চণ্ডীদাস ভণিতার পদে নাম শুনিয়া অনুরাগিণী হওয়ার বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহারা একবার এ দিকে দৃষ্টি দিবেন। তাম্বূলখণ্ডে স্বপ্নে রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের পদও আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডে ঈর্ষা বা মান বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ মিলন প্রার্থনা করিলে রাধা বলিলেন,—

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেন মণে ॥

* * *

ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে ॥

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। তিনি রাসের অনুষ্ঠান করিলেন।

করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে ॥

* * *

কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্ন মতেঁ করিব বিলাস ॥

এই বলিয়া গোপীগণকে লইয়া তিনি বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই—

রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥
সংহরী সকল দেহে।

গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে॥

কৃষ্ণ আসিয়া রাধার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বিলম্বের জন্য রাধার মান। বৃন্দাবন-খণ্ডে মানভঞ্জন ও মিলন বর্ণিত হইয়াছে। কালীয়দমনখণ্ডে গোপীগণের অনুরাগের পরিচয় আছে।

কাহ্নাঞি ক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষে হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে॥

*   *   *

নেহেঁ তবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সঙ্গে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে॥
হাস ছলেঁ কৈল মন হরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

এই কালিয়দমন দিনে পূর্ব্বরাগ সূচনা পদাবলীর মধ্যেও পাওয়া যায়,—কিন্তু কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। যাত্রার পালায় কালিয়-দমন দিনে এই পূর্ব্বরাগের সূচনায় গান আরম্ভ হইত বলিয়া যাত্রার নামই হইয়াছিল 'কালিয়দমন যাত্রা'। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের পূর্ব্বরাগের পরিচয় পাওয়া যায়—কাত্যায়নীব্রতে। কিন্তু এই কালিয়দমন দিনেই অনুরাগিণী গোপীগণের অনুরাগ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পরিচয় পাই ধেনুক-বধের দিনে। ঐ দিনই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রথম চারি চক্ষের মিলন হইয়াছিল। যদিও ভাগবতে ধেনুকবধ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গোস্বামিগণ লীলার যে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণনা পূর্ব্বে থাকিলেও ঘটনায় কালিয়দমনই অগ্রে সংঘটিত হইয়াছিল। এই দিনও চারি চক্ষের মিলন হইতে পারে, এই অনুমানে বাঙ্গালী পদকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজ পূর্ব্বরাগের পদ লিখিয়াছেন,—

"কালিদমন দিন মাহ, কালিন্দীতীর কদম্বক ছাহ" ইত্যাদি।

বালখণ্ডে 'করুণ' বিপ্রলম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মন্মথ-পাঁচবাণ মারিয়া রাধাকে হতচেতন করিয়াছেন, বড়ায়ি রাধাকে মৃত মনে করিয়াই কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিতেছেন।

রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী॥
কাহ্নাঞি মোরে নাহিঁ ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো॥

মোরে নাহিঁ ছো কাহাঞিঁ বারাণসী যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা॥

কৃষ্ণ বিলাপ করিতেছেন,—

মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে॥—ইত্যাদি।

চারিটী পদে কৃষ্ণের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বিলাপের শেষ পদের—

"বালী জাগহে জাগহে
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল॥ধ্রু॥"

এই ধুয়া পদটীর গভীর করুণ সুর হৃদয় স্পর্শ করে। নানারূপ বিলাপ করিয়া অবশেষে—

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে॥"

ইহা যে মূর্চ্ছামাত্র নহে, প্রকৃতই রাধার দেহ প্রাণহীন হইয়াছিল, উদ্ধৃত কবিতাংশ হইতে তাহাই মনে হয়। পরের পদে স্পষ্টই আছে,—

"রাধাক মারিআঁ পুণী জিআইল কাহ্নে"।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বরাগ ও ঈর্ষ্যার পর অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই তিনি এইরূপে করুণ বর্ণনপূর্ব্বক কাব্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ এবং শ্রীরাধা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, এ কথা চণ্ডীদাস জন্মখণ্ডেই বলিয়া দিয়াছেন। এখন করুণ বর্ণনা করিতে হইলে "যুনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে" এই সূত্র বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। কাজেই চণ্ডীদাসকে মদনবাণের অবতারণা করিতে হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই রাধাকে এইরূপে মহামূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিতা করিতে হইয়াছে। নায়কের পরিবর্ত্তে নায়িকাকে লোকান্তরিতা করিয়া কবি এখানে একটু নূতনত্বেরও অবতারণা করিয়াছেন। আরো একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যাহা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরূপে পরিচিত, যাহা সুদূর প্রবাসানন্তর সংঘটিত হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই বাণখণ্ডে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের মধ্যেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই করুণকে কোনো কোনো আলঙ্কারিক চিরপ্রবাসের রূপেই দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের বিপরীত সম্ভোগ বর্ণনায় সেই লক্ষণের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বিপ্রলম্ভের মধ্যে করুণকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসে অন্তর্দ্ধানকেও প্রবাসের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন—নিকট-প্রবাস। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা-বিরহের কারণরূপে শ্রীদামের শাপের উল্লেখ পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে যেমন শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ। এই শাপও অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিপ্রলম্ভের একটী ভাগ মাত্র।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ এই সমস্ত মিলাইয়া প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শাপহেতুক এবং করুণ, এই দুইটীই তাঁহাদের প্রবাসের মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় তাঁহারা শাপের বা লোকান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ রূপ গোস্বামী যখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রণয়ন করেন, তখন বিপ্রলম্ভের বিভাগে তিনি পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন।

"তত্র বিপ্রলম্ভঃ। স পূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে॥" কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে তিনি প্রেমবৈচিত্ত্য নামক একটী নূতন বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন।

"অথ শৃঙ্গারভেদঃ।

স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ।

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।

প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

তিনি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন,——

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।

যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

উজ্জ্বলচন্দ্রিকাকার ইহার অনুবাদ করিতেছেন,——

"প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।

প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু বিরহ করি ভাবে॥"

রসের বিভাগে এই প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে আক্ষেপানুরাগকেই আমরা বিশেষ করিয়া পাই। আক্ষেপানুরাগ প্রধানতঃ আট প্রকার;—প্রিয় প্রতি, নিজ প্রতি, মুরলী প্রতি, সখী প্রতি, দূতী প্রতি, বিধি প্রতি, কন্দর্প প্রতি ও গুরুগণের প্রতি। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্যের আট ভাগের মধ্যে ইহার চারিটী মাত্র উল্লিখিত হয়—কৃষ্ণ প্রতি, নিজ প্রতি, মুরলী প্রতি ও সখী প্রতি। প্রেমবৈচিত্ত্যের অপর চারিটী ভাগ প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ, উল্লাসানুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদ্গার। এ রসে নায়ক ধীর শান্ত, নায়িকা বিপ্রলব্ধা, রস করুণ, ভাব উৎসাহ। অনুরাগ বলিতে বুঝায়—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে"॥

প্রেমবৈচিত্ত্য এই অনুরাগেই প্রতিষ্ঠিত। প্রিয়কে নিত্য নূতন মনে হয়, এবং এই ভাবের বৈচিত্ত্যে পাইয়াও না পাওয়া এবং না পাইয়াও পাওয়ার বেদনা বা আনন্দ অনুভূত হয়। প্রেমবৈচিত্ত্যে এই অনুরাগেরই আক্ষেপ। ইহার মধ্যে নিরপেক্ষ ভাব একেবারেই নাই, সাপেক্ষ ভাবই সর্ব্বত্র। কারণ, এই অনুরাগে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণী মধ্যেও জন্মলাভের লালসা, এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি অনুভাব হইয়া থাকে। রসোদ্গারের মধ্যে বা বিরহের মধ্যে স্বপ্নে মিলন বর্ণিত হয়, সুতরাং না পাইয়াও পাওয়ার ভাব অনুভূত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রেমবৈচিত্ত্য নায়িকারই হইয়া থাকে, নায়কের নহে। সুতরাং বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ "যূনোরেকতরস্মিন্" এ মত গ্রহণ করেন নাই। করুণে কিন্তু

দুই রূপই ছিল—নায়ক বা নায়িকা যে কাহারো লোকান্তর ঘটিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই করুণও প্রকারান্তরে প্রেমবৈচিত্ত্য। কারণ, প্রেমের বা অনুরাগের অত্যন্ত গাঢ়তা না হইলে মাত্র আকাশবাণী শুনিয়াই কেহ প্রিয়জনকে প্রাপ্তবৎ বলিয়া মনে করে না, এবং প্রিয়-সমাগম লাভ আশায় দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী করুণের পরিবর্ত্তে প্রেমবৈচিত্ত্যের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বপ্রণীত "ললিতমাধব" নামক নাটকে খুব সম্ভব, তিনি এই করুণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধার সূর্য্যলোকে প্রস্থান, তথা হইতে সত্রাজিত-গৃহে আগমন এবং নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, ইহাকে করুণ বই আর কি বলিব? আপত্তি উঠিতে পারে যে, সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা-রূপ রাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শরীরান্তরে লভ্য হওয়ায় এবং সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হওয়ায় ইহা করুণ-বিপ্রলম্ভ কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, অন্যের চক্ষে শরীরান্তর হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাধা শরীরান্তর পরিগ্রহ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ, এমন কি—ভীষ্মকপালিতা চন্দ্রাবলী (রুক্মিণী) প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকল্পনা নিরঙ্কুশ হইলেও করুণ বিপ্রলম্ভের নিয়ম মানিয়াই যে গোস্বামিপাদ তাঁহার নাটকে এরূপ মিলন ঘটাইয়াছেন, এইরূপই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদাস আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে চণ্ডীদাস ভণিতার অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রসের শ্রেণীবিভাগে আক্ষেপানুরাগ, এই নামকরণ চণ্ডীদাসের সময় কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং চণ্ডীদাস আক্ষেপানুরাগ নাম দিয়া কোনো পদ রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বলিবার উপায় নাই। তবে এ কথা অবশ্যই বলা চলে যে, চণ্ডীদাস কতকগুলি এমন পদ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা আক্ষেপানু-রাগের লক্ষণাক্রান্ত এবং পরবর্ত্তী কালে সেই পদগুলিকে আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা ঘটে নাই। চণ্ডীদাসের অনেক পদের ভাষার অদল বদল হইয়াছে, অনেক পদ প্রায় অবিকৃত আছে, কিন্তু সুরের যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—চণ্ডীদাসের খাঁটি পদগুলিতে অন্ততঃ ভাব অনুরূপই আছে, এ কথা একরূপ জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

"প্রথম প্রহর নিশি" (নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস—২০১ সংখ্যক পদ) "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" (কৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহ) পদটী পদাবলী এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন দুইএর মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাবের ঐক্য বিস্ময়জনক।

বংশীখণ্ডের এবং রাধাবিরহখণ্ডের কয়েকটী পদ আক্ষেপানুরাগের সুরে বাঁধা। বংশীখণ্ডের—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥

এই পদকে আক্ষেপানুরাগের পদ বলিলে কি ক্ষতি?

চান্দ সুরুজের ভেদ না জানোঁ
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিনি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিনি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥

অথবা—

কাহাঞি বিহণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোণা মোর কেনা হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।

এই সমস্ত উক্তি যে আক্ষেপানুরাগের, তাহা বোধ হয়, বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। রাধা বিরহের অনেক পদের সুর একেবারে পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। রাধাবিরহের—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলো লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় আভাগিনী॥

অথবা—

যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিআঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে॥

অথবা—

সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিয়ার জল যেন তখনি পলাইল॥

প্রভৃতি পদে পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

'যোগিনীরূপ ধরী হইবোঁ দেশান্তর'

"কাহ্নু বিনি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে"

এই ধরণের পদ চণ্ডীদাসের নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়। রাধাবিরহের—

সোঙরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলোঁ সুখ আসেস দিনে দিনে তনু শেষ
ভাবিআঁ সে কাহ্নের নেহে॥
বিধি বিপরীত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্নু গেল
বিরহেঁ মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহ্নু গেলা কোন দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

অথবা—

আহো নিশি কাহ্নাঞির গুণ সোআরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥

প্রভৃতি পদে বিরহের যে সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, পদাবলীতে তাহারই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। যাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী এক চণ্ডীদাসের নহে, তাঁহাদের এই সমস্ত পদের সঙ্গে পদাবলীর—

ধিক্ রহু জীবনে পরাধীনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি আনল তাপে পাষাণ যে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে যাঞা ঝাপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ সে নেহা মোর বধএ পরাণ॥

এই ধরণের পদগুলি একবার মিলাইয়া দেখা উচিত।

পদাবলীর মধ্যে অর্থাৎ পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় না, এমন কয়েকটী চণ্ডীদাস ভণিতার পদ নীলরতন বাবুর সঙ্কলনে আছে। তাহার মধ্যে একটী পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে ইহার রসভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। পদটীর বড়ু ভণিতা আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে, নানা লিপিকারের হাতে পড়িয়াও রূপান্তর ঘটে নাই।

জনম গোঁয়ানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কার আশে নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুল-শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব ॥
কুল দিলুঁ তিলাঞ্জলি গুরু দীঠে দিলু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িলুঁ গৃহের সাধ কানু হৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইলুঁ ॥
অবলা না জানে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞিঁ তো আনলে পুড়ে মরে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ নেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

রূপক রচনা চণ্ডীদাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গীতগোবিন্দের অনুকরণে তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে এইরূপ কয়েকটী রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গীতগোবিন্দের—

"বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধুকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥"

এই শ্লোকের সঙ্গে—

"সুপুট নাসা তিলফুলে। দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে" প্রভৃতি তুলনা করুন।

"লাবণ্য জল তোর শিহাল কুন্তল" প্রভৃতি পদ রুদ্রটের "বাহূ দ্বৌচ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের অনুবাদ। "খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর

হয়” প্রভৃতি পদের কোনো মূল পাওয়া যায় না, সুতরাং মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের “পীরিতি সুখের সাগর বলিয়া নাহিতে নামিলুঁ তায়। নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুঁখের বায়॥” এই প্রসিদ্ধ পদটী বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচিত। একটু রূপান্তরিত করিয়া দিলেই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষায় পৌঁছিয়া যায়। অবশ্য উপরের পদটীতে রূপক বর্ণনা ছাড়াও আরো কিছু আছে। যাহা আছে, তাহা দরদী হৃদয়ের নিবিড়তর অনুভূতির সঙ্গে মানবচরিত্র এবং সংসারচিত্রের সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই, বরং প্রাচুর্য্যই আছে। পদটী “নেহা সে সুখের সায়র দেখিঞা নাহিতে নাম্বিলোঁ তাএ” ইত্যাদি রূপে পরিবর্ত্তিত করা চলে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে “পিরিতী” শব্দের অভাব নাই।

“মোর বোল সুণ অবগাহী। কাহ্নের পিরিতি কর রাহী॥”—(৩২৮ পৃঃ, কৃ কীঃ)

“আল কাহ্ন করিল সুরতী। পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী॥”—(৩৮২ পৃঃ, কৃ কীঃ)

প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। এই পিরিতী শব্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, পরে পদাবলী রচনায় তিনি যে পিরিতি কথা ব্যবহার করেন নাই, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। এখানে পিরিতির বদলে নেহা করিলেও কোনো ক্ষতি হইতেছে না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে রচিত হইলে ইহার মধ্যে তাহার চিহ্ন কিছু না কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অথবা তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের কোনো প্রভাব লক্ষিত হয় না। কথা উঠিতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালেও প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থের আলোচনা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল। এমন কি, প্রাচীনপন্থী আলঙ্কারিকগণ যে উজ্জ্বলনীলমণি বা অলঙ্কারকৌস্তুভের মত গ্রহণ করেন নাই, এমন পরিচয়েরও অসদ্ভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ “রসগঙ্গাধর” গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। এই রসগ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রণীত হইয়াছিল। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অথবা তাঁহার টীকাকার সুপণ্ডিত নাগোজী ভট্ট প্রাচীন মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভের বিভাগ নির্ণয়ে ইহাঁরা অভিলাষ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস, বিরহ এবং করুণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি এই মত গৃহীত হইয়া থাকে, তবে ইহাকে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিলে ক্ষতি কি ? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে কোনো বাঙ্গালী কবির পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা অসম্ভব কথা। যদি তাহা সম্ভব হইত, এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাধীনচিত্ততা যদি কোনো কবির প্রকৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যে অনুকরণের পর অনুকরণ দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইত না। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে মঙ্গলকাব্যকে পশ্চাতে রাখিয়া, জয়দেবের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা এক চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহারই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। চণ্ডীদাস ভাব, মহাপ্রভু রূপ। চণ্ডীদাস জাতির কবি, জনসাধারণের কবি। তাই চণ্ডী-দাসের জন্মভূমি বীরভূমের নান্নুর বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র। চণ্ডীদাসের কথা বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনের একটী রহস্যজনক অধ্যায়। সে রহস্যের মর্ম্ম আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আমি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

[অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ সংগ্রহে সুহৃদ্বর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ এবং শ্রীমান্ অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ এম-এ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।]

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আঙ্কিক শব্দ *

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশৎ ভাগের প্রথম অঙ্কে শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত "শব্দ-সংখ্যা-লিখনপ্রণালী" নামে এক চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এমন রচনা-পরিপাটী, বস্তুনির্দেশ, পদবিভাগ, দেশদেশান্তরে অনুসন্ধান, উপসংহারে অনুসন্ধানফল কদাচিৎ দেখিতে পাই। তিনি এবং অন্যে পাশ্চাত্ত্য অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা আমাদের গণিত-বিদ্যা নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি এখানে দূরবীক্ষণ যোগে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিতেছি।

১। অঙ্কের উৎপত্তি

হাতের দশ আঙ্গুল হইতে, এক হইতে দশ গণনার উৎপত্তি। নিরক্ষর জনে কখনও ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া একাদশ জানিতে একটা গুটী দেয়, কখনও ২০ পর্য্যন্ত গণিয়া এক কুড়ির গুটী দেয়। এইরূপ একদশ, দুইদশ, কিংবা এক কুড়ি, দুই কুড়ি গণিয়া গণিয়া চলে। কোন দ্রব্যের বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় মনে রাখিবার নিমিত্ত কাঁথে সিন্দুরের কিংবা হলুদের ফোঁটা দেয়; কখনও ডোরে গাঁইট দেয়; কখনও বা হাঁড়িতে কড়ি কিংবা গুটী রাখে। মনে রাখিবার এই স্বাভাবিক উপায় পূর্ব্বকালেও নিশ্চয় ছিল। অনভিজ্ঞ বিদেশী উপহাস করে; বলে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের বয়স বলিতে পারে না। কিন্তু ভাবে না, লিখিতে পড়িতে না জানিলে জন্ম-বৎসর লেখা হইতে পারে না। যদি বয়স মনে রাখিতে হয়, তাহা হইলে বৎসর বৎসর একটি করিয়া গুটী রাখিতে হইবে। বেদের কালে, বৎসর গণিতে কুশ রাখা হইত, এবং ব্রাহ্মণ-কালের কালজ্ঞেরা শ্লোকে ছড়া বাঁধিয়া রাখিতেন; বৎসরসংখ্যা যত বাড়িত, ছড়াও তত লম্বা হইত। † পরবর্ত্তী কালে বয়স গণিবার নিমিত্ত জন্মতিথি কিংবা জন্মনক্ষত্র-পালন বার্ষিক একটা কৃত্য হইয়াছে।

২। আঙ্কিক শব্দ

এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ কবে রচিত হইয়াছিল, কে জানে? বেদ-সংহিতার কালে এই সকল সংখ্যা-বাচক শব্দ দ্বারা গণনার কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু সেই সময় হইতেই কয়েকটি ছন্দের নাম সংখ্যা-বাচক হইয়াছিল। এক এক ছন্দে যত অক্ষর, তত সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে বেদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ঋষি সে সে ছন্দের নাম করিতেন। যেমন, একটা বৈদিক ছন্দের নাম ছিল বৃহতী। এই ছন্দে ৩৬টি অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণের ঋষি ছত্রিশ না বলিয়া বৃহতী বলিতেন। এ বিষয় শ্রীযুত দত্ত সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। এ যে কোন্ কালের কথা, কে নির্ণয় করিতে পারিবে? আমার যৎসামান্য অনুমানে কলিযুগ আরম্ভের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ পূর্ব্বে এই রীতি আরম্ভ হইয়াছিল। তদবধি কালক্রমে অন্য কতকগুলি সাধারণ শব্দ, সংখ্যা বুঝাইতে সাঙ্কেতিক হইয়াছে। এখন পাঠশালার বালকেও শেখে, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, ইত্যাদি। যাবতীয় গণিত জ্যোতিষে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত (১৩৩৬, ২৩এ মাঘ)।

† Gavam-ayana. By R. Shamasastry

এ ইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দের প্রচুর প্রয়োগ হইয়াছে। এখনও সংস্কৃতে গ্রহগণিত রচনায় এই রীতি চলিতেছে। এই সে দিন বোম্বাইর শ্রীযুত বেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর তাঁহার গ্রহগণিতাদি গ্রন্থের যাবতীয় সংখ্যা সাঙ্কেতিক শব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক শাস্ত্রের পরিভাষা আছে। আঙ্কিক শব্দ, গণিতশাস্ত্রে পারিভাষিক। চন্দ্র একটি। ইহাকে ইন্দু, বিধু ইত্যাদি যাই বলি, সেই এক চন্দ্র। গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা-প্রকাশে, চন্দ্র = ১, 'চন্দ্র' একটি সংজ্ঞা। আয়ুর্ব্বেদে চন্দ্রঃ হইয়া গিয়াছে কর্পূর, এবং 'চন্দ্রম্' স্বর্ণ। আমরা কিন্তু চন্দ্রে রজত দেখিয়া 'চাঁদি' করিয়াছি, এবং চাঁদা বলিলে চন্দ্রাকার রৌপ্যখণ্ড বুঝি। যোগ-বিদ্যায় চন্দ্রনাড়ী = ইড়ানাড়ী, ইত্যাদি। যিনি যে বিষয়ের দ্রষ্টা, তিনি সাদৃশ্য দেখিয়া স্ব-শাস্ত্রের পরিভাষা করেন। পরে পদ ও অর্থের ইতরেতর অধ্যাসহেতু একটি বলিলে অপরটি বুঝায়। লোকে বলে, শ্রাদ্ধে 'ষোড়শ' হইয়াছিল; যে সঙ্কেতটি জানে, সে বুঝে ষোড়শ উপচার। এইরূপ, নাথ-যোগীরা দীক্ষাকালে 'দ্বাদশ' গ্রহণ করিত। এই 'দ্বাদশ' তাহাদের পারিভাষিক। তেমনই, "গোরক্ষ-বিজয়ে"র ও "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র 'দশমী দুয়ার' যোগশাস্ত্রের এক পরিভাষা। দেহের নবদ্বারের অতিরিক্ত 'দশমী' শব্দ দ্বারা কণ্ঠনালী বুঝাইত। এই হেতু "দশমী" স্ত্রীলিঙ্গ পদ। যোগীরা জিহ্বা দীর্ঘ করিতেন, পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইয়া তাহার অগ্র দ্বারা "দশমী দুয়ার" রোধ করিতেন। গ্রামেও দেখি, "টা" বলিলে এক শত টাকা বুঝায়। যেমন "বিবাহে ক-টা খরচ হইল?" এখানে ক-টা = কয় শত টাকা। এইরূপ, "এক পোয়া" বলিলে পঁচিশ টাকা বুঝায়। ইদানীং কেহ কেহ দ্বাদশ 'শতক' লিখিয়া বলিতেছেন, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ বুঝিতে হইবে। শতক, শত-দ্রব্যের সমষ্টি। এতদ্দ্বারা শত বৎসর, তদুপরি খ্রীষ্ট শত বৎসর বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, আঙ্কিক শব্দ রচনা স্বাভাবিক ক্রমেই হইয়াছে; আকস্মিক ভাবে হয় নাই।

৩। আঙ্কিক শব্দের প্রাচীনতা

বরাহের "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা"য় পাঁচখানি সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "পিতামহ-সিদ্ধান্ত" ৮০ খ্রীষ্টাব্দে শোধিত হইয়াছিল। ইহার মূল যে কত প্রাচীন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা যে খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দের বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সংস্করণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। লগধ নামে এক ব্যক্তি পাঁজি গণিবার সূত্র করিয়াছিলেন। তাহাকে ধরিয়া বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উৎপত্তি। অতএব খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দের পূর্ব্ব হইতে "পিতামহসিদ্ধান্তে"র মূল চলিয়া আসিতেছিল। বরাহের "বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে"র মূল আরও প্রাচীন। কিন্তু থিবো সাহেব যে পুথি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পাঠ অশুদ্ধ, স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ। পণ্ডিত ভগবান্‌দাস পাঠক তাহাকে যথামতি শুদ্ধ করিয়া লইয়া বলেন যে, তাহা ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমা হইতে গণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের "পিতামহ-সিদ্ধান্তে" মাস অমান্ত, "বসিষ্ঠসিদ্ধান্তে" মাস পূর্ণিমান্ত, এবং কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ। কার্ত্তিক হইতে পূর্ণিমান্ত মাস গণনা বহু প্রাচীন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে সে রীতির পরিবর্ত্তন হয়।

ইহাতেও অনুমান হয়, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ অপেক্ষা "বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত" প্রাচীন। উক্ত পাঠক মহাশয় গণিত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, বরাহের "পৌলিশসিদ্ধান্ত" ৫১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এবং "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" ১২৯ কিংবা ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।* অন্য কারণে আমি মূল "সূর্য্য-সিদ্ধান্তে"র এই কাল অনুমান করিয়াছিলাম। পরে প্রদত্ত আঙ্কিক শব্দ দেখিলেও এইরূপ প্রাচীন মনে হইবে। অতএব যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জন্য আঙ্কিক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদের ব্রাহ্মণের পরেই হইয়াছিল।

৪। আঙ্কিক শব্দ প্রয়োগের দোষ গুণ

শ্রীযুত দত্ত সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা-প্রকাশের দোষ গুণ দেখাইয়াছেন। কোন শাস্ত্রের নূতন নূতন পরিভাষা করিলে যে দোষ, এখানেও সেই দোষ। পূর্ব্বপ্রচলিত পরিভাষা না জানিলে, কিংবা নূতন পরিভাষা করিতে গেলে বিকল্প ঘটিয়া যায়। এই দোষ পরিহারের উপায় নাই। কিন্তু গুণ অনেক।

সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশে, ব্যাকরণের সমাসের অনিশ্চয়ে পড়িতে হয় না। "একং শতং", ইহার অর্থ ১০০, কিংবা ১০১। সায়ণ "ত্রি-সপ্ত" পদের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত সে তিন প্রকার অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিতের কাল সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে আছে,—

মহাদেবাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
এক-বর্ষ-সহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥

বায়ুপুরাণের এই কাল নির্দ্দেশ নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "একবর্ষসহস্রং", ১০০০ কিংবা ১০০১ বর্ষ। ইহার সহিত ৫০ কেহ যোগ, কেহ বিয়োগ করিতে বলেন। আমরা এখন পূর্ব্বকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, সে কালের ভাষা ঠিক বুঝিতে পারি না। যে কালে লিখিত, সে কালের লোক প্রকৃত অর্থ অবশ্য বুঝিত। ছন্দোবদ্ধ শ্লোক রচনা, সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা অসম্ভব হইত। গ্রহগণিতে অসংখ্য সংখ্যা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রথম সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দ ও আঙ্কিক শব্দের মিশ্রণে নানা সংখ্যা প্রকাশিত হইত। পরে আঙ্কিক শব্দ বৃদ্ধি পাইয়া মিশ্রণের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছিল।

৫। অঙ্কের বামা গতি

নিরক্ষর জনে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু ভাষা জানে, গণিতে শেখে। প্রায়ই কুড়ি পর্য্যন্ত গণিতে পারে, দশ দশ করিয়া গণিতে বলিলে দশ দশ করিয়া গণে। 'অঙ্ক' শব্দের অর্থ চিহ্ন। কাঁথে হউক, কাঠের পাটাতে হউক, দাঁড়ি চিহ্ন করিয়া যায়। বাম হইতে দক্ষিণে একটি একটি করিয়া চিহ্ন দেয়। দক্ষিণ হইতে বামে কিংবা উপর হইতে নীচে, দাঁড়ি কাটিতে দেখা যায় না। যে স্বাভাবিক কারণে আমরা বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ দ্বারা শব্দের অক্ষররূপ চিত্র করিয়া থাকি, অন্য চিহ্নেও তাই করি। দশ দশ গণিতে হইলে সে প্রতি দশক চিহ্নে বিশেষ করে, হয় ত সেটা লম্বা করে, হয় ত ঢেরা করে। প্রথমে দেখে, শেষ দশকের পরে কয়টা দাঁড়ি আছে। পরে দেখে, কয়টা দশক চিহ্ন গিয়াছে। যদি পনরটা

* Hindu-Aryan Astronomy: by Pandit Bhagawan Das Pathak, Dehra Dun, 1920.

দাঁড়ি থাকে, বলে—পাঁচটা বেশী এক দশ। সংস্কৃতে বলি, পঞ্চদশ অর্থাৎ পঞ্চোত্তর-দশ। 'উত্তর' শব্দের অর্থ—ঊর্দ্ধ, অধিক। যদি কুড়ি কুড়ি গণিতে হয়, তাহা হইলে বলে, পাঁচ কম এক কুড়ি। কিন্তু যদি পঁচিশটি দাঁড়ি হয়, তাহা হইলে,'পাঁচ বেশী এক কুড়ি', কিংবা পাঁচ বেশী দুই দশ। সংস্কৃতে 'পঞ্চবিংশতি'। এখানে বস্তুতঃ পঞ্চ-দ্বিদশ। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রথমে পঞ্চ, তার পর বিংশতি। এইরূপ, অষ্টোত্তরশত, প্রথমে আট, পরে শত।

একদশ পাঁচ, দুই দশ পাঁচ, কি একশত আট, এইরূপে যে নিরক্ষরেরা বলিতে পারে না, তা নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত রীতি স্বাভাবিক মনে হয়, গুরু সংখ্যা প্রথমে বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, লঘু সংখ্যা বলিতে আয়াস কম লাগে। অর্থাৎ, এইরূপ গণনার রীতি মনোবিদ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আমরা যখন জোড়া জোড়া সংখ্যা বলিয়া আসন্ন-সংখ্যা প্রকাশ করি, তখনও এই রীতি। বলি, পাঁচ সাতটা, দশ বারটা, বিশ পঁচিশটা, ইত্যাদি। সাত-পাঁচ ভাবনায় চিন্তাধারার বিপর্য্যয় বুঝি।

পঞ্চদশ, পাঁচটা আর দশটা, কিংবা দশটা আর পাচটা, কিংবা ছয়টা আর নয়টা, ইত্যাদি দ্রব্যের যোগ-ফলে পঞ্চদশ নামক পিণ্ড। পাঁচে বাণ, দশে দিক্; অতএব পঞ্চদশ=বাণদিক্ কিংবা দিক্‌বাণ। এখানে পিণ্ড ভাগ করিয়া পঞ্চদশ এই সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। পিণ্ডাংশ বামে কিম্বা দক্ষিণে রাখিতে পারি, কোন্‌টা বামে, কোন্‌টা দক্ষিণে বিচার না করিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক করিয়া থাকি। একটা মোড়কে দশ টাকা, আর একটায় পাঁচ টাকা থাকিলে দশ টাকার মোড়কটি কাছে রাখি, তার পর পাচ টাকারটি।

যখন অঙ্কচিহ্ন দ্বারা সংখ্যা ব্যক্ত করিব, তখনও কাঁথের দাঁড়ির শ্রেণীর অনুসরণ করি। পঞ্চদশ, প্রথমে দশটার দাঁড়ি, পরে পাঁচটা। দশের চিহ্ন যদি 'দ' ও পাঁচের চিহ্ন 'প' হয়, তাহা হইলে লিখিব দপ, কিন্তু পড়িব পঞ্চদশ. আঙ্কিক শব্দে বাণদিক্। সংস্কৃতে ১৪৪২ অঙ্ক পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশদধিকচতুর্দ্দশশত বলা হয়। প্রথমে "আদি"স্থানের অঙ্ক, পরে বামা গতিতে অন্ত্য স্থানের অঙ্ক। অঙ্কস্য বামা গতিঃ, এই দৃষ্টান্তে যাবতীয় অঙ্কে বামা গতি চলিয়া আসিয়া থাকিবে।

বড় বড় সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বামা গতিক্রমে লিখিয়া গেলে, অঙ্কের স্থানে ভুল হয় না। নানা সংখ্যা পরে পরে লিখিতে হইলে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতে ভুল হইতে পারে। চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র লিখিতে হইলে ৩২এর পর কয়টা শূন্য বসিবে, তাহা ভাবিতে হয়। কিন্তু শূন্য শূন্য শূন্য দুই তিন চারি বলিয়া গেলে সংখ্যাটি যে সে নির্ভুল লিখিয়া দিবে।

৬। অঙ্কের স্থানীয়মান

বোধ হয়, প্রথমে অঙ্কের স্থানীয় মান হয় নাই। দশক, শতক, সহস্রক ইত্যাদির পিণ্ড এবং এক দুই তিন···নয় বোধক পিণ্ড পৃথক্ রাখিয়া, তাহাদের সমষ্টি দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা গণিত হইত। পরে পৃথক্ পিণ্ড স্থাপন না করিয়া মনে মনে রহিল। অঙ্কের স্থানীয় মানের সূত্রপাত হইল। পশ্চিম দেশের বিদ্বানেরা বলেন, পূর্বকালে এ দেশে লিখন জানা ছিল না; লোকে সব মুখস্থ করিয়া রাখিত। দ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদ বিভাগ করিলেন; মুখে মুখে করিলেন, এবং মুখস্থ করাইয়া দিলেন,—কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না।

বেদের মন্ত্র বহুকাল যাবৎ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারও মুখে মুখে সম্পন্ন হইত কি? বেদের পণি, বণিক্ ছিল। তাহারা কোনরূপ চিহ্নদ্বারা বড় বড় আদান প্রদান লিখিয়া রাখিত না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না। প্রাচীন বেবিলন ও মিশর লিখিতে জানিত, আর তত্তুল্য সভ্য আর্যজাতি জানিত না, তাহাদের সহিত মিশতেন, এক-ধর্ম্মে হইয়া থাকিতেন না, তথাপি তাহাদের বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহাও বিশ্বাস হয় না। এ বিষয়ে এত দিন যদি বা সন্দেহ ছিল, সিন্ধু প্রদেশের নূতন আবিষ্কারের পর সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের প্রাচীন অধিবাসী সুমেরী বিদেশী হউক, কি সৌবীর স্বদেশী হউক,তাহাদের নিকটবর্ত্তী আর্যেরা বাক্যকে চিত্রিত করিবার বুদ্ধি সুমেরীয় চিত্র দেখিয়াও শিখিতে পারেন নাই, ইহা অবিশ্বাস্য। অক্ষর-মাত্রেই চিত্র। আর, সে চিত্রের প্রথম কল্পনায় নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক বস্তু অবলম্বিত হইয়াছিল। বহু পরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি চিহ্নের কল্পনায় এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, তিন দাঁড়ি ইত্যাদি যে ছিল, তাহা এখনও বর্ত্তমান অক্ষরের আকারে কিছু কিছু আছে।*

কৌটিল্যের সময়ে লেখাপড়া প্রচুর ছিল। তাঁহার অক্ষপটলে প্রবেশ করিলেই সারি সারি সাজানা "উপস্থানে (থাকে) নিবন্ধ পুস্তক" দেখিতে পাওয়া যাইত। গাণনিক যাবতীয় আয়-ব্যয়, হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং কারণিক (কেরাণী) রাজ্যের যত খবর লিখিত। কুপ্যাধ্যক্ষ বন হইতে তালী, তাল ও ভূর্জ "পত্র", এবং পলাশ, কুসুম্ভ ও কুঙ্কুমের ফুল যোগাইতেন। বোধ হয়, সে কালে মসীর প্রচলন হয় নাই, তালী ও তালপত্রে লৌহ-লেখনী দিয়া লিখিয়া, ঐ সকল ফুল ঘষিয়া লিপি স্পষ্ট করা হইত। ভূর্জপত্রে তুলী দিয়া "বর্ণিত" হইত, "লিখিত" হইতে পারিত না।

কৌটিল্যের তুলা-যন্ত্র বর্ণনায় 'অক্ষ' শব্দ আছে। ইহা ধরিয়া শ্রীযুত দত্ত অঙ্কের স্থানীয় মানে আসিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, এই অনুমানে ভুল আছে। কথাটা একটু বিচার করি। কৌটিল্যের অক্ষ-পটলে আয় ও ব্যয়ের কথা। অক্ষ-শালায় সুবর্ণাধ্যক্ষ থাকিত। এখানে অক্ষ শব্দে 'সুবর্ণ' (মুদ্রা) বুঝিতে হইবে। অক্ষ ও কর্ষ এক দ্রব্য। কর্ষের নামান্তর সুবর্ণ ছিল। এই হেতু অক্ষ অর্থে সুবর্ণ। তুলামানপৌতব অধ্যায়ে, তুলা (তুলদাঁড়ী) নির্ম্মাণের কথা আছে। সাধারণতঃ তুলদাঁড়ী সমবৃত্ত না হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে স্থূল করা হয়। সমবৃত্ত তুলায় দণ্ডটির ব্যাস সর্ব্বত্র সমান। এইরূপ কাঠের তুলা, কাপাস ও কাপাস সুতা ওজন করিতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের সমবৃত্ত তুলা ধাতুনির্ম্মিত। লম্বায় ৭২ আঙ্গুল (৩ হাত), ওজনে ৩৫ পল। ইহার পাল্লার ওজন ৫ পল। লিখিত আছে, (সুতা দিয়া ঝুলাইয়া) প্রথমে দণ্ডটি 'সমান' করিবে। তাহার পর, ১কর্ষ, ২কর্ষ, ৩কর্ষ, ৪কর্ষ বা ১পল, ২পল, ক্রমে ১০পল। ১০পলের পর ১২পল, ১৫পল, ২০পলে চিহ্ন করাইবে। তারপর ৩০, ৪০, ইত্যাদি দশোত্তর ক্রমে ১০০ পর্য্যন্ত "সম" করাইবে (সমকরণং কারয়েৎ)। তাহার পর "অক্ষেষু নান্দী পিনদ্ধং কারয়েৎ। † শ্রীযুত দত্ত দুই টীকাকারের মতানুসারে লিখিয়াছেন, "অক্ষস্থলাদিতে নান্দী চিহ্ন খোদিত করিবে।

* See also, The Art of Writing in Ancient India—by Abinaschandra Das. Calcutta University.

† শামশাস্ত্রিকৃত সংস্করণে, "ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং দ্বাদশপঞ্চদশবিংশতিরিতি রয়েৎ।" "রয়েৎ"

পাঁচ এবং সমস্ত পঞ্চগুণা সংখ্যা 'অক্ষেষু' পদে বিবক্ষিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা পঞ্চম দশম পঞ্চদশাদি সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে।" কিন্তু তিনি ইঁহাদের ব্যাখ্যা ঠিক মনে না করিয়া লিখিয়াছেন, "২৫, ৩৫, ৪৫ ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থানই যে নান্দী-চিহ্নিত করিবার কথা কৌটিল্য বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" কিন্তু কাহারও ব্যাখ্যা আমার মনে লাগিতেছে না। (১) 'নান্দী পিনদ্ধং কারয়েৎ', ইহার অর্থ নান্দী বেষ্টন করিবে। এখানে চিহ্নিত বা ক্ষোদিত করিবার কথাই নাই। সকলেই জানেন, তুল দাঁড়ি সুতার ফাঁস দিয়া ঝুলাইতে হয়। এই সুতার নাম বাঁকুড়ায় "নাথ" বা "নাৎ" সংস্কৃত 'নদ্ধ' শব্দের অপভ্রংশ (তুল° বা° নথী)। এই সুতার নাম এখানে নান্দী। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে হাতে যে সুতা বাঁধা হয়, তাহার নাম নান্দী। স° নান্দীপট কুয়ার মুখের নন্দাকার (নাঁদার আকারের) পাট। নান্দী গোলাকার কিছু, এই অর্থ পাইতেছি। আমার স্মরণ হইতেছে, স্বর্ণকারের নিক্তির কাঁটা ওড়িয়া ভাষায় নান্দী বলে। ইহাকে স্বস্তিক বলা চলে। তুলদাঁড়ীতে যে "নাথ" চাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। (২) এখন কথা, ডাঁটির কোথায় "নাথ" বাঁধিবে? 'অক্ষেষু'। নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে চিহ্ন করা হইয়াছে। কোথায় কোথায় চিহ্ন করা হইয়াছে? ১পল, ২পল, ইত্যাদি ১০পল, পরে ১২পল, ১৫পল, ২০পল। তার পর দশ দশ পল পরে পরে। অর্থাৎ ২০ পলের পর আর পঞ্চোত্তর নয়, দশোত্তর। ২৫, ৩৫,৪৫ ইত্যাদি, পঞ্চাদি নাই। এই অর্থ স্পষ্ট। অন্য অর্থ হইলে 'দশোত্তর' স্থানে 'পঞ্চোত্তর' হইত। (৩) পাল্লায় প্রতিমান না চাপাইয়া পদস্থান পাইবার জো নাই। আর, পদ না পাইলে নান্দী বাঁধা চলে না। "পরিমাণী" তুলা এইরূপ, কিন্তু ৯৬ আঙ্গুল (৪ হাত) লম্বা, দ্বিগুণ ভারী। তাহাতে ১০০পল পদ, ১২০, ১৫০ ও ২০০পল পদ করাইবার কথা আছে। এখানে দশোত্তর নয়, বিংশোত্তরও নয়। অতএব বোধ হইতেছে, এক এক নির্দ্দিষ্ট ওজনের দ্রব্য পাইবার নিমিত্ত এই এই তুলা লাগিত। কিন্তু তিন হাত চারি হাত দীর্ঘ এবং দ্রব্য সহ চারি সের আট সের ভারী তুলা হাতে ধরিয়া সুতায় ঝুলাইবার কথা নয়। ময়ূরপদাকার অধিষ্ঠান হইতে ঝুলান হইত। এবং বোধ হয়, ইহার মাথায় লোহার আংটা বদ্ধ থাকিত। সেটি নান্দী। তুলাদণ্ড নান্দীর গোল ছিদ্রে প্রবিষ্ট থাকিত। দণ্ডের প্রতিপদে চক্র ক্ষুদিয়া দেওয়া হইত। নিম্নীকৃত চক্রাকার আধারে নান্দী বসান হইত। অর্থাৎ 'অক্ষেষু', চক্রেষু। চক্রের পাশে পলের অঙ্ক ক্ষোদা থাকিত। অমরকোষে 'অক্ষ' শব্দের এক অর্থ চক্র আছে। জ্যোতিষের সাক্ষ নিরক্ষ দেশ ও অক্ষাংশ শব্দের 'অক্ষ' চক্র বুঝি। 'অঙ্ক' অর্থে অখা হইতে পারে না।

কারয়েৎ হইবে। "বিংশতিরিতি কারয়েৎ" ভাল লাগিতেছে না। প্রোফেসার জলী (Jolly) কৃত সংস্করণে (The Paujab Sanskrit Book Depot, Lahore) আছে, "বিংশতিরিতি পদানি কারয়েৎ"। দুই সংস্করণে অপর বাক্য সমান। আমার কাছে সংস্কৃতটীকা নাই। শাম শাস্ত্রী ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, Symbols such as 1 pala, 12, 15, and 20 palas shall be marked—নান্দী অর্থে টাকাকার স্বস্তিক বুঝিয়াছেন। কিন্তু 'স্বস্তিক' আকৃতির চিহ্ন, না আর কিছু, তাহা না জানিলে এই অর্থের কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

৭। ভগ্নাংশ-প্রকাশ

অবিভক্ত দ্রব্যের মানসিক ভাগ-কল্পনা একটু কঠিন। এক টাকার আট ভাগের এক ভাগ বলিলে নিরক্ষর লোকে বুঝিতে পারে না। ইস্কুলের বহু বালক বহু দিন পর্য্যন্ত বাক্যটির অর্থ ধরিতে পারে না। কিন্তু দুয়ানি বুঝিতে পারে, অর্থাৎ টাকায় ষোল আনা পাইলে, দুই আনা যে কত, তাহার বোধ হইতে পারে। পূর্ব্বকালেও অর্দ্ধ, সার্দ্ধ, সপাদ, পাদোন, ত্রিভাগোন, এইরূপ দুই ভাগ ও চারি ভাগ পর্য্যন্ত গণা হইত। চারি ভাগ অপেক্ষা দুই ভাগ কল্পনা সহজ। অর্দ্ধের নাম "দল"। চারিটা সমান ভাগে একটা দ্রব্যকে বিভক্ত করিতে না পারিলে পাদ-বুদ্ধি আসে না। এই হেতু মনে হয়, ছন্দের চারি পাদ হইতে পাদ = ¼, নামান্তর চরণ, অংঘ্রি। "কবিকল্পলতায়" চারি, এই সংখ্যার এক সাঙ্কেতিক শব্দ, 'বৃত্তপাদ'। এ দিকে কিন্তু শফ (গবাদির খুর) = ⅛ আছে, যদিও কদাচিৎ পাইয়াছি। চন্দ্র-বিম্ব মাপিলে ষোল আঙ্গুল হয়। ইহা হইতে চন্দ্রের ষোল কলা এবং কলা = ১⁄১৬। কলা শব্দের বিকারে বাংলা কড়া (আঙ্গুল)। পূর্ব্বকালে ষোল আনা টাকায় এক আনা সুদ ছিল। এই হেতু কলান্তর শব্দের অর্থ সুদ। অন্য কারণে পাদ = ৪, কলা = ১৬ হইয়াছিল। চারি পাদের প্রত্যেকের নাম পাদ; এবং ষোল কলার প্রত্যেকের নাম কলা। অতএব পাদ = ৪, কলা = ১৬।

গাণিতিকের নিকট কোটিভাগও আমলকবৎ গ্রাহ্য পদার্থ। কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যা সাধারণের পক্ষে দুরূহ। এই হেতু অংশের নাম হইয়াছিল, তাহাতে সকলের বোধের সুবিধা হইয়াছিল। দ্রব্যের ষোল ভাগের এক ভাগ না বলিয়া, এক কলা। এইরূপ, অদ্যাপি গ্রামে আনা দ্বারা কলা বুঝিতে হয়। "এবার ফসল দশ আনা" বলিলে নিরক্ষর লোকেও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে। মাসের তিন ভাগের দুই ভাগ না বলিয়া ২০ তিথি। এইরূপ অহোরাত্রে ৩০ মুহূর্ত্ত, নক্ষত্রে ৮০০ কলা, ইত্যাদি। কাজেই ভগ্নাংশ জ্ঞাপনের আঙ্কিক শব্দ আবশ্যক হয় নাই। সূক্ষ্মরূপে ভগ্নাংশ জানাইবার এবং শ্লোকের মধ্যে ভগ্নাংশ এড়াইবার এক সুন্দর উপায় উদ্‌ভাবিত হইয়াছিল। একটা বৃহৎ সংখ্যা ভাজক ধরিয়া উদ্দিষ্ট সংখ্যা ভাজ্য করা হইত। জ্যোতিষে দেখি, একটা ভাজকের নাম কলিযুগ; পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। আরও সূক্ষ্ম করিতে ইহার দশগুণিত মহাযুগের (৪৩২০০০০) কল্পনা হইয়াছিল। এই কলিযুগ ও মহাযুগ ব্যবহারিক নয়; গণিতের নিমিত্ত কল্পিত। অর্থাৎ যুগ ও মহাযুগ ঐ ঐ সংখ্যার দ্যোতক মাত্র। ঋগ্‌বেদের অক্ষরসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র-বৃহতী; অর্থাৎ ১২০০০ × ৩৬ = ৪৩২০০০। এই সংখ্যা কলিযুগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। ইহার দশগুণে এক মহাযুগ। ইহার পরিমাণ, "সূর্যসিদ্ধান্তে"র ভাষায়,—

খচতুষ্করদার্ণবাঃ।

খ = ০, খচতুষ্ক = ০০০০, রদ = ৩২, অর্ণব = ৪। বামাগতিতে ৪৩২০০০০ বৎসর। উৎপল ভট্ট "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে লিখিয়াছেন,—

খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ *

* শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের উদ্ধৃত পাঠ। বোধ হয়, কোন পুথী হইতে, শ্রীযুত দত্ত এই শ্লোকটি তুলিয়াছেন,

চতুর্যুগে বা মহাযুগে নক্ষত্র ১৫৮২২৩৭৮০০ বার ঘোরে। এখন অঙ্ক করিয়া লও, বৎসরে কতবার।

৮। আঙ্কিক শব্দ সংগ্রহ

বোধ হয়, পূর্ব্বে আঙ্কিক কোশ ছিল। নইলে সকলে সঙ্কেত বুঝিতে পারিত না। দুইটা ছোট কোশ ছাপা হইয়াছে। পরে একটার উল্লেখ করা যাইবে। "ভারতবর্ষ" পত্রের ১ম বর্ষের ২য় খণ্ডের ৫ম সংখ্যায় শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ "বহু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ, দানপত্র, শিলালিপি, প্রাচীন কাব্য প্রভৃতি হইতে সাঙ্কেতিক শব্দগুলি সংগ্রহ" করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সমাহর্ত্তা বঙ্গদেশে আর একটি দেখিতে পাই না। যদি তিনি আকর ধরিয়া শব্দগুলির পৃথক্ পৃথক্ তালিকা দিতেন, তাহা হইলে আমাদের উপস্থিত বিচারে বিশেষ সুবিধা হইত। তালিকাগুলি কালানুসারী করিতে পারিলে সেগুলি ঐতিহাসিক বীজপুট হইত। দুঃখের বিষয়, তিনি ইতিহাসের দিক্ লক্ষ্য করেন নাই। আমি এখানে জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ, দেশ ও কালানুসারে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি তালিকা একত্র করিতেছি। তালিকাগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

১ম তালিকা বরাহ-মিহির-কৃত "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" হইতে। ইহার দেশ উজ্জয়িনী, কাল ৪২৭ শক।

২য় তালিকা প্রচলিত "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" হইতে। ইহার দেশ অজ্ঞাত, কাল শকের দশম শতাব্দ অনুমান করা হইয়া থাকে।

৩য় তালিকা শতানন্দের "ভাস্বতী" হইতে। ইহার দেশ পুরী (ওড্র), কাল ১০২১ শক।

৪র্থ তালিকা গণেশ দৈবজ্ঞ-কৃত "গ্রহলাঘব" হইতে। ইহার দেশ বোম্বাই, কাল ১৪৪২ শক।

৫ম তালিকা রাঢ় দেশের তিনখানি করণ হইতে। দেশ রাঢ়, কাল ১৪৫০ শক হইতে ১৫৭৯ শক। একখানি বর্দ্ধমানে রচিত "জাতকার্ণব", ১৪৫০ শক। গ্রন্থকারের নাম নাই, উপাধি "বরাহমিহিরাচার্য"। দ্বিতীয়খানি বর্দ্ধমান ও কালনা, এই দুয়ের মধ্যে রাঢ়ে রাঘবানন্দকৃত "সিদ্ধান্তরহস্য", ১৫১৩ শক। তৃতীয়খানি বিষ্ণুপুরে মুকুন্দদাসকৃত "গ্রহণাটবী", ১৫৭৯ শক। এই পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। *

৬ষ্ঠ তালিকা চন্দ্রশেখর সিংহকৃত "সিদ্ধান্তদর্পণ" হইতে। ইহার দেশ পুরী, কাল ১৮১৪ শক।

৭ম অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু।

৮ম "কবিকল্পলতা"র সংখ্যাবাচক।

এখন তালিকাগুলি দেখি। প্রত্যেক তালিকায় দেখা যাইবে, কতকগুলি শব্দ চাপের

কিন্তু 'রাত্রিপাঃ' স্থানে 'রাত্রয়ঃ' পাইয়াছেন। এটি পাঠের ভুল; রাত্রিপা নিশাপতি হইবে। প স্থানে য, এবং য স্থানে প পাঠ ভুলের অনেক উদাহরণ আছে। সংস্কৃত 'কুণপ' ও 'কুণয়', দুইটা শব্দে চমৎকার ভ্রম ঘটিয়াছিল।

* রাঢ়ের এই দেশ ও করণ সম্বন্ধে আলোচনা ১৩৩৬ সালের ফাল্গুনের "ভারতবর্ষে" দ্রষ্টব্য।

মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি আঙ্কিক সংজ্ঞার পর্য্যায় শব্দ। যেমন 'নেত্র' একটি সংজ্ঞা, অর্থ দুই। 'নেত্র' পরিবর্ত্তে দৃক্, লোচন, নয়ন ইত্যাদি বলি; সংজ্ঞার অর্থ দুই। অনেক স্থলে প্রতিশব্দ দ্বারা সংজ্ঞা বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণে এখানে প্রতিশব্দও দেওয়া গিয়াছে।

(১) দেখা যায়, দেশভেদে কিম্বা কালবৃদ্ধিতে সংজ্ঞা বৃদ্ধি অল্পই হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্যোতিষীরা সংজ্ঞার অর্থ একই রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে সংজ্ঞাবৃদ্ধি এবং সংজ্ঞার অর্থান্তর হইয়াছে। কিন্তু সে কালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, এক দেশের সহিত অন্য দেশের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু পারম্পর্য লুপ্ত হয় নাই।

(২) পঞ্চসিদ্ধান্তিকার কয়েকটি সংজ্ঞা পরে অপ্রচলিত হইয়াছিল। যথা, স্বর্গতি, নরক = ৯ ; শম্ভু = ১২। এই সময়ে গো = ৯, ভ = ২৭ আসে নাই।

(৩) "সূর্য্য-সিদ্ধান্তে"র কুত্রাপি রাম = ৩, নন্দ = ৯, জিন বা সিদ্ধ = ২৪ নাই। এই সিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীও আশ্চর্য হইয়াছেন। ভূপ = ১৬ নাই। আমরা প্রচলিত সূর্য-সিদ্ধান্তের কতিপয় অংশ দেখিয়া মনে করি, ইহা শকের দশম শতাব্দে সংশোধিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বরাহের সময়ে যে সংজ্ঞা চলিতেছিল, সে সংজ্ঞা সূর্যসিদ্ধান্তে নাই। অতএব অনুমান হয়, এই সিদ্ধান্তেব অধিকাংশ বরাহের বহু পূর্ব্বের। তখন তিন রাম, নব নন্দ, ষোল ভূপ খ্যাত হয় নাই। বরাহ ও সূর্যসিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তে নাই। ভাস্করাচার্য দেখা হইল না; বোধ হয় তাহাতেও নূতন সংজ্ঞা নাই।

(৪) "ভাস্বতী"তে অঙ্গ, তর্ক, অরি = ৬, মঙ্গল = ৮, গ্রহ = ৯, ঘন (জলদ) = ১৭, মরুৎ ও তান = ৪৯। পরবর্ত্তী কালের রাঢ়ের গ্রন্থেও এই সকল সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গল = ৮ কেবল রঘুনন্দনে পাইয়াছি। গন্ধর্ব শব্দের এক অর্থ অশ্ব, অশ্ব = ৭। ভাস্বতী, অশ্ব বা তুরঙ্গম না বলিয়া গন্ধর্ব বলিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ে গন্ধর্ব চলে নাই, আর অন্য পুস্তকেও পাই নাই।

(৫) "গ্রহলাঘবে" মরুৎ = ৫, স্বর্গ = ২১ হইয়াছে।

(৬) রাঢ়ের তিনখানি গ্রন্থের আঙ্কিক শব্দের বিশেষ আছে। ইহাতে মনে হয়, এক একখানি এক এক স্থানে প্রচারিত ছিল। "জাতকার্ণবে" মাস = ১২, লোক বা ভূত = ১৪, মৈত্র = ১৭, সমিধ্ = ২১ হইয়াছে। মৈত্র = ১৭ শ্রীনিবাসের "দীপিকা"য় আছে। "গ্রহণাটবী"তে আত্মা = ৫; পুরাণ, কোষ, আকাশ = ১৮ হইয়াছে। "জাতি" = ২২ আসিয়াছে। "সিদ্ধান্তরহস্যে" এমন নূতন সংজ্ঞা পাই নাই। দেখা যাইতেছে, ফল জ্যোতিষীরা গাণিতিক ও পৌরাণিক সংজ্ঞার প্রভেদ করিতেন না।

(৮) "সিদ্ধান্তদর্পণ" বৃহৎ গ্রন্থ, নানা বড় বড় ছন্দে রচিত। এই কারণে ইহাতে বহু প্রতিশব্দ আসিয়াছে। 'স্তম্বেরম' যে 'গজ, পৃষৎক' যে বাণ, তাহা বুঝিতে অমরকোষ কণ্ঠস্থ রাখা চাই। ইহাতে কয়েকটি প্রাচীন সংজ্ঞা আসিয়াছে।

(৯) "জ্যোতিঃশাস্ত্রনিঘণ্টু" পুস্তিকায় "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু" আছে। কর্ণাটক লিপি হইতে নাগরাক্ষরে বোম্বাইতে "লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর" মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (শক ১৮১৮)।

ইহাতে মাত্র দশটি শ্লোক আছে। ফল-জ্যোতিষীর নিমিত্ত সঙ্কলিত, বোধ হয় চতুর্দ্দশ শত শকের পরে। কিন্তু আশ্চর্য এই, ইহাতে 'যম' = ১, কিন্তু রূপ = ১ নাই। ব্রহ্মা = ৯। ক-ট-প-য আদি অক্ষরসংজ্ঞা আছে। ১৩৩৬ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় শ্রীযুত দত্ত ক-ট-প-য আদি বুঝাইয়াছেন। কোন কোন সংজ্ঞায় এই নিঘণ্টু "কবিকল্পলতা"র তুল্য। যেমন শিবনেত্র, পুর, লোক, ত্রিকাল = ৩ ; আবার ঋতুবাচক কাল = ৬, রুচি = ৬, কোশ = ৬, দ্বীপ = ৭।

৯। আঙ্কিক শব্দের উপপত্তি

শ্রীযুত দত্ত কয়েকটি শব্দের উপপত্তি দিয়াছেন। শাব্দিকের নিকট এক এক শব্দ ইতিহাসের বীজপুট। কিন্তু পরিভাষা-কর্ত্তার মনের কথা বাহির করা সহজ নয়। শ্রীযুত দত্ত লিখিয়াছেন, "১ সংখ্যা বিবক্ষার্থ মহাভারতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ বা যম শব্দ ব্যবহার আছে।" তাহা হইলে এই সকল নাম সাঙ্কেতিক বোধ হয় না, 'এক' বিবক্ষা উপচারিক হইবে। আরও যে সকল শব্দ আছে, সে সকল একত্র করিতে পারিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইত। যদি উপচারিক না হয়, তাহা হইলে মহাভারতের সে সে অংশ বহু প্রাচীন।*

শ্রীযুত দত্ত মনে করিয়াছেন, 'অক্ষ' পাশা হইতে অক্ষ = ৫। অতএব কোন কালে পাঁচখানি পাশাতে অক্ষক্রীড়া হইত। আমার বিবেচনায় তিনি দূরবিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই শব্দের মধ্যে চমৎকার ইতিহাস আছে। একটু উদ্ঘাটন করি।

অমর-কোষের নানার্থবর্গে,—

—অথাক্ষমিন্দ্রিয়ে।
না দ্যূতাঙ্গে কর্ষে চক্রে ব্যবহারে কলিদ্রুমে॥

এখানে পাইতেছি, অক্ষং ইন্দ্রিয়, অক্ষঃ দ্যূতাঙ্গ পাশক ও দ্যূতক্রীড়া ; কর্ষ (১৬ মাষা = ¼পল) ; চক্র ; ব্যবহার (আয়-ব্যয়-চিন্তা) ; কলিদ্রুম (বিভীতক বা বহেড়াগাছ)। অমর-কোষে অক্ষ শব্দের আর এক অর্থ, সৌবর্চ্চল লবণ (সোরা)। পরে অক্ষ শব্দের আরও দুই একটি অর্থ হইয়াছে। যথা, রথাঙ্গ (অখা), আধার ইত্যাদি।

অক্ষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বয়ড়া গাছ যেখানে হয়, সেখানে অনেক হয়। যদিও এই লক্ষণ কেবল বয়ড়া গাছে নয়। বয়ড়া গাছ আরণ্য, কেবল রাজপুতানা ও সিন্ধুর

* মূল মহাভারত বহু প্রাচীন। ব্যাস "ভারত-সংহিতা" লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ২৪০০০ শ্লোক ছিল। এখন সেটি মহা-ভারত, শ্লোকসংখ্যায় চতুর্গুণ। পাণ্ডবদিগের কিছু পরে মূল রচিত হইয়াছিল। তার পর গ্রন্থ-কলেবর পুষ্ট হইতে হইতে বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। একমতে এই যুদ্ধকাল হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং যুধিষ্ঠিরাব্দ মিথ্যা নয়। ইহার আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। অন্য মতে প্রায় বার-শত বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন দ্বিতীয় মত প্রবল হইতেছে। ঠিক বারশত বৎসর প্রভেদ দ্বারা সন্দেহ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দের রচনা হইলেও মহাভারতে বহু বহু পুরাতন কথা আছে। অন্ততঃ ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই আকার পাইয়াছিল। ইহাতে অশ্বিন্যাদি গণনার পূর্ব্বের কথা আছে, পরের নাই। অশ্বিন্যাদি গণনা খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দের পরে হইয়াছে, পূর্ব্বে হইতে পারে নাই। ইহা হইতে শঙ্কর-বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতের বর্ত্তমান সংস্করণ ঐ সময়ের। এটি কিন্তু জ্যোতিষিক মর্য্যাদা। ইহার পরে অ-জ্যোতিষিক বিষয় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক বোধ হয় না।

মরুদেশে নাই। বয়ড়ার এক নাম কর্ষ; গাছের নাম কর্ষফল। বোধ হয়, প্রথম প্রথম একটা বয়ড়ার ওজনে এক কর্ষ ধরা হইত (তুলং গুঞ্জা, মাষক ইত্যাদি)। গাছের আর এক নাম কলিদ্রুম। কলির কি-না কলহের। বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের কালে বয়ড়া লইয়া দ্যূত (জুয়া) খেলা হইত। বয়ড়ার নাম যখন অক্ষ, তখন অক্ষক্রীড়া অর্থে জুয়াখেলা হইয়া গেল। নানা দ্রব্য দিয়া জুয়া-খেলা হইতে পারে। কড়ী দিয়া খেলা সকলেই জানেন। চারিটা কিংবা আটটা কড়ী দিয়া অষ্টা-কোষ্ঠী খেলা হয়। পণ রাখিয়া জয়-পরাজয় মাত্রেই দ্যূত। চতুরঙ্গ খেলাও দ্যূতক্রীড়া। বয়ড়া গাছের কাঠ তেমন দৃঢ় নয়, কিন্তু এখনও কোথাও কোথাও বয়ড়া গাছের কাঠে গাড়ীর চাকা ও অক্ষ (অখা) নির্ম্মিত হয় (তুলং স্যন্দন-অর্থে স্যন্দন বৃক্ষ ও রথ)। গাড়ীর অখার সাদৃশ্যে সোরার দানা এবং আধার ও দাঁড়ী-পাল্লার দাঁড়ী অর্থ আসিল। দ্যূতক্রীড়া হইতে কলহ ও ব্যবহার। তখন অক্ষদর্শক অর্থে ব্যবহার-বিচারক; অক্ষপটল, অক্ষশালা অর্থে ধর্ম্মাধিকরণ। পক্ব পূর্ণাঙ্গ বয়ড়া-ফল পঞ্চপার্শ্ব, পঞ্চশিরাল, যেন পাঁচটি চোখ রহিয়াছে। ইহা হইতে অক্ষি অর্থে চক্ষুঃ, এবং অক্ষ অর্থে ইন্দ্রিয় হইয়াছে। যখন ইন্দ্রিয়, তখন অক্ষ = ৫।

বেদের কালে বয়ড়া ফল পাটার উপর গড়াইয়া দিয়া অক্ষখেলা হইত, কিন্তু খেলার বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পাশা-খেলা হইতে কৃত = ৪ আসিয়াছে। বোধ হয়, চারিটা বয়ড়া লইয়া খেলা হইত। একটায় এক কড়া, একটায় দুই কড়া, একটায় তিন কড়া, একটায় চারি কড়ার চিহ্ন থাকিত। একের 'দান' পড়িলে কলি, দুইয়ের পড়িলে দ্বাপর, তিনের পড়িলে ত্রেতা, চারির পড়িলে কৃত নাম হইত। বোধ হয়, বয়ড়ার চিহ্ন 'পর্যস্ত' হইয়া পড়িলে 'দান' মনে করা হইত। এই হেতু 'একপরি', 'দ্বিপরি' ইত্যাদি নাম। এখনকার কড়ী খেলায় সেইরূপ। কিন্তু ইহাতে চারি দানই সমান হয়। অতএব হয় ত দশটা বয়ড়া লইয়া খেলা হইত। একটায় এক, দুইটায় দুই, তিনটায় তিন, চারিটায় চারি চিহ্ন থাকিত। এই চারি অক্ষপাতের নাম কল্যাদি; চারি যুগেরও সে নাম। শাম-শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন, বেদের কালে চারি বৎসরে যুগ হইত। প্রতি বৎসর ৩৬৫ দিন, এবং চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিন ধরা হইত। ব্যবহারে ইহাই একমাত্র উপায়। প্রথম বৎসর কলিতে একপাদ, দ্বিতীয় বৎসর দ্বাপরে দুই পাদ, তৃতীয় বৎসর ত্রেতাতে তিন পাদ-বৃদ্ধি, চতুর্থ বৎসর কৃতে চারি পাদ = ৩৬৬ দিন; ইহা হইতে ধর্ম্মের চারি পাদ, এবং পরবর্ত্তী কালের বৃহৎ যুগের কলি একক, দ্বাপর দ্বিগুণ কলি, ত্রেতা ত্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুর্গুণ কলি। কিন্তু প্রথমে অক্ষক্রীড়ার কল্যাদি নাম, কি বৎসরের কল্যাদির নাম, তাহা বলা কঠিন। হয় ত এই কালের সংখ্যাবাচক কল্যাদি হইতে উভয়ের উৎপত্তি।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ আছে। দ্যূতাধ্যক্ষ "কাকণ্যক্ষ" রাখিতেন, অন্য অক্ষ লইয়া কেহ খেলিতে পাইত না। শাম-শাস্ত্রী "কাকণ্যক্ষ" শব্দের ইংরেজীতে অর্থ দিয়াছেন, যে পাশার জোড়া প্রতি এক "কাকণী" ভাড়া লওয়া হইত। তাহা হইলে দুইখানিতে খেলা হইত। এখন দুইখানি কিংবা তিনখানি লইয়া খেলা হয়।*

* "কাকণ্যক্ষ" সরকারী পাশা, ওজন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাকণী নামে মুদ্রা ছিল। কিন্তু এখানে বোধ হয়, সিকি মাষা ওজন, কিংবা কড়ী। সুবর্ণ মাষা হইতে পারে না। রূপ্য-মাষা হইলে আড়াই তোলার সিকি;

পাশা-খেলা হইতে আর একটি আঙ্কিক শব্দ আসিয়াছে। ইহা অষ্টি, ১৬ অঙ্কের বাচক। হয় ত ষোলটা পাশা লইয়া খেলা কিংবা প্রত্যেক পাশার চারি পার্শ্বের অঙ্ক মিলিয়া ১৬ হইবার কথা। ৬, ৫, ৩, ২ = ১৬। কিন্তু বর্ত্তমান পাশায় ৬, ৫, ২, ১ = ১৪ ফোটা থাকে। অষ্টি শব্দ প্রাচীন কোষে নাই। কিন্তু অষ্টি শব্দে পাশা বুঝায়, এবং হয় ত ইহা কোন প্রাকৃত শব্দ। অষ্টি ষোড়শ-অক্ষরযুক্ত এক ছন্দও আছে। ছন্দের নাম অষ্টি শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা নাই। বোধ হয়, প্রাকৃত শব্দ। তাহা হইলে অষ্টি খেলা হইতে ছন্দের নাম।

কিন্তু এই ভাবে যাবতীয় আঙ্কিক শব্দের মূল অন্বেষণ সম্ভবপর কিম্বা একার সাধ্য নয়। প্রাচীন কালের নানা বিদ্যার ও কর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলে মূল পাওয়া যায় না। আমার যত দূর মনে পড়ে, প্রাচীন টীকাকার সংজ্ঞার উপপত্তি দেন নাই। "ভাস্বতীর" টীকায় মাধব-মিশ্র [কান্যকুব্জ, ১৪৪২ শক] লিখিয়াছেন, 'রাশ্যাদীনাং সংজ্ঞা লোকব্যবহারাদবগম্যতে।' কথাটা অবশ্য সত্য। লোকে একটা পাখীকে চটক বলে, কেন বলে, কে জানে? ইদানীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় সুধাকর-দ্বিবেদী সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর তাঁহার "সুধা-বর্ষিণী" টীকায় আঙ্কিক শব্দের উপপত্তি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা যাবৎ-তাবৎ হইয়াছে। পরে উল্লেখ করা যাইবে।

আঙ্কিক সংজ্ঞা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞা গ্রহ-জ্যোতিষী গণিত পরিভাষা করিয়াছিলেন, অপর শ্রেণীর সংজ্ঞা পৌরাণিক কবি সাঙ্কেতিক করিয়াছিলেন। যেমন, অব্ধি, সাগর = ৪, ইহা গাণিতিক পরিভাষা। কিন্তু কবি সপ্তসাগরা ধরিত্রী মনে রাখিয়া সাগর = ৭ ধরিয়াছিলেন। 'সাগর' বলিলে গণিতগ্রন্থে ৪, কবিবাক্যে ৪ কিংবা ৭। আমি "কবি-কল্পলতা" দেখি নাই। "শব্দকল্পদ্রুমে" এই পুস্তক হইতে কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ হয়, শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার "সাঙ্কেতিক শব্দ" সংগ্রহে "কবিকল্পলতা"র সাহায্য লইয়াছিলেন। দেখিতেছি, এই পুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ অনেক আছে। ইচ্ছা করিলে আরও বাড়াইতে পারা যায়।* এখানে 'আঙ্কিক সংজ্ঞা' বলিতে গাণিতিকের পরিভাষা এবং 'কবি-সাঙ্কেতিক' বলিতে কবিভাষার শব্দ ধরা যাইবে। দুই শ্রেণীর শব্দ দুই কোষে দেওয়া যাইবে। কোষে "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"র সংজ্ঞাও দেওয়া যাইবে।

পরে দেখা যাইবে, যে কোন সংজ্ঞা দেখি, মূলতত্ত্ব দ্বিবিধ। (১) কোন পদার্থের যত ভাগ আছে, সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়। যেমন, 'পঙ্ক্তি' ছন্দের প্রতি পাদে দশ অক্ষর আছে। অতএব পঙ্ক্তি = ১০। বোধ হয়, প্রথম প্রথম এই সূত্র ধরিয়া সংখ্যাবাচক শব্দ হইয়াছিল। কিন্তু পঙ্ক্তি বলিলে ৪ × ১০ = ৪০ বুঝাইতেও পারে। বোধ হয়, এই

এক কর্ষের ওজন। তাহা হইলে কি বয়ড়া ফল দিয়া খেলা হইত? "কাকণী" অর্থে ভাড়া মনে হয় না। কারণ, পরে ভাড়ার কথা আছে। "কাকণ্যক্ষারলাশলাকাবক্রয়"—'কাকণ্যক্ষ', অরলা বা আরলা এবং শলাকার ভাড়া। শলাকা বোধ হয় গুটী, এবং অরলা বা আরলা শারি-ফলকের প্রাকৃত নাম। "বাৎস্যায়নে" 'আকর্ষক্রীড়া', পাশকক্রীড়া, কামশাস্ত্রের অন্তর্গত এক বিদ্যা গণ্য হইয়াছে।

* ১৩৩৩ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে বঙ্গীয় কবির সাঙ্কেতিকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আশঙ্কায় এইরূপ শব্দ কালক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (২) একনামের কতকগুলি পদার্থ থাকিলে, প্রত্যেকেই সে নাম প্রযোজ্য। সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়। যেমন, নেত্র। বাম ও দক্ষিণ নেত্র, দুইই নেত্র। অতএব নেত্র = ২। এখানে ভ্রমের আশঙ্কা থাকিল না।

এখানে কবিভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ আলোচনা করিব না। ইহার অধিকাংশ শব্দের উৎপত্তি পুরাণে। কয়েকটার অর্থ দেওয়া গেল, এবং প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটার অর্থ 'আঙ্কিক সংজ্ঞা'র ব্যাখ্যায় জানা যাইবে। এই দুই শ্রেণীর সংজ্ঞা-রচনার তত্ত্বে প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে, রচনার কালে এবং কদাচিৎ অনিশ্চয়তায়।

যে সংজ্ঞা মাত্র একটি গ্রন্থে আছে, তাহা বাহুবেষ্টনে দেওয়া গেল। প্রথমে পূর্ব্বকালাবধি সংজ্ঞা। এই কাল শক দশম শতাব্দ পর্যন্ত। তারপর এক দাঁড়ি দিয়া দশম হইতে চতুর্দ্দশ। তারপর দুই দাঁড়ি দিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দের পর।

০ = বিন্দু, শূন্য ॥ [পূর্ণ]
১ = চন্দ্র, ভূ, রূপ।
২ = পক্ষ, কর, নেত্র, অশ্বিন্, যম।
৩ = অগ্নি, গুণ, রাম।
৪ = বেদ, কৃত, অব্ধি, অঙ্ঘ্রি। যুগ।
৫ = শর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ॥ [মরুৎ], [আত্মা]
৬ = রস, ঋতু। অঙ্গ, তর্ক, অরি।
৭ = অশ্ব, মুনি, স্বর, শৈল।
৮ = বসু, গজ, সর্প। মঙ্গল।
৯ = স্বর্গ, নরক, নন্দ, অঙ্ক, গো, রন্ধ্র। গ্রহ।
১০ = দিক্।
১১ = রুদ্র।
১২ = রবি, [শম্ভু]।
১৩ = বিশ্ব।
১৪ = মনু, ইন্দ্র ॥ লোক।
১৫ = তিথি।
১৬ = অষ্টি, ভূপ।
১৭ = অত্যষ্টি ॥ ঘন।
১৮ = ধৃতি ॥ [পুরাণ, কোষ, আকাশ]
১৯ = অতিধৃতি।
২০ = নখ। কৃতি।
২১ = ॥ স্বর্গ, [সম্বিৎ]
২২ = ॥ আকৃতি, জাতি।
২৩ = ॥ বিকৃতি।

২৪ = জিন।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = । ভ।

৩২ = দন্ত।

৩৩ = সুর।

৪৯ = ।। মরুৎ, [তান]

১০। আঙ্কিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা।

বিন্দু [॰, ০]

শূন্য = ০। বিন্দু, যেমন জলবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র নিরবয়ব; এত ক্ষুদ্র যে, শূন্য মনে হয়। ইহা হইতে বিন্দুর সংজ্ঞা, শূন্য। যদি শূন্য, তাহা হইলে অভাব, অতএব আকাশ, অতএব আকাশের পর্যায়ে খ, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, অনন্ত, গগন, পুষ্কর, বিয়ৎ, বিষ্ণুপদ, অন্তরিক্ষ, মরুৎপথ। "সিদ্ধান্তদর্পণে" 'পূর্ণ' নামও আছে। বোধ হয়, বৃত্তাকার বিন্দুচিহ্ন দেখিয়া এই নাম। ইদানী ছাপার অক্ষরে বিন্দু, শূন্যগর্ভ বৃত্ত হইয়াছে।

এক [১]

চন্দ্র = ১। চন্দ্রের পর্যায়ে অব্জ, ইন্দু, বিধু, শশী, সোম, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, নিশাকর, হিমাংশু, কলানিধি ইত্যাদি।

ভূ = ১। পর্যায়ে কু, ইলা, উর্বী, ক্ষ্মা, ক্ষিতি, ক্ষৌণী, ধরা, ভূমি, অবনি, বসুধা, ইত্যাদি।

রূপ = ১। সুধাকর-দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, 'রূপ্যতে প্রকাশ্যতে যেন তদ্রূপমেকমেব।' স্পষ্ট করিলে, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। কিম্বা পঞ্চ তন্মাত্রের একটি। কোন বস্তুর রূপ একাধিক হইতে পারে না। 'রূপ' সংজ্ঞা বহু প্রাচীন। শ্রীযুত দত্ত এই সংজ্ঞা "বেদাঙ্গজ্যোতিষে" পাইয়াছেন। মহাভারতে ও "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে যম = ১। যম, মৃত্যুর রাজা। "নিঘণ্টু"তে 'একজন', ব্রহ্ম = ১।

দুই [২]

পক্ষ = ২। পক্ষীর দুই পক্ষ হইতে চান্দ্র মাসের দুই পক্ষ, বিবোধের দুই পক্ষ, ইত্যাদি।

কর = ২। বাহু, হস্ত। গ্রহজ্যোতিষে ভুজ, দোঃ শব্দের অন্য অর্থ আছে বলিয়া এই দুই শব্দ 'দুই' অর্থে চলে না। হস্ত অর্থে দৈর্ঘ্য পরিমাণবিশেষ। এ কারণে হস্ত শব্দও 'দুই' অর্থে প্রায় চলে নাই।

অশ্বিন্ = ২। বেদের অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অন্য নাম দস্র, নাসত্য। অশ্বিনীকুমার যমজ ছিলেন। এই হেতু. যম, যমল, যুগ্ম = ২। অশ্বিনী নক্ষত্রের যে দুই তারা একদা উদয় হয়, সে দুই তারা অশ্বিনীকুমার-কাহিনীর মূল। সে অনেক কথা। যম, যমল, যুগ্ম = ২, পৃথক্ সংজ্ঞা মনে করাও চলে। 'মিথুনং যমলং যুগ্মম্।'

নেত্র = ২। পর্যায়ে, অক্ষি, ঈক্ষণ, দৃক্, দৃষ্টি, নয়ন, লোচন।

পুরাণ হইতে নেত্র = ৩। প্রথমে ছিল শিবনেত্র = ৩, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান

মহাবীরাচার্য নবম খ্রীষ্ট শতাব্দে 'হরিনেত্র'=৩ করিয়াছেন। হরি, শিবের এক নাম। গণিতবিদ্যায় নেত্র=৩ কুত্রাপি হয় নাই। বাঙ্গালাতে তিনে নেত্র, শিবনেত্র শব্দের 'শিব' কাটাতে হইয়াছে। বোধ হয়, চতুর্দ্দশ শত শকাব্দের পরে। সুপ্রসবের নিমিত্ত বত্রিশের ঘর পুরণে, 'চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ। পৃষ্ঠে নব করি বুঝহ সন্ধান। যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা। কুম্ভ পদে পদে ভাগ সমাধা।' এখানে নেত্র=৩, সমুদ্র=৭। কুম্ভ, কুম্ভরাশি, একাদশ ঘর। এই শ্লোকের ভাষা ইং চতুর্দ্দশ শতাব্দের পূর্ব্বের বোধ হয় না। রঘুনন্দন সংস্কৃতে শ্লোকটি বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নেত্র শব্দ বসান নাই। ওড়িয়াতেও নেত্র=৩ পাঠশালায় আছে।

কর্ণ=২। 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু'তে।

তিন [৩]

অগ্নি=৩। সুধাকর-দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, 'উদর-বন-সমুদ্র-গতাশ্রয়স্ত্রয়ঃ'। অর্থাৎ উদরে অন্নপাকাগ্নি, দাব, বডবা। দেখিতেছি, তাঁহার অমরকোষও স্মরণ হয় নাই। 'দক্ষিণাগ্নি-র্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা।' বেদের ব্রাহ্মণের তিন শ্রৌত অগ্নি। যজ্ঞবেদীর দক্ষিণস্থিত দক্ষিণ অগ্নি, পশ্চিমস্থিত গার্হপত্য, পূর্বস্থিত আহবনীয় অগ্নি। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের ও আহবনীয়াগ্নিতে দেবতারউদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত। গার্হপত্যাগ্নি গৃহের কুলের অগ্নি, কদাপি নিবিতে দেওয়া হইত না। এই অগ্নিতে যজ্ঞের পুরোডাশ পিষ্টক (বর্ত্তমান কালের আশুকা পিঠা) পাক হইত। দক্ষিণাগ্নিতে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা বেতনস্বরূপ অন্নপাকও হইত। এই হেতু 'দক্ষিণা' অর্থে কর্মের বেতন হইয়াছে। অগ্নি নিত্য প্রয়োজনীয়। কাজেই অনেক পর্যায় শব্দ আছে। যথা, বৈশ্বানর, বহ্নি, বীতিহোত্র (সংক্ষেপে হোত্র), শিখিন্, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, অনল, দহন, পাবক, কৃশানু,বায়ুসখ, হুতভুক্, বর্হিস্, কৃষ্ণবর্ত্মন্, জাতবেদস্, ইত্যাদি শব্দ তিন সংখ্যাবাচক হইয়াছে।

গুণ=৩। সত্ত্ব, রজস্, তমস্। সৃষ্টির মধ্যে যত গুণ লক্ষ্য করি, এই তিনের অন্তর্গত হইবেই। এত বড় একটা সত্য, ভূ-ভারত ছাড়া আর কোথাও জানা ছিল না।

রাম=৩। পরশুধর রাম, ধনুর্দ্ধর রাম, হলধর রাম। তিন প্রহরণ দ্বারা তিন রাম পৃথক্ হইয়াছেন।

"অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে শঙ্করাক্ষি [শিবনেত্র], পুর [ময়-নির্মিত ত্রি-পুর], লোক [স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল], কাল [ত্রিকাল]=৩।

চারি [৪]

কৃত=৪। পূর্বে বলা গিয়াছে। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, কৃতং সুকৃতং সাধন-চতুষ্টয়ম্। এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। অন্যত্র লিখিয়াছেন, কৃত কি-না সত্যযুগ, সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল, চতুষ্পাদ হইতে কৃত=৪। এই ব্যাখ্যাও ঠিক নয়।

অব্ধি=৪। অপ্‌ধি, উদধি, জলধি, নীরধি, বারিধি, বার্ধি, বনরাশি, সাগর=৪, বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্বাদি চারি দিকে চারি সাগর। কিন্তু বেদের সমুদ্র আকাশে। বরাহ, লবণোদ=৪ গণিয়াছেন। শ্রাদ্ধে দানসাগরের মধ্যে চতুঃসাগরী আছে। সাগরের পর্যায়ে আরও শব্দ আছে,—সমুদ্র, অর্ণব, সিন্ধু, জলনিধি ইত্যাদি।

পৌরাণিক, জম্বুদ্বীপকে (ভূগোলের উত্তর গোলার্দ্ধ) পরে পরে সাতটি সমুদ্রে বেষ্টিত মনে করিতেন। এখানে দ্রষ্টব্য, এই সপ্ত সমুদ্র চারি দিকে নয়, বৃত্তাকারে অবস্থিত। সুতরাং চতুঃসাগর ও সপ্ত সাগরের কল্পনায় প্রভেদ আছে। বস্তুতঃ সপ্ত সমুদ্র ভূ-পরিবেষ্টক নহে, খণ্ড। পূর্ব্বকালে সাগর=৪ ছিল, বায়ুপুরাণে এবং কবি কালিদাসও রঘুবংশে চারি গণিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় কেহ ৪, কেহ ৭ গণিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিনেত্রের সময় হইতে এই দ্ব্যর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গণিতে সর্ব্বত্র ৪।

বেদ=৪। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বন্। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত অথর্ব্বন্ ত্রয়ীমধ্যে গণ্য হয় নাই। কৌটিল্য, মনু, অমরকোষ, কামন্দক, ত্রয়ী তিন বিদ্যা ধরিয়াছেন। বরাহে বেদ=৪। বেদের পর্য্যায়ে শ্রুতি, আম্নায়, নিগম, চারিসংজ্ঞাজ্ঞাপক হইয়াছে।

যুগ=৪। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। মহাভারতে কলিযুগ এক সহস্র বৎসর, ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা, চতুর্গুণ কৃত। চারি যুগে ১০,০০০বৎসর। সন্ধ্যাংশ ধরিয়া কদাচিৎ ১২,০০০ বৎসর। প্রাচীন পুরাণেও তাই। "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে গতি (আশ্রম)=৪। অঙ্ঘ্রি=৪, মাত্র বরাহে এই সংজ্ঞা। পাদ, চরণ,=$\frac{1}{4}$।

পাঁচ [৫]

শর=৫। কন্দর্পের সম্মোহনাদি পঞ্চ শর। শরের পর্য্যায়ে, খগ, ইষু,মার্গণ, আশুগ, সায়ক, পত্রিন্, কলম্ব, পৃষৎক, বাণ। ক্রমে শিলীমুখ, বিশিখ, নারাচ। এই তিন নাম বাণবিশেষের হইলেও বাণ। কন্দর্পের বাণ ছিল না, শর ছিল। শরবিশেষের নাম বাণ। এই ভেদ পরে অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

ইন্দ্রিয়=৫। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। অক্ষ শব্দের এক অর্থ, ইন্দ্রিয়। ইহা হইতে অক্ষ=৫।

বিষয়=৫। রূপরসাদি পঞ্চ বিষয়। বিষয়, ইন্দ্রিয়ার্থ। ইন্দ্রিয় কাটিয়া দিয়া অর্থ=৫।

ভূত=৫। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত। ভূত সংজ্ঞা বরাহে পাই, পরে গণিতশাস্ত্রে চলে নাই। বোধ হয়, পঞ্চশর পর্য্যায় পর্য্যাপ্ত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ মরুৎ, পঞ্চ আত্মা ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এই এই সংজ্ঞা চলে নাই। বাঙ্গালা পাঠশালায় পঞ্চ বাণ, ওড়িয়া পাঠশালায় পঞ্চ বট। বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, উদুম্বর,—বটবর্গের এই চারি বৃক্ষ বাস্তুর চারি দিকে রোপিত হইত। কিন্তু পঞ্চবটী হইতে পঞ্চবট,—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী, অশোক। মধ্যভারতের দণ্ডকারণ্যে এই পাঁচ বৃক্ষ অনেক দেখিয়া সে বনপ্রদেশাংশের নাম পঞ্চবটী হইয়াছিল। কিন্তু বহু পঞ্চক ছিল। পঞ্চ-অগ্নি, পঞ্চ-অঙ্গ, পঞ্চ-অমৃত, পঞ্চ-গব্য, পঞ্চ-নদ, পঞ্চ-যজ্ঞ, পঞ্চ-রত্ন, ইত্যাদি। কবিভাষায় কয়েকটি চলিয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদেও অনেক পঞ্চক আছে। যথা, পঞ্চ-লবণ, পঞ্চ-লোহক, পঞ্চ বল্কল, ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের 'রস' ব্যতীত একটা সংজ্ঞাও চলে নাই।

"অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে 'প-আদি' অক্ষরসংজ্ঞা=৫।

ছয় [৬]

রস=৬। মধুরাদি ষড়্‌রস প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের রসবিভাগ। "নিঘণ্টু"তে পর্য্যায়ে, রুচি।

ঋতু = ৬। বসন্তাদি ষড়্ ঋতু। বেদের কালে আদ্য ঋতু শরৎ। পরে শিশির গণ্য হইত। পরবর্ত্তী কালে ঋতু অর্থে কাল বুঝিয়া কেহ কেহ কাল = ৬ গণিয়াছেন, কিন্তু চলে নাই।

অঙ্গ = ৬। বেদের শিক্ষাকল্পব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ।

তর্ক = ৬। ষড়্-দর্শন শাস্ত্র।

অরি = ৬। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু।

"নিঘণ্টু"তে কোশ = ৬। বোধ হয়, যে ছয়খানি ষট্-কোশ নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হেমচন্দ্র ও হলায়ুধ আছে। অতএব এই "নিঘণ্টু"তে অর্ব্বাচীন কালের সংজ্ঞা আছে।

সাত [৭]

শৈল = ৭। ভারতবর্ষের সাতটি প্রধান পর্ব্বত। এই হেতু নাম কুল-অচল। যথা, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র বা পারিপাত্র। হিমালয় এবং তদন্তর্গত পর্ব্বত সপ্ত-কুলাচলের বাহিরে। অচল পর্যায়ে, অগ, নগ, মহীধর, মহীধ্র, শিখরিন্, ক্ষ্মাভৃৎ, পর্ব্বত, অদ্রি, গিরি, গ্রাবন্, গোত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অগ, নগ, অদ্রি ও শৈল, অধিক প্রচলিত।

অশ্ব = ৭। বেদের কালের সপ্তাশ্ব (সূর্য)। সপ্তাশ্ব না-কি সপ্ত রশ্মি। এই হেতু অর্চিস্ = ৭। অশ্বপর্যায়ে, তুরঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, বাজিন্, গন্ধর্ব্ব, হয়। কেহ কেহ অগ্নি-শিখাকে অর্চিস্ মনে করেন। অগ্নি সপ্তজিহ্ব, সপ্তাশ্ব সূর্য্য হইতে।

মুনি = ৭। প্রকৃত নাম ঋষি, কিন্তু মুনি নামেই সংজ্ঞা হইয়াছে। যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ। ইহাঁরা আদি কালের সপ্ত ঋষি। ইহাঁদের নামে সপ্তর্ষি নক্ষত্র। মন্বন্তর ভেদে অন্য ঋষি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্বন্তর, বৈবস্বত। এই মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ। ইহাঁরা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বস্তুতঃ বৈবস্বত মন্বন্তর বহুকাল গত হইয়াছে।

স্বর = ৭। তন্ত্রী ও কণ্ঠ-উত্থিত সপ্ত স্বর। যথা, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।

"নিঘণ্টু"তে দ্বীপ, বায়ু [প্রবহাদি] = ৭। 'মহীন্দ্র', সপ্ত মহীধ্র [পর্ব্বত], না সপ্ত মহীপাল? একটা শ্লোকে আছে,—

লোকানদ্রীন্ স্বরান্ ধাতূন্ মুনীন্ দ্বীপান্ গ্রহানপি।
সমিধঃ সপ্তসংখ্যাতাঃ সপ্তজিহ্বা হবির্ভুজঃ॥

লোক, অদ্রি, স্বর, ধাতু, মুনি, দ্বীপ, গ্রহ, সমিধ্, এবং অগ্নির জিহ্বা ৭টি।

আট [৮]

বসু = ৮। যথা, আপ (বা অহ), ধ্রুব, সোম, ধর (বা ধব), অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস। অষ্ট বসু দেবযোনিবিশেষ, এবং দেবতার এক গণ বা সংঘ। ইহাঁরা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে স্থান লাভ করিয়াছেন। অমরকোষে—

আদিত্যা বিশ্ববসবস্তুষিতা ভাস্বরানিলাঃ।
মহারাজিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ॥

ইহার টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, ইহাঁরা সংঘচারী। আদিত্য দ্বাদশ, বিশ্বেদেব ত্রয়োদশ, বসু অষ্ট, তুষিত ষট্‌ত্রিংশৎ, আভাস্বর চতুঃষষ্টি, অনিল একোনপঞ্চাশৎ, মহারাজিক দ্বিশত-ষট্‌ত্রিংশৎ, সাধ্য দ্বাদশ, রুদ্র একাদশ। তুষিতাদির সংখ্যা বৌদ্ধ পাতঞ্জল পুরাণাদি দৃষ্টে। ইহাঁরা দেবযোনি কি-না দেবাংশ। এই সকল 'গণ' হইতে অঙ্কসংজ্ঞা হইয়াছিল।

গজ=৮। আট দিকের আট দিগ্‌গজ। পূর্ব্বাদি চারি দিক্, ঈশানাদি চারি বিদিক্ যোগে আট দিক্। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক,—পূর্ব্বাদিক্রমে দিগ্‌গজ। দেহের বর্ণ অনুসারে নাম। পৌরাণিক কল্পনায় ইহারা অষ্ট দিক্ ধারণ করিয়া আছে। বস্তুতঃ মেঘকে গজ কল্পনা করিয়া আট দিকের আট মেঘ, আট গজ। রামায়ণে, দিঙ্‌নাগ চারি—ঐরাবত, বামন, অঞ্জন ও পদ্ম। সার্ব্বভৌম ও পদ্ম এক। কোন কোন পুরাণেও চারি দিগ্‌গজ। গজ পর্য্যায়ে, দন্তী, হস্তী, দ্বিপ, মতঙ্গজ, মাতঙ্গ, নাগ, কুঞ্জর, সিন্ধুর, বারণ, করী, ইভ, সামজ, স্তম্বেরম ইত্যাদি।

সর্প=৮। অনন্তাদি সর্প, কশ্যপ ও কদ্রুর বংশ, অবশ্য দেবযোনি। মনুষ্যাকার, কিন্তু ফণা ও লাঙ্গুলযুক্ত। একটা শ্লোকে আছে,—

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো অষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই অষ্ট নাগের মধ্যে অনন্ত নাগে হরি শয়ন করিয়া আছেন। এই হেতু ইহার নাম শেষ নাগ। ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, 'শেতে হরিরস্মিন্ শিষ্যতে বা'। এটি চক্রাকার রবি-পথ। পৌরাণিক কল্পনায় বাসুকির মাথায় পৃথ্বী স্থাপিত আছে। এটিও রূপক। বসুক-অপত্য, বাসুকি। ক্ষীরস্বামী (বসুক শব্দে) বলেন, 'বসত্যস্মিংস্তেজো বসুকঃ', ইহাতে তেজঃ বাস করে। অর্থাৎ বাসুকি সেই তেজঃ, যাহার গুণে ধরিত্রী শূন্যে স্থিত হইয়াছে। অন্য ছয় নাগ, ভূতলের বা পাতালের প্রধান নাগ জাতি। যেমন, শঙ্খ পদ্ম। সর্পপর্য্যায়ে, অহি, নাগ ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, উরগ, পন্নগ, জিহ্মগ, ব্যাল, ফণী, বিলেশয়, আশীবিষ ইত্যাদি। নাগ অর্থে হস্তী ও সর্প; কারণ, উভয়েই নগে পর্ব্বতে থাকে। উভয়েই ৮টি হওয়াতে ভ্রমের আশঙ্কা নাই।

মঙ্গল=৮। এটি পরবর্ত্তী কালের আচার-পদ্ধতির অষ্ট মঙ্গলদ্রব্য। কিন্তু গণে ভেদ আছে।

"নিঘণ্টু"তে দিক্‌পাল=৮, গজকর্ণী [শিব, শিবমূর্ত্তি]=৮, য-আদি=৮।

নয় [৯]

নরক=৯। এই সংজ্ঞা কেবল বরাহে আছে। মনুতে নরক=২১। হেমচন্দ্রকোষে নরক সাত। বোধ হয়, তাহার তিন গুণ মনুতে। নরক গণনার স্থিরতা ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্বর্গ সাতটি। "কবিকল্পলতায়" স্বর্গ=৫, অতএব নরকও=৫।

স্বর্গতি=৯। স্বর্গতি কি-না স্বর্গে গমন, দুর্গতির বিপরীত। দুর্গতি নয়টি হইলে স্বর্গতিও নয়টি। এই গণনার মূল জানি না। সংজ্ঞাটি মাত্র বরাহে আছে।

গো=৯। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, পুরাণের নন্দিনী-আদি নয়টি গাভী; কিন্তু নন্দিনীর বংশ প্রসিদ্ধ হয় নাই, কেহ মনে রাখে না। অমরকোষে গো শব্দের দশটি অর্থ আছে। তন্মধ্যে

একটি, স্বর্গ। অপর নয়টি অর্থ হইতে নয় সংখ্যা পাইবার জো নাই। এই হেতু গো অর্থে স্বর্গ ধরিতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাহের স্বর্গতি। গো শব্দ হ্রস্ব; এই হেতু ইহা প্রচলিত ও স্বর্গতি অপ্রচলিত হইয়াছে।

নন্দ — ৯। মগধের নন্দ নামে নয় রাজা। মহানন্দী মগধের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা। ইহাঁর শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত মহাপদ্মনন্দ, অপর নাম মহানন্দ, দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। ইহাঁর পরের আট জন নন্দ-রাজা বিখ্যাত হন নাই। পুরাণমতে নয়জন নন্দ ১০০ বৎসর, জৈন-বৌদ্ধ মতে ৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩১২ সালে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে নন্দ-সংজ্ঞা নাই।

অঙ্ক — ৯। এক দুই……নয় সংখ্যার চিহ্ন বা লাঞ্ছন। বিন্দু, বিন্দুমাত্র, শূন্য বলিলেও চলে, যদিও অঙ্কের পৃষ্ঠে বসিলে তাহার শক্তি দশগুণ বাড়ে। অঙ্কের পর্য্যায় নাই। কারণ, অঙ্ক পারিভাষিক। বরাহে অঙ্ক-সংজ্ঞা নাই।

রন্ধ্র — ৯। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, "প্রাণিনাম্ শ্রণাদয়ো নব রন্ধ্রাণি। 'নব গোপ্যানি যত্নতঃ' ইতি নীতিশাস্ত্রে।" এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। নীতিশাস্ত্রে আরও কত উপদেশ আছে। একটাও আঙ্কিক সংজ্ঞা হয় নাই। কবিভাষায় দুই একটা হইয়াছিল। রন্ধ্র শব্দের অর্থ, ছিদ্র, বিবর, সুষি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ছিদ্র = ৯ আছে। দেহের নবদ্বার হইতে রন্ধ্র — ৯। দ্বিবেদীও এক স্থানে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "কবিকল্পলতায়" নাম "অঙ্গদ্বার" ঠিকই হইয়াছে।

"বৃহজ্জাতকে" ও ফলজ্যোতিষে লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহের নাম রন্ধ্র। এখানে দ্রষ্টব্য, "অষ্টম" গৃহের নাম রন্ধ্র। অষ্টম গৃহে নিধন, পাপ, রোগচিন্তা করিবে। অমরকোষে রন্ধ্র শব্দের এক অর্থ নির্ব্যথন, দারুণ ব্যথা। এই অর্থ হইতে অষ্টম গৃহের নাম রন্ধ্র। ইহার সহিত দ্বার কিংবা ছিদ্রের সংখ্যার সম্বন্ধ নাই। জাতকগণনায় যেমন আদ্যগৃহে দেহ, দ্বিতীয় গৃহে কুটুম্ব, তেমন অষ্টম গৃহে নিধন। 'রন্ধ্রগত শনি'—অষ্টম গৃহগত। এইরূপ কুটুম্বগৃহ, দ্বিতীয়গৃহ। রন্ধ্র — ০, কষ্ট-কল্পনায় আসিতে পারে, কিন্তু পাই নাই। রন্ধ্রের পরিধি আছে, শূন্যের নাই।

গ্রহ — ৯। পরবর্ত্তী কালে এই সংজ্ঞা কবিভাষায় আসিয়াছিল। পরে জ্যোতিষগ্রন্থেও প্রবেশ করিয়াছিল। তখন পর্য্যায়ে খ-গ, খ-চর, খে-চর। ভাস্বতীতে [১০২১ শক] গ্রহ — ৯, প্রথম দেখিতেছি। কবিভাষায় গ্রহ নয়টি বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিতেছিল। নবগ্রহের রূপ-কল্পনা ও শান্তির বিধান ছিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা সপ্তগ্রহ মানিতেন।

"নিঘণ্ট"তে রত্ন — ৯, খণ্ড [ভারতবর্ষের নবভেদ] — ৯, নিধি [কুবেরের নব নিধি] — ৯। কুবেরের শঙ্খপদ্মাদি নবনিধি, নববিধ ধন। কিন্তু কমলাসন ব্রহ্মা = ৯ কেন হইল? "শব্দকল্পদ্রুমে" 'নব ব্রহ্মাণো যথা, ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা। মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্। নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥ ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।' কিন্তু ইহাঁরা ব্রহ্মার মানস পুত্র, কমলাসন নহেন। আর এক শব্দ, লব্ধক — ৯, জৈনমতে। ক-আদি — ৯, ট-আদি — ৯, কটপয-আদি সংজ্ঞা হইতে।

দশ (১০)

দিক্—১০। পূর্ব্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈঋ‌র্ত পশ্চিম বায়ু উত্তর ঈশান, এবং উর্দ্ধ অধঃ। পর্য্যায়ে, আশা, কাষ্ঠা, ককুভ, হরিৎ। "সিদ্ধান্তদর্পণে" হরিৎ আসিয়াছে।

পঙ্‌ক্তি—১০। একটি ছন্দের নাম, প্রতি পাদে ১০ অক্ষর। এই সংজ্ঞা প্রাচীন। পরে ছিল না।

এগার (১১)

রুদ্র—১১। বেদের কালের গণদেবতা রুদ্র, একগণ বা সঙ্ঘ। অমরকোষের সময়েও রুদ্র গণদেবতা। রুদ্রের কর্ম্ম দেখিয়া পরে ইনি শূলী, শর্ব্ব, ঈশ, ঈশান, শঙ্কর, মহেশ্বর, মহাদেব ইত্যাদি পর্য্যায় নামে খ্যাত হইয়াছেন। সে অদ্ভুত ইতিহাস।

বার (১২)

আদিত্য—১২। বেদের কালের দ্বাদশ সৌর মাসের দ্বাদশ দেবযোনি, যাঁহারা সূর্য্যে অবস্থিতি করেন। পরে সূর্য্য হইয়া গিয়াছেন। কাজেই পর্য্যায়ে, ইন, ভানু, সূর্য্য, রবি, অর্ক, দিবাকর, ইত্যাদি। সূর্য্যের নাম বহু আছে, কিন্তু এই কয়েকটি মাত্রের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

মাস—১২। বহু পরবর্ত্তী কালে। শঙ্কু দ্বাদশাঙ্গুল বলিয়া শঙ্কু=১২ হইয়াছিল, (যেমন পঙ্‌ক্তি=১০), কিন্তু পরে অন্য পরিভাষা হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তের (১৩)

বিশ্ব—১৩। বিশ্ব ত্রয়োদশ গণদেবতা, বিশ্বেদেব নামে খ্যাত। পুরাণে ইঁহারা কিন্তু দশজন—বসু সত্য ক্রতু দক্ষ কাল কাম ধৃতি কুরু পুরুরবা মাদ্রব। এই হেতু "কবিকল্পলতায়" বিশ্বদেব=১০। ইঁহারা ধর্ম্মের ও দক্ষকন্যা বিশ্বার পুত্র। শ্রাদ্ধে ইঁহাদিগকে ডাকিতে হয়। ইঁহাদের উৎপত্তি ঋগ্‌বেদে। সেখানে কিন্তু বিশ্বের জগতের ঐশী শক্তিস্বরূপ ৩৩টি দেব। সে দেব কেমনে ১৩ হইলেন, জানি না।

বিশ্বের পর্য্যায় শব্দ নাই। ১৩ বুঝিবার অন্য সংজ্ঞাও নাই। "কবিকল্পলতা"য় কবিযোগ্য 'ত্রয়োদশ তাম্বূলগুণ' ধরা হইয়াছিল।

চৌদ্দ (১৪)

মনু—১৪। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব। তাঁহার পূর্ব্বের ব্যাপার অজ্ঞাত। সপ্তম মনু বৈবস্বত। পুরাণ মতে, তাঁহার কাল চলিতেছিল। অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ মনুর কাল ভবিষ্যতে আসিবে। বস্তুতঃ গত হইয়াছে। মনুর কাল, মন্বন্তর। ৭২ যুগে এক মন্বন্তর। চারি বৎসরে যুগ ধরিয়া মন্বন্তর-পরিমাণ ছিল। অর্থাৎ ২৮৮ বৎসরে মন্বন্তর হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যুগপরিমাণ বৃদ্ধি করাতে মন্বন্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। না হইলে এখন বৈবস্বত মনুর কাল চলিত না ছয় মনু সাতাইশ যুগ ১৮৩৬ বৎসর, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে গত হইয়াছিল।

ইন্দ্র = ১৪। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পৌরাণিক কল্পনা। এক এক মন্বন্তরে এক এক নূতন সৃষ্টি, এবং এক এক ইন্দ্র। বৈবস্বত মনুর ইন্দ্র, পুরন্দর। ইন্দ্র দেবরাজ, অদিতির পুত্র। ইন্দ্রের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে জিষ্ণু, শক্র, বজ্রী, বাসব, গোত্রভিৎ, ইন্দ্র পর্য্যায়ে আঙ্কিক সংজ্ঞা হইয়াছিল।

বহু পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় লোক, ভুবন = ১৪ ; পুরাণ হইতে গৃহীত। লোক কিন্তু সাতটি, যথা, ভূর্, ভুবর্, স্বর্, মহ, জন, তপস্, সত্য। ইহাদের সহিত সপ্ত পাতাল, যথা,—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, রসাতল, পাতাল, মিলিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূলোক পৃথিবীতে মনুষ্যের, ভুবর্লোকে সিদ্ধাদির, এবং স্বর্লোকে দেবতার বাস ইত্যাদি। সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র বস্তুতঃ যেমন অবিচ্ছিন্ন নয়, সপ্তপাতালও নয়। পৃথিবীর নিম্নপৃষ্ঠ, পাতাল।

কবিভাষায় বিদ্যা = ১৪। বিদ্যা = ১৮, বহু পরবর্ত্তী কালে এই গণনা হইয়াছিল। প্রাচীন গণনায় ত্রয়ী বিদ্যা ; তারপর চারি বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী (বেদ), বার্ত্তা, দণ্ডনীতি। কালিদাসে বিদ্যা, চারি।

পনর (১৫)

তিথি = ১৫। তিথি দ্বারা দিন গণিত হয় বলিয়া নামান্তর অহন্, কদাচিৎ দিন।

ষোল (১৬)

অষ্টি = ১৬। অষ্টি এক প্রকার পাশা খেলা। ষোড়শাক্ষর পাদ এক ছন্দের নামও অষ্টি।

ভূপ = ১৬। অন্য নাম, নৃপ। এই সংজ্ঞার পর্যায় শব্দ নাই। এই ষোড়শ ভূপ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধরা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। বিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪) 'ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ।' অন্ধভৃত্য, আভীর ও গর্দভিল রাজবংশের পর ষোল জন শকরাজা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, মহাভারতে দ্রোণপর্বে, অভিমন্যু রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করিলে শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব 'ষোড়শ-রাজিক' উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ নৃপতি হইতে নৃপ = ১৬। তাঁহাদের নাম,—মরুত্ত, সুহোত্র, পৌরব, শিবি, দাশরথি রাম, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, ভরত, পৃথু, পরশুরাম। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে বোধ হয়, প্রথমটি ভূপ-সংজ্ঞার মূল। কারণ, এই সংজ্ঞার পর্যায়ে 'রাজা' নাই, মহাভারতে 'রাজা' নাম আছে। মহাভারতের ষোড়শ রাজা এক বংশেরও নহেন। বিষ্ণুপুরাণের শব্দ 'ভূভুজ' ভূপ মনে পড়াইয়া দেয়। মৎস্যপুরাণে কিন্তু শক ষোড়শ না হইয়া অষ্টাদশ। দুই বারে অষ্ট অষ্ট করিয়া ষোড়শ যবন আছে। মৎস্যপুরাণের শক যবন তুষার মুরুণ্ড হূণ ভূপদিগকে 'নৃপ', 'নৃপবংশ' বলা হইয়াছে। শকবংশ দুই বারে বিনষ্ট হয়। প্রথম উচ্ছেদের পর বিক্রমসম্বৎ, এবং ইহার ১৩৫ বৎসর পরে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন নন্দবংশ উচ্ছেদহেতু নন্দ = ৯ হইয়াছিল, শকারি বিক্রমাদিত্য দ্বারা শকবংশ উচ্ছেদও সেইরূপ স্মরণার্হ হইয়া থাকিবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে নন্দ নাই, ভূপও নাই।

সতর (১৭)

অত্যষ্টি = ১৭। অষ্টি অপেক্ষা এক অধিক। অতি-শব্দ যোগে এক অধিক, এই অর্থে বরাহে অতিদ্বাদশ = ১৩। এইরূপ, অতিধৃতি = ১ + ১৮ = ১৯।

মৈত্র = ১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের নাম মৈত্র। ইহার অঙ্ক ১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের অধিপতি, মিত্র। মিত্র, এক আদিত্য। মৈত্র সংজ্ঞার উৎপত্তি ফল-জ্যোতিষে। রাঢ়ের শ্রীনিবাসের "দীপিকায়" এবং "জাতকার্ণবে" মৈত্র সংজ্ঞা আছে।

ঘন = ১৭। ঘন পর্যায়ে অব্দ, অম্বুদ, জলদ, পয়োধর, বর্ষণ। শকের একাদশ শতাব্দের ভাস্বতীতে প্রথম পাইতেছি। রাঢ়ে ও উড়িষ্যায় এই সংজ্ঞা চলিয়াছিল। "সিদ্ধান্তদর্পণে"ও আছে। জলদ ১৭টি, বোধ হয় মৈত্র সংজ্ঞা হইতে। মিত্রা-বরুণের রেতঃস্খলনে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। অগস্ত্য, কুম্ভসম্ভব। মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয়ের মিত্রের সহিত বর্ষণের সম্বন্ধ ছিল। মনুতে মৈত্র অর্থে মলমূত্র-উৎসর্গ আছে। 'মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্বাহ্ন এব কুর্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥'—(৪। ১৫২)। কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন, 'মিত্রদেবতাকত্বান্মৈত্রঃ পায়ুঃ তদ্‌বত্ত্বান্মৈত্রং পুরীষোৎসর্গম্।' তথা চ, মনুতে (১২।১২১) 'মিত্রমুৎসর্গে।' উৎসর্গে মিত্র দেবতা। কোন পুরাণে কথাটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে।

আঠার (১৮)

ধৃতি = ১৮। অষ্টাদশাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, অষ্টাদশ ধারণা হইতে।

বহু পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় পুরাণ, কোষ, বিদ্যা = ১৮। বিষ্ণুপুরের মুকুন্দ দাস পুরাণ ও কোষ ব্যতীত অষ্টাদশ আকাশ ধরিয়াছেন। ইহার মূল কি?

উনিশ (১৯)

অতিধৃতি = ১৯। ধৃতি + ১ = ১৯। এই সংজ্ঞা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কুড়ি (২০)

নখ = ২০। বিশ বুঝাইবার এই সংজ্ঞা বহু প্রচলিত।

কৃতি = ২০। পাদে বিংশতি অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। কৃতি শব্দের অর্থ, গণিতের বর্গ আছে। এই হেতু গণিতগ্রন্থে কৃতি = ২০ চলে নাই।

একুশ (২১)

স্বর্গ = ২১। মনুতে ২১ নরক। বোধ হয়, তত স্বর্গ। পরবর্ত্তী কালের সংজ্ঞা।

সমিৎ = ২১। সমিৎ যজ্ঞকাষ্ঠ। কেবল "জাতকার্ণবে" এই সংজ্ঞা। কাম্য হোমে এতগুলি লাগে।

বাইশ (২২)

আকৃতি = ২২। এক ছন্দের নাম, আকৃতি। ইহার প্রতি পদে ২২টি অক্ষর থাকে। এই সংখ্যা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

জাতি = ২২। ইহার মূল জানি না।

তেইশ (২৩)

বিকৃতি = ২৩। আকৃতি ছন্দের পাদে ২২টি, বিকৃতিছন্দের পাদে ২৩টি অক্ষর। এই সংজ্ঞা কদাচিৎ।

চব্বিশ (২৪)

জিন = ২৪। জৈন তীর্থঙ্কর ২৪ জন ছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর, বর্দ্ধমান। ইহাঁর নামে বর্দ্ধমান নগরের নাম। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ সালে নির্ব্বাণ লাভ করেন। জিন পর্যায়ে সিদ্ধ = ২৪। কিন্তু অমরকোষে বুদ্ধের এক নাম 'সর্বার্থসিদ্ধ'। আর এক নাম 'জিন' আছে। বোধ হয়, এই-রূপে জিন ও সিদ্ধ এক হইয়াছেন। জিন সংজ্ঞার সিদ্ধ, আর দেবযোনি সিদ্ধ, পৃথক্। "সূর্য-সিদ্ধান্তে" জিন ও সিদ্ধ সংজ্ঞা নাই।

পঁচিশ (২৫)

তত্ত্ব = ২৫। নানাবিধ তত্ত্ব গণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যে পুরুষ লইয়া তত্ত্ব = ২৫। যথা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, মহৎ, প্রকৃতি, পুরুষ। দ্বিবেদী পঁচিশ তত্ত্বের নিমিত্ত ন্যায়শাস্ত্র স্মরণ করিয়াছেন!

সাতাইশ (২৭)

ভ = ২৭। ভা, প্রভা আছে বলিয়া ভ, তারা। কিন্তু অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্র হইতে ভ = ২৭। পর্য্যায়ে, নক্ষত্র, ঋক্ষ, উড়ু। সংজ্ঞাটি পরবর্ত্তী কালের। ভ শব্দ হ্রস্বতম বলিয়া ইহাই অধিক প্রচলিত।

বত্রিশ (৩২)

দন্ত = ৩২। পর্যায়ে, রদ, দশন।

তেত্রিশ (৩৩)

দেব = ৩৩। পর্যায়ে, অমর, সুর, নির্জর। বেদের ৩৩ দেব। ভূলোকে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে, এই ত্রিলোকে তিন দেব। এই তিন হইতে এগার করিয়া ৩৩ দেব। মনুতে ৩৩ দেব। পরে ভাগ হইয়া বিশ্বদেব = ১৩, আদিত্য = ১২, বসু = ৮। রামায়ণে আদিত্য = ১২, রুদ্র = ১১, বসু = ৮, অশ্বিনীকুমার = ২। একটা শ্লোকে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্থানে ইন্দ্র ও প্রজাপতি আছে।

ঊনপঞ্চাশ (৪৯)

মরুৎ = ৪৯। পর্যায়ে, বাত, মারুত, সমীরণ। ঋগ্‌বেদে মরুৎ সাতটি। ইহা হইতে ৭ × ৭ = ৪৯ মরুৎ। ইহা হইতে যোগশাস্ত্রে ৪৯টি বাত, প্রধান বাত। মরুৎ সংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালের।

তান = ৪৯। এই সংজ্ঞা আরও পরের। গীতের সপ্ত স্বরের আরোহণ অবরোহণ দ্বারা ৭ × ৭ তান, স্বরবিস্তার।

১১। আঙ্কিক সংজ্ঞা-কোষ

[শব্দের অর্থ বুঝিয়া এই কোষ দেখিবে। অর্থে সন্দেহ হইলে "ব্যাখ্যা" দেখিবে। তাহাতে শব্দটি পাওয়া যাইবে।]

অক্ষ = ইন্দ্রিয়
অগ্নি = ৩
অঙ্ক = ৯
অঙ্গ = ৬
অতিধৃতি = ১৯
অত্যষ্টি = ১৭
অব্ধি = সাগর
অরি = ৬
অর্চিস্ = ৭
অর্থ = বিষয়
অশ্ব = ৭
অশ্বিন্ = ২
অষ্টি = ১৬
আকৃতি = ২২
ইন = রবি
ইন্দ্র = ১৪
ইন্দ্রিয় = ৫
ইভ = গজ
ঈশান = রুদ্র
ঋতু = ৬
কর = ২
কৃত = ৪
কৃতি = ২০
খ = শূন্য
গজ = ৮
গুণ = ৩
গো = ৯
গ্রহ = ৯
ঘন = ১৭
চন্দ্র = ১
জাতি = ২২

জিন = ২৪
তত্ত্ব = ২৫
তর্ক = ৬
তান = ৪৯
তিথি = ১৫
দন্ত = ৩২
দস্র = অশ্বিন্
দিক্ = ১০
দেব = ৩৩
ধৃতি = ১৮
নখ = ২০
নক্ষত্র = ২৭
নরক = ৯
নন্দ = ৯
নেত্র = ২
পক্ষ = ২
পঙ্ক্তি ১০
ভ = নক্ষত্র
ভূ = ১
ভূপ = ১৬
মঙ্গল = ৮
মনু = ১৪
মরুৎ = ৪৯
মুনি = ৭
মৈত্র = ১৭
যম = ২
যুগ = ৪
রন্ধ্র = ৯
রবি = ১২
রস = ৬
রাম = ৩

রুদ্র = ১১
রূপ = ১
বসু = ৮
বিকৃতি = ২৩
বিশ্ব = ১৩
বিষয় = ৫
বেদ = ৪
শর = ৫
শূন্য = ০
শৈল = ৭
সর্প = ৮
সাগর = ৪
সিদ্ধ = জিন
স্বর্গ = ২১,৯

১২। কবিসাঙ্কেতিক শব্দকোষ।

[আঙ্কিক সংজ্ঞা কোষের অতিরিক্ত। অধিকাংশ শব্দ "কবিকল্পলতা' হইতে। অর্থ বাহুমধ্যে।]

অঙ্গ = ৫ [৬]
অবস্থা = ১০
অসিধারা = ২
আভাস্বর = ৬৪
আশ্রম = ৪
ইন্দুকলা = ১৬
উপায় = ৪
একজন = ১
ঐশ্বর্য্য = ৮
কর্ণ = ২
কার্ত্তিকেয়মুখ = ৬
কাল = ৩ [৬]
কালিদাসকাব্য = ৩
কুলাদ্রি = ৮ [৭]
কৃত্তরাবণ-মস্তক = ৯
কৃষ্ণাবতার = ১০
কোশ = ৬
খণ্ড = ৯
গঙ্গামার্গ = ৩
গজকর্ণী = ৮
গণেশদন্ত = ১
গতি = ৪
গুণ = ৬ [৩]
গুহনেত্র = ১২
গুহবাহু = ১২
গোত্র = ৭
গ্রীবা রেখা = ৩
চক্রবর্ত্তী = ৬
চন্দ্রাশ্ব = ১০
জরপাদ = ৩
জরবাহু = ৬
তত্ত্ব = ২৪ [২০]
তাম্বূলগুণ = ১৩
তুষিত = ৩৬
ত্রিশিরোনেত্র = ৬
দিক্‌পাল = ৮
দুর্য্যোধনসেনাপতি = ১১
দ্বীপ = ৭, ১৮ [৭]
ধান্য = ১৮
ধ্রুবতারক = ১৪
নদীকূল = ২
নিধি = ৯
পরমাত্মা = ১
পাণ্ডব = ৫

পাতাল — ৭
পুর — ৩
পুরাণ — ১৮
পুরাণলক্ষণ — ৫
পুষ্কর — ৩
প্রাণ — ৫
ব্রহ্মশ্রুতি — ৮
ব্রহ্মা — ৯, [১]
ব্রহ্মাস্য — ৪
ভুবন — ৩,৭,১৪
ভূ-খণ্ড — ৯
মহাকাব্য — ৫
মহাপাপ — ৫
মহামখ — ৫
মাতৃকা — ১৬
মাস — ১২
যম — ১, ১৪, [২]
যাম — ৪
যোগাঙ্গ — ৮
রন্ধ্র — ৯
রস — ৯, [৬]
রাগ — ৬
রাজমণ্ডল — ১২
রাজ্যাঙ্গ — ৭
রামপুত্র — ২
রাবণমস্তক — ১০
রাশি — ১২
রুচি — ৬
রূপ — ৬, [১]
লব্ধক — ৯
লোক — ৩, ১৪
বজ্রকোণ — ৬
বর্গ — ৫, [৪]
বর্ণ — ৪
বহ্নি — ৩
বায়ু — ৭
বার — ৭
বিদ্যা — ১৪, ১৮
বিশ্বদেব — ১০ [১৩]
বিষ্ণু — ৩
বৃহৎপাদ — ৪
ব্যাকরণ — ৮
ব্যাত্রীস্তন — ৯
ব্রতাগ্নি — ৫
ব্রীহি — ৭
শঙ্করাক্ষি — ৩
শম্ভুবাহু — ১০
শাস্ত্র — ৬
শিবচক্ষুঃ — ৩
শিবমূর্ত্তি — ৮
শিবাস্য — ৫
শুক্রচক্ষুঃ — ১
সংক্রান্তি — ১২
সন্ধ্যা — ৩
সমুদ্র — ৭
সাধ্য — ১২
সারিকোষ্ঠ — ১২
সিদ্ধি — ৮
সুধাকুণ্ড — ৯
সেনাঙ্গ — ৪
সেবধি — ৯
স্তন — ২
স্মৃতি — ১৮
স্বর্গ — ৫, [২১]
স্বর্দন্তিদন্ত — ৪
হরিবাহু — ৪
হরিনেত্র — ৩
হস্তাঙ্গুলি — ১০

পরিশিষ্ট ১

১। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

দেশ উজ্জয়িনী, কাল ৪২৭ শকাব্দ।

০ = খ (গগন, আকাশ, অম্বর)।

১ = চন্দ্র (শশাঙ্ক); রূপ ; ভু।

২ = যম ; অশ্বী (দস্র); পক্ষ ; কর।

৩ = গুণ ; অগ্নি (দহন, শিখী); রাম ; হোত্র।

৪ = বেদ ; কৃত ; অব্ধি (জল, জলধি, লবণোদ); অজ্ঘ্রি।

৫ = ভূত (বিষয়, অর্থ); ইন্দ্রিয় (অক্ষ); শর।

৬ = রস ; ঋতু।

৭ = মুনি ; স্বর ; নগ ; অশ্ব।

৮ = বসু।

৯ = স্বর্গতি ; নরক ; নন্দ।

১০ = দিক্ (আশা)।

১১ = ভব (শিব)।

১২ = অর্ক ; শঙ্কু।

১৩ = বিশ্ব। অতিদ্বাদশ।

১৪ = মনু ; ইন্দ্র।

১৫ = তিথি।

১৬ = অষ্টি ; ভূপ।

১৭ = অত্যষ্টি।

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২৪ = জিন।

৩২ = দন্ত।

৩৩ = সুর

প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্ত

দেশ ? কাল ?

০ = শূন্য (খ, ব্যোম, বিয়ৎ, অম্বর)।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, নিশাকর); কু ; রূপ।

২ = অক্ষি (নেত্র, লোচন); দস্র (অশ্বিন্); যম (যমল)

৩ = অগ্নি (বহ্নি, শিখিন্, হুতাশ, জ্বলন); গুণ।

৪ = বেদ ; কৃত ; সাগর (সমুদ্র, অর্ণব, অব্ধি)।

৫ = বাণ (ইষু, মার্গণ) ; অর্থ।

৬ = রস ; ঋতু।

৭ = মুনি ; পর্বত (অদ্রি, ভূধর, ভূমিধর ; নগ) ; তুরঙ্গ।

৮ = বসু ; গজ (কুঞ্জর), সর্প (ভুজঙ্গ)।

৯ = অঙ্ক ; গো রন্ধ্র (ছিদ্র)

১০ = দিক্।

১১ = রুদ্র (ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর)।

১২ = সূর্য (অর্ক)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = মনু ; ইন্দ্র।

১৫ = তিথি।

১৬ = অষ্টি।

১৮ = ধৃতি।

১৯ = অতিধৃতি।

২০ = নখ।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ত্রিঘন (৩৩)

৩২ = রদ।

৩৩ = সুর।

[আশ্চর্য্য, রাম = ৩ ; নন্দ = ৯ ; ভূপ = ১৬ ; জিন = ২৪ কোথাও নাই।]

৩। শতানন্দের ভাস্বতী।

দেশ পুরী, কাল ১০২১ শক।

০ = খ (শূন্য, নভঃ, অভ্র, ব্যোম, গগন, বিয়ৎ)।

১ = চন্দ্র (শশী, ইন্দু, শীতরশ্মি) ; ভূ (ভূমি, কু) ; রূপ।

২ = পক্ষ ; নেত্র (অক্ষি, দৃক্, লোচন) ; দস্র (অশ্বিন্) ; যম।

৩ = অগ্নি (জ্বলন, দহন, কৃশানু) ; রাম।

৪ = বেদ ; অব্ধি ; কৃত।

৫ = বাণ (ইষু, শর) ; ইন্দ্রিয় (অক্ষ) ; ভূত (বিষয়)।

৬ = রস ; অঙ্গ ; তর্ক ; অরি (রিপু)।

৭ = অদ্রি (নগ, অগ) ; স্বর ; গন্ধর্ব্ব।

৮ = বসু ; গজ (নাগ, কুঞ্জর) ; মঙ্গল।

৯ = নন্দ ; অঙ্ক ; গো ; গ্রহ।

১০ = দিক্ (আশা, কাষ্ঠা)।

১১ = রুদ্র (ভব, ঈশ)।

১২ = রবি (সূর্য্য, ভানু)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = মনু ; শক্র (বজ্রী)।

১৫ = তিথি (অহন্)।

১৬ = নৃপ ; অষ্টি।

১৭ = ঘন (অব্দ, অম্বুদ, জলদ)।

২০ = নখ

২২ = জাতি।

২৪ = সিদ্ধ (জিন)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ।

৩২ = রদ।

৩৩ = দেব।

৪৯ = তান ; মরুৎ।

৪। গণেশ দৈবজ্ঞের গ্রহলাঘব।

দেশ বোম্বাই, কাল ১৪৪০ শক।

০ = খ (অভ্র, নভঃ, গগন)।

১ = বিধু (শশী, ইন্দু, অব্জ) ; ভূ (কু, ক্ষিতি, উর্বী, ইলা, ক্ষ্মা) ; রূপ।

২ = দৃক্ ; দস্র (অশ্বিন্) ; পক্ষ ; যম (যমল)।

৩ = গুণ, রাম ; অগ্নি (অনল, দহন, হুতাশ, ইজ্যাশ)।

৪ = কৃত ; বেদ ; অব্ধি (উদধি, অম্বুধি, জলধি, পয়োধি, বারিধি, সাগর)

৫ = অক্ষ ; শর (ইষু, বাণ, আশুগ, নারাচ) ; মরুৎ।

৬ = অঙ্গ ; রস ; তর্ক ; অরি।

৭ = অশ্ব ; শৈল (অদ্রি, নগ, অগ)।

৮ = বসু ; অহি (ভুজঙ্গ, নাগ) ; গজ (ইভ)।

৯ = গো ; অঙ্ক ; নন্দ ; খগ (খেচর)।

১০ = দিক্ (আশা)।

১১ = রুদ্র (ঈশ, ভব, শূলী)।

১২ = রবি (অর্ক, ইন, সূর্য্য)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র (শক্র, জিষ্ণু) ; মনু।

১৫ = তিথি (দিন)।

১৬ = ভূপ (নৃপ) ; অষ্টি।

১৭ = '

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২১ = স্বর্গ।

২৩ = বিকৃতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = উড়ু (ভ, ঋক্ষ)।

৩২ = দন্ত (দশন)।

৩৩ = অমর (দেব)।

৫। জাতকার্ণবাদি করণ-গ্রন্থ।

দেশ রাঢ়, কাল ১৪৪০—১৫১৩—১৫৭৯ শক।

[জাতকার্ণব = জা, রাঘবানন্দ = রা, মুকুন্দ = মু]

০ = শূন্য (খ, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, আকাশ)।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, বিধু, শশী, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, সুধাকর ; তুষাররশ্মি) ; ভূ (কু, ধরা, মহী, ক্ষ্মা, ক্ষিতি, ক্ষোণি) ; রূপ।

২ = পক্ষ ; দস্র ; (অশ্বিন্) ; যম (যুগ্ম) ; নেত্র (অক্ষি, দৃক্, লোচন, ঈক্ষণ) ; ভুজ (কর, বাহু, হস্ত)।

৩ = গুণ ; রাম ; অগ্নি, (বহ্নি শিখী, অনল, জ্বলন, দহন, পাবক, হুতাশ, বায়ুসখা, হুতভুক্, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়) [জা]।

৪ = বেদ (শ্রুতি, নিগম) ; কৃত ; যুগ ; অব্ধি (অপ্, সিন্ধু, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, সাগর)।

৫ = বাণ (ইষু, শর, সায়ক, শিলীমুখ, বিশিখ) ; অর্থ (বিষয়) ; ইন্দ্রিয় (অক্ষ) ; আত্মা [মু]।

৬ = রস ; ঋতু (কাল) ; অঙ্গ ; তর্ক।

৭ = অদ্রি (অগ, নগ, শৈল, পর্ব্বত) ; মুনি (ঋষি) ; অশ্ব (তুরঙ্গ)।

৮ = বসু ; গজ (ইভ, করী, দন্তী, দ্বিপ, মতঙ্গজ) ; নাগ (অহি, সর্প, ব্যাল)।

৯ = গো ; অঙ্ক ; নন্দ ; রন্ধ্র (ছিদ্র) ; গ্রহ (খগ, খেচর, খচর)।

১০ = দিক্ (আশা, কাষ্ঠা, ককুভ্)।

১১ = রুদ্র (ভব, শিব, ঈশ্বর, শূলী, মহাদেব [জা]।

১২ = রবি (অর্ক, ভানু, ব্রধ্ন, সূর্য্য) ; মাস [জা]।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র (শক্র, বজ্রী) ; মনু ; লোক (ভুত) [জা]।

১৫ তিথি (অহন্, দিন)।

১৬ = ভূপ (নৃপ) ; অষ্টি।

১৭ = ঘন (অব্দ, অম্বুদ, পয়োধর, বর্ষণ) ; অত্যষ্টি ; মৈত্র।

১৮ = পুরাণ, কোষ, আকাশ [মু]।

২০ = নখ।

২১ = সমিধ্ [জা]।

২২ = জাতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ (উড়ু, তারা, তারকমণ্ডল, ঋক্ষ)।

৩২ = দন্ত (রদ)।

৩৩ = দেব (সুর, অমর)।

৪৯ = মরুৎ (বাত)।

৬। চন্দ্রশেখরকৃত সিদ্ধান্তদর্পণ।

দেশ পুরী, কাল ১৮১৪ শক।

০ = খ (শূন্য, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, বিয়ৎ, অনন্ত, গগন, পুষ্কর, বিষ্ণুপদ) ; পূর্ণ।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, বিধু, অব্জ, সুধাংশু, সিতাংশু, শীতকর, শীতভানু) ; ভূ (ভূমি, মহী, ক্ষিতি, ধরা, ইলা, ক্ষ্মা, ধরণী, বসুধা) ; রূপ।

২ = চক্ষু (দৃক্, অক্ষি, ঈক্ষণ, নয়ন, বিলোচন) ; পক্ষ ; বাহু (ভুজ) ; অশ্বী, যম (যুগ্ম)।

৩ = গুণ ; রাম ; অগ্নি (বহ্নি, জ্বলন, দহন, হুতভুক্, বীতিহোত্র)।

৪ = বেদ (শ্রুতি, আম্নায়, নিগম) ; কৃত ; সমুদ্র (অব্ধি, সিন্ধু, উদধি, অম্ভোধি, পয়োধি, বারিধি, বার্ধি, পয়োধি, কূপর, অম্ভোনিধি, রত্নাকর, মহার্ণব)।

৫ = বাণ (শর, ইষু, মার্গণ, শায়ক, বিশিখ, পৃষৎক, আশুগ, পত্রিন্, শিলীমুখ) ; অর্থ ; ইন্দ্রিয় (অক্ষ)।

৬ = রস ; ঋতু ; অঙ্গ ; তর্ক।

৭ = অদ্রি (গিরি, গ্রাব, নগ, কুভৃৎ, মহীধ্র, ক্ষ্মাভৃৎ) ; অশ্ব (বাজী, হয়) ; স্বর।

৮ = বসু ; সর্প (নাগ, ভুজঙ্গ, ব্যাল, অহি, ফণভৃৎ) ; গজ (দন্তী, দ্বিপ, ইভ, কুঞ্জর, সিন্ধুর, স্তম্বেরম, মতঙ্গজ)।

৯ = অঙ্ক ; গো ; নন্দ ; রন্ধ্র।

১০ = দিক্ (আশা, হরিৎ)।

১১ = রুদ্র (শিব, ভব, হর, ঈশ, গিরিশ)।

১২ = রবি (সূর্য্য, আদিত্য, সহস্রাংশু, প্রভাকর)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র, মনু।

১৫ = তিথি।

১৬ = ভূপ (নৃপ) ; অষ্টি

১৭ = ঘন।

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২২ = আকৃতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ।

৩২ = দন্ত (রদ)।

৩৩ = সুর (নির্জর)।

৪৯ = মরুৎ।

৭। অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু

দেশ কর্ণাট, কাল ১৪০০ শকাব্দের পরে।

০ = শূন্য (আকাশ, গগন, অন্তরিক্ষ, মরুৎপথ)।

১ = শশী (সোম, শশাঙ্ক, ইন্দু, চন্দ্র, কলানিধি, রাজা, বিধু, সুধাংশু) ; যম ; একজন।

২ = অক্ষি (চক্ষুঃ, নেত্র, লোচন, দৃষ্টি, নয়ন, ঈক্ষণ, অম্বক) ; কর (বাহু) ; কর্ণ ; পক্ষ ; যুগ্ম।

৩ = বহ্নি (শিখী, অগ্নি, পাবক, দহন, অনল) ; রাম ; শঙ্করাক্ষি ; পুর ; লোক ; ত্রিকাল ; গুণ।

৪ = অব্ধি (সাগর, বনরাশি, অম্বুধি, বাধি, জলধি, নীরধি) ; যুগ ; গতি।

৫ = ইন্দ্রিয় (জ্ঞান) ; বিষয় ; বাণ (ইষু, মার্গণ, শর, পর্বন্) ; প্রাণ ; ভূত (প্রেত) ; প-আদি [প হইতে অক্ষর পাঁচটি]।

৬ = ঋতু (কাল) ; শাস্ত্র (দর্শন, আগম) ; রস (রুচি) ; কোশ।

৭ = শৈল (অদ্রি, নগ, অচল, গিরি, গোত্র) ; দ্বীপ ; বায়ু ; মুনি (ঋষি) ; তুরগ ; মহীন্দ্র [? মহীধ্র]।

৮ = বসু ; দিগ্‌গজ (দন্তী, হস্তী, মাতঙ্গ, বারণ, সামজ) ; দিক্‌পাল ; গজকর্ণী [শিব] ; য-আদি [য হইতে হ অক্ষর ৮টি]।

৯ = রত্ন ; ব্রহ্মা (কমলাসন) ; নিধি ; গ্রহ ; খণ্ড, রন্ধ্র ; লব্ধক [?] ; ক-আদি ; ট-আদি [ক হইতে ঞ, এবং ট হইতে ন। তন্মধ্যে ঞ এবং ন = ০। কাজেই ক-আদি অক্ষর = ৯, ট-আদি অক্ষর = ৯]।

৮। কবিকল্পলতার সংখ্যাবাচক।

[প্রাচীন শব্দের পরে এক দাঁড়ি দিয়া অর্বাচীন শব্দ। বাহুবেষ্টনে ব্যাখ্যা]

১ = বিধু ; ক্ষিতি। পরমাত্মা ; গণেশদন্ত ; শুক্রচক্ষুঃ।

২ = চক্ষুঃ ; হস্ত। নদীকূল ; অসিধারা ; রামপুত্র ; স্তন।

৩ = অগ্নি ; গুণ ; রাম। কাল ; ভুবন ; গঙ্গামার্গ [ত্রিস্রোতা গঙ্গা] ; শিবচক্ষুঃ ; গ্রীবারেখা ; কালীদাস কাব্য ; বলি [উদরে ত্রিবলি] ; সন্ধ্যা ; পুর [ময়নির্ম্মিত ত্রিপুর] ; পুষ্কর [ফলজ্যোতিষের ত্রিপুষ্কর যোগ] ; বিষ্ণু [ত্রিবিক্রম] ; জ্বরপাদ [রুদ্রকোপে উৎপন্ন 'জ্বর'। ইনি ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষট্‌চক্ষুঃ, ষড়্‌ভুজ,—ভাবপ্রকাশে সুশ্রুতোক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নবলোচন]।

৪ = বেদ ; সমুদ্র ; যুগ। ব্রহ্মাস্য [চতুর্মুখ] ; বর্ণ [ব্রাহ্মণাদি ; হরিবাহু ; স্বর্দন্তিদন্ত [ইন্দ্রহস্তী, শুক্লবর্ণ, চতুর্দন্ত] ; সেনাঙ্গ [রথগজাদি] ; উপায় [সামদানাদি] ; যাম [প্রহর] ; আশ্রম ; বৃত্তপাদ।

৫ = বাণ ; ইন্দ্রিয় ; ইন্দ্রিয়ার্থ [বিষয়] ; মহাভূত [ক্ষিত্যাদি] ; প্রাণ [প্রাণ-অপানাদি]। পাণ্ডব ; শিবাস্য [পঞ্চানন] ; স্বর্গ [কোন্ পুরাণে ?] ; ব্রতাগ্নি [পঞ্চতপস্যা, চারি দিকে চারি অগ্নি, মস্তকের উপরে মার্ত্তণ্ড] ; মহাপাপ [ব্রহ্মহত্যা সুরাপানাদি মহাপাতক —মনুতে] ; মহাকাব্য [কালিদাসাদির] ; মহামখ [পঞ্চযজ্ঞ, মনুতে] ; পুরাণলক্ষণ [সৃষ্ট্যাদি] ; অঙ্গ [পঞ্চাঙ্গ অনেক ; রাজার পঞ্চপ্রকৃতি হইতে পারে, কিম্বা যোগের—বায়ুপুরাণে] ; বর্গ [অনেক, কামন্দকের যান-আসনাদি হইতে পারে]।

৬ = অঙ্গ ; রস ; ঋতু ; তর্ক। বজ্রকোণ [হীরক ষট্‌কোণ] ; ত্রিশিরোনেত্র [জ্বরের], চক্রবর্ত্তী [বোধ হয়, যে রাজার অমাত্যাদি ছয়টি অঙ্গ আছে] ; কার্ত্তিকেয়মুখ ; গুণ [সন্ধি-বিগ্রহাদি] ; জ্বরবাহু ; রূপ [শুক্লাদি]।

৭ = মুনি ; পর্বত ; সূর্য্যাশ্ব ; বহ্নিশিখা। পাতাল, ভুবন, দ্বীপ ; বার ; সমুদ্র ; রাজ্যাঙ্গ [স্বামী অমাত্যাদি] ; ব্রীহি [বায়ুপুরাণে যবাদি]।

৮ = বসু ; দিগ্‌গজ ; অহি। কুলাদ্রি [কুলাচল অষ্ট ?] ; যোগাঙ্গ ; সিদ্ধি ; ঐশ্বর্য্য ; দিক্‌পাল ; ব্রহ্মশ্রুতি [চতুরাননের অষ্টকর্ণ] ; ব্যাকরণ [ইন্দ্রচন্দ্রাদির অষ্ট]।

৯ = অঙ্ক ; অঙ্গদ্বার। গ্রহ ; রস ; ভূখণ্ড ; সেবধি [নিধি] ; সুধাকুণ্ড [নয়টি স্বর্গে ?] ; কুম্ভরাবণমস্তক [!] ; ব্যাঘ্রীস্তন [?]।

১০ = দিক্ ; পঙ্‌ক্তি। হস্তাঙ্গুলি ; শম্ভুবাহু ; রাবণমস্তক ; কৃষ্ণাবতার ; বিশ্বদেব [পুরাণের] ; অবস্থা ; চন্দ্রাশ্ব [চন্দ্রের রথের]।

১১ = রুদ্র। দুর্য্যোধন-সেনাপতি।

১২ = সূর্য্য। মাস ; রাশি ; সংক্রান্তি ; গুহবাহু [ষড়াননের] ; গুহনেত্র ; সারিকোষ্ঠ [পাশার ছক] ; রাজমণ্ডল [কামন্দকে, 'দ্বাদশরাজক']।

১৩ = । তাম্বুলগুণ [ধন্বন্তরীয়ে, 'ত্রয়োদশগুণাঃ স্বর্গেঽপি তে দুর্লভাঃ']।

১৪ = ইন্দ্র ; মনু। বিদ্যা [বেদ ৪, বেদাঙ্গ ৬, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়] ; ভুবন ; যম [এক এক ইন্দ্রের ?] ; ধ্রুবতারক [মৎস্যপুরাণে, শিশুমার চতুর্দশনক্ষত্রে, কৃত্তিকাদিগণনায় চতুর্দশ বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিত]।

১৫ = তিথি।

১৬ = । ইন্দুকলা ; মাতৃকা।

১৮ = বিদ্যা [উক্ত চতুর্দশ, আর আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র,—বিষ্ণুপুরাণে] ; পুরাণ ; স্মৃতি ; দ্বীপ [ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে] ; ধান্য [?]।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নিমাইসন্ন্যাসের পালা*

বর্ত্তমান কীর্ত্তনের পালাটীর প্রথম হইতে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ অবধি অংশ, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহার শেষাংশ কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটস্থ "কমলালয়" নামক বস্ত্রালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুত মনসাচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

কীর্ত্তন গানে সাধারণতঃ নিছক মহাজনপদ গাহে না। কীর্ত্তনওয়ালারা অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের স্বরচিত পালাতে স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে মহাজনপদ সংযোগ করে। অধুনা অনেক পালাই এইরূপ স্বল্পপরিমাণ পদ ও বেশীর ভাগ কথার সমাবেশে রচিত। অনেক স্থলেই কীর্ত্তনের পালার বিশেষ একটা ধরাবাঁধা রচনা নাই; কেবল ঘটনাগত কতকগুলি সাধারণ ভিত্তি ও পদের সমাবেশ আছে,—উপস্থিত বচনের উপরই গায়কের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। যিনি যত উপস্থিত বচন ও ভাবপূর্ণ "উপজ" সংযোগ করিতে পারেন, তিনি ততই শ্রোতার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হন। কীর্ত্তনের পরিভাষায় মহাজনপদের অংশগুলিকে "ব্রজবুলি" এবং গায়কের সংযোজিত অংশগুলিকে "উপজ" বলে। নিম্নে আমরা তাহার একটী নমুনা দিতেছি।

মূল মহাজনপদ:—"না পোড়াইও মম অঙ্গ না ভাসাইও জলে।"

উপজ:—(রাই ধনী বিশাখাকে ডেকে বল্‌ছেন)

'সখি লো, তোর করে ধরে বলে যাই গো,
সখি লো, আমায় পোড়াইও না,
আমায় সামান্য অনলে পোড়াইও না,
কৃষ্ণপ্রেমানলে পোড়াতনু সামান্য অনলে পোড়াইও না।
সখি, আমায় ভাসাইও না,
আমার মাথা খাও, যেন ভাসাইও না,
আমি ত ভেসেছি,
আমি ত ভেসেছি,
কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে নয়নের নীরে ভেসেছি।"

এগুলি অতি সহজেই শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং সকলকে বিমুগ্ধ করে।

এই ধরণের কীর্ত্তন, কবি ও তরজা গানের পালার এবং কথকতার মধ্য দিয়া শুধু পদ্য সাহিত্যই নহে, বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যেরও এমন প্রকৃষ্ট বিকাশ হইয়া গিয়াছে—উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতির এত ছড়াছড়ি আছে যে, ইহার সমস্তগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ্ থাকিয়া যাইত। এগুলি পাঠ করিতে গেলে মনে হয়, আজ

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত (১৩ই আশ্বিন, ১৩৩৬)।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষার যে সৌন্দর্য্যের তাজমহল দীপ্তিচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া সগর্ব্বে সুদৃপ্তশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে,—প্রথমে এই জাতীয় গাথার রচয়িতারূপ রাজমিস্ত্রিগণই উহার গাঁথনির কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা শুধু গ্রাম্য সাহিত্যের নিদর্শনমাত্র নহে, ইহাতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক সুস্পষ্ট আভাস আছে।

বর্ত্তমান পালাটীতে যে সকল স্থানে মহাজনপদ আছে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অংশের পাঠ, পালাতে যেরূপ পাইয়াছি সেইরূপই রহিল। ভাষারও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইল, সংশোধনের চেষ্টা হয় নাই।

নিমাইসন্ন্যাসের পালা

কথা :—মধ্যাহ্ন কালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বল্‌তিছেন—শচীমা, ভিক্ষাং দেহি।

শচীমাতা কেশব ভারতীর গলা শুনে বলতিছেন, কি সর্ব্বনাশ, হ্যাঁরে নিমাই, অতিথকে বলগে যা ঠাকুর আপনি অন্যত্তর গমন করুন।

তা শুনে নিমাই কি বলতিছেন? নিমাই বলতিছেন,—একি বল্লে মা, গিরস্থর ধর্ম্মই অতিথ-সৎকাজ করা। যদি ঘরে কিছু নাও থাকে, ভিক্ষে করে এনেও অতিথ সেবা করতি হয়। এ সময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে?

তখন শচীমাতা বল্‌তিছেন :—হ্যাঁরে নিমাই, গিরস্থর করতব্য কাজ অতিথ-সৎকাজ করা তা আমি জানি। কিন্তু, বাপ, বহুদিন হয় এমনি সময় একজন অতিথ উপস্থিত হলো; আমি যত্ন করে সেবা করলাম, আর সেই দিনই আমার প্রাণোধিক পুত্র বিশ্বরূপকে হারালাম। তাইতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনও দিন অতিথ সেবা করব না।

নিমাই বল্‌তিছেন :—হ্যাঁ মা,এমন সময় যদি অতিথ ফিরে যায় তাহলি আমার অমঙ্গল হবে।

শচীমা বল্‌লেন,—বাবা যদি তোর অমঙ্গলই হয়, তবে অতিথকে পাদ্য অর্ঘ্য দে। আর ঠাকুরকে বল্ তিনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। বাপ, কিন্তু একটা কথা।

নিমাই বল্‌তিছেন,—কি কথা মা?

শচী—তুই কিন্তু অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কতি পারবিনে।

তা শুনে নিমাই বল্‌তিছেন,—মা আমি সত্যি বল্‌ছি অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কব না। এই বলে বলছেন, ঠাকুর আপনি গঙ্গাছ্যান করে আসুন। ভারতী গঙ্গাছ্যানে গেলেন। ভারতী গঙ্গাছ্যান করতিছেন, নিমাই পশ্চাতে দাঁড়ায়ে যোড় হাতে বলতিছেন,—"গুরুদেব প্রণমামি।" তখনি ভারতী চক্ষু খুলে দেখতি পেয়েছেন ;—

পদ

অমনি ঢেলে দিল,
কর্ণমূলে ঢেলে দিল,
নিমাই কাঁদিতে লাগিল,
কৃষ্ণ কোথা আছ বলে কাঁদিতে লাগিল।
কোথা প্রাণসখা বলে কাঁদিতে লাগিল ॥

আজ ভেসে যায়,

নিমার সোণার অঙ্গ ভেসে যায়,

নদের ধূলো ভিজিয়ে আজি প্রেমের বন্যা বয়ে যায়

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সোণার অঙ্গ ভেসে যায়।

কথা :—কেশব ভারতী শচীর ঘরে ভোজন করে নিজগ্রামে গমন করলেন।

পরদিন প্রভাতে নদে বাসী ব্রাহ্মণগণ নদীর ঘাটে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতিছেন, তখন প্রভু আমার প্রেমে উন্মাদ কি করতি লাগলেন?

পদ ভাবাবেশে গৌরহরি লম্ফ দিয়ে পড়ে।

পদোত্থিত জলে যেয়ে ব্রাহ্মণ অঙ্গে পড়ে॥

কথা :—তাঁরা তখন বলাবলি করতি লাগলেন, হ্যাঁহে ছোঁড়াডা কিডা? ওর কি হিতাহিত জ্ঞান নেই? আর একজন বলতিছেন, ও না জগন্নাথ মিশ্রর ছাওয়াল? এ লক্ষ্মীছাড়া নদে ছাড়া না হলে আর নিস্তার নেই।

পদ আমার কোনও দোষ নাই,

ব্রাহ্মণ বলে লক্ষ্মীছাড়া আমার কোনও দোষ নাই,

আজ ত ছাড়তে হবে

আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে,

নৈলে ব্রাহ্মণবাক্য লঙ্ঘন হবে,

আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে।

কথা :—এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া সখীদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, যখন ব্রাহ্মণের অভিসম্পদ হয়েছে, তখন সহচরীদের ধরে কেন্দে কেন্দে বল্‌তিছেন,—

পদ সখি প্রাণ কেন কেঁদে উঠে গো

প্রাণকান্তের লাগি প্রাণ কেঁদে উঠে গো,

দক্ষিণভাগে যেন ভুজঙ্গে দেখিগো,

ভুজঙ্গে (ভুজ অঙ্গ ?) নাচিছে,

কি জানি কি হবে আমার ভুজঙ্গে নাচিছে।

সখি তাতে ভয় করি না,

তাতে আমি ভয় করি না,

এ সব অমঙ্গলের ভয় করি না,

পতি যদি নিকটে থাকে অমঙ্গলের ভয় করি না।

কথা :—পতিপ্রাণা নারীর যদি মহাবিপদ হয়, বহুপ্রকার অমঙ্গল দর্শন করে, এক প্রিয়তম পতি যদি নিকটে থাকে, কোনও প্রকার অমঙ্গলে কিছু করতি পারে না।

এদিকে প্রভু আমার গঙ্গাস্নান করে গ্রেহে গমন করতিছেন, কিন্তু প্রভুর মলিন বদন, আর দুনয়নে প্রেমধারা বইতেছে।

পদ আজ প্রভু কাঁদিতেছে—কাঁদিতেছে,
এই জগতবাসীকে কাঁদাবে বলে কাঁদিতেছে,
সে ধারার বিরাম নাই,
ধারায় ধরা ভেসে যায় রে,
ধারার ত আর বিরাম নাই।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর মলিন বদন দেখে—প্রভুর কান্না দেখে বল্‌তিছেন,—প্রভুর মলিন বদন কেন ?

প্রভু উত্তর দেলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে, আমার ভবরোগের বিকারে মাথা ধরেছে।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কি বল্‌তিছেন ? বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন, মাথা ধরেছে সেইজন্য তুমি কাঁদছ ? ওষুধ দিলিই ত সেরে যাবে। বদ্য এনে দেখাবো কি ?

প্রভু বলছেন,—আমার এ মাথাধরা ভাল করা সামান্য বদ্যর কাজ না। যেমন রোগ তেমনি বদ্য চায়।

পদ শ্রীরূপনগরে পাকা বৈদ্য আছে,
যদি আনিতে পার গো,
তবে এ পাকা ব্যাধি সেরে যাবে
পাকা বৈদ্য পেলে পাকা ব্যাধি সেরে যাবে।
যেও ভক্তিপথে শ্রীরূপনগরে
ভক্তিপথে যেয়ো গো।
ধর অনুরাগ ছুরি,
ভক্তিপথের কাঁটা কাটিতে
অনুরাগ ছুরি ধরগো।
(সেথা) মায়া নাগিনী, বিষম সাপিনী,
ভীষণ মূরতি ধরে গো।
সে যে দংশন করে,—
ভক্তিপথের পথিক পেলে দংশন করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞেসা করতিছেন, দংশন করলি কি তার ওষুধ নেই ?

পদ আছে গো, আছে গো,
বিষহরী কবচ আছে অনাসক্তির শিকড়।
সাপের শক্তি বিনাশ করে অনাসক্তির শিকড়॥

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন, তবে আমি কি করে যাবো. তুমি যে সব ভয়ের কথা বলছ বড়ই সঙ্কট। তাতে আবার প্রচুর ধনরত্ন না দিলি ত বদ্য আসবে না।

প্রভু উত্তর করতিছেন,—ঐ সামান্য ধনে সে অসামান্য বদ্য আসবে না প্রিয়ে।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বল্‌তিছেন,—সামান্য ধনে না আসে অসামান্য ধনই দেব।

প্রভু বলতিছেন,--অসামান্য ধন কি দিবা?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন,—কেন নীলকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, পদ্মকান্তমণি যা চায় তাই দেব।

প্রভু হাসতিছেন আর বলতিছেন,—

পদ　　তবে যদি দিতে পার,
তোমার মনমণি যদি দিতে পার,
সকল মণির সেরা মণি মনমণি যদি দিতে পার।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দেলেন, মনমণি কি প্রভু? একটা মানুষির কডা মন থাকে?

পদ　　প্রভু আমি ত দিয়ে রেখেছি,
এক কোটি মন দিয়ে রেখেছি,
ইহকাল জনমের মত ঐ চরণে দিয়ে রেখেছি।
আর কেমনে দিব,
এক মন আমি দুজনাকে কেমনে দিব।
দত্তা অপরাধী (দত্তাপহারী?) হবে নাকি,—
কেমনে দিব।

কথা : —প্রভু আমার এই রকম অনেক কৌশলে বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে বিদেয় নেলেন। তখন বিষ্ণু-প্রিয়াকে সম্বোধন করে বলতিছেন, যাও বিষ্ণুপ্রিয়ে, মা বোধ হয় আহ্নিক শেষ করেছেন। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে, আমি নিত্যানন্দ দাদার সঙ্গে ভোজন করব—তুমি পরিবেশন করবা। বিষ্ণুপ্রিয়া বিদেয় হয়ে সেবার আয়োজন করতি গেলেন। প্রভু মনে মনে ভাবলেন,—বিষ্ণু-প্রিয়ার হাতে এই শেষ সেবা।

শচীমাতা সোণার থালে অন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে বললেন, মা তুমি পরিবেশন করগে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করতি যাচ্ছেন, এমন সময় নাকের নোলকটা থালের উপর খসে প'ল। তাই দেখে কেন্দে কেন্দে বলতি ছেন,—

পদ　　দেখ ওগো ঠাকুরাণী দেখগে আসিয়া।
স্বর্ণথালে ব্যঞ্জন নিতে নোলক প'ল খসিয়া॥
একবার দেখ আসি—
আমার নাকের সোণা প'ল খসি একবার দেখ আসি।
আমার হৃদয়ের সোণা খসবে নাকি
একবার তোমরা দেখ আসি।

কথা :—মেয়েদের যদি নাকের সোণা খসে' পড়ে, তা হলে মেয়েরা বিশেষ চিন্তা করেয়ে কি হবে? বিষ্ণুপ্রিয়া কেন্দে কেন্দে শচী মাতাকে ডাকছেন। শচীমা তাড়াতাড়ি নাকের বেশরখানা পরিয়ে দিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে আহার শেষ করে শয়নাগারে গেলেন। তারপর রাত্রিকালে প্রভু

আমার আহার শেষ করে এক সঙ্গে শয়ন করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রোজ রোজই প্রভু যতক্ষণ ঘুম না আসেন, ততক্ষণ পদসেবা করেন। আজ বিষ্ণুপ্রিয়া কি করতিছেন? আজ ভুজলতা দিয়ে দুখানি পদ জড়িয়ে ধরে বক্ষে ধারণ করে বসে আছেন।

পদ হিয়ার উপরে পদ থুইয়া বান্ধে ভুজলতা দিয়ে গো,
যেতে দিব না, দিব না।
অভাগিনীর প্রাণ থাকিতে
যেতে দিব না দিব না।

কথা :—প্রভু বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে কর কি?

পদ আমি তোমার প্রেমের শিকল কেটেছি গো,
রাখতে পারবে না পারবে না,
এ শিকলকাটা শুক রাখতে পারবে না পারবে না।

কথা :—রাত দুপর গড়ে গেল। প্রভু বলছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি ঘুমোবা না?

বিষ্ণুপ্রিয়া চুপ করে আস্তে আস্তে প্রভুর পদসেবা করতি লাগলেন। প্রভু তখন অন্য উপায় না দেখে কালনিদ্রেকে স্মরণ করেছেন,—"কালনিদ্রে, কালনিদ্রে, একবার এস।" কালনিদ্রে তখন ভাবতিছেন, "প্রভু আমার স্মরণ করেছেন কেন? যাই দেখিগে।" এই বলে কালনিদ্রে প্রভু নিকট উপস্থিত হয়ে বলতিছে, "প্রভু প্রণমামি।" কালনিদ্রে বলতিছে, "প্রভু, আমায় ডেকেছেন কেন?" প্রভু বলতিছেন, "যাও কালনিদ্রে, তুমি নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করগে।"

কালনিদ্রে বলছেন, "প্রভু তুমি কি করবা?"

পদ আমি সন্ন্যাসী হব,
আর ত গৃহে রব না গো
আমি সন্ন্যাসী হব।

কথা :—কালনিদ্রে এই কথা শুনে বলছে, প্রভু, তুমি যদি সন্নেসী হও, তা হলে শচীমার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হবে? তারা কি প্রাণে বাঁচবে?

পদ তারা যে প্রাণ তেয়াগিবে;
তোমার লাগি কেন্দে কেন্দে প্রাণ তেয়াগিবে।
প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে,
সেই পাপের ভাগী কেবা হবে,
তারা যদি প্রাণে মরে সেই পাপের ভাগী কেবা হবে।

কথা :—প্রভু বলতিছেন, কালনিদ্রে, সে জন্য তুমি ভয় করো না, তারা কেউ প্রাণে মরবে না। তারা যদি প্রাণে মরে, সে পাপের ভাগী আমি হব।

" প্রভুর আদেশে কালনিদ্রে নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করল।

পদ　　"শয়নমন্দিরে গৌরাঙ্গসুন্দর উঠিল রজনীশেষে।
গোরার মনে দৃঢ় আশ যাইবে সন্ন্যাসে॥"
[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]।

উপজ　　আমার সোণার গৌর বের হলরে,
সাধের বিষ্ণুপ্রিয়া তেজ্য করে
সোণার গৌর বের হলরে।
আজ দুখী তাপী পার করিতে
সোণার গৌর বের হলরে।
আজ, রাধানামের বাদাম তুলে
সোণার গৌর বের হলরে।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির ছেড়ে শচীমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে ডাকতিছেন, মা, মা, মা, একবার উঠ মা। তোমার সাধের নিমাই আজ জন্মের মত বিদেয় হতি এয়েছে। তখন শচীমার ঘুমির ঘোর, কোনও উত্তর না পেয়ে প্রভু বলতিছেন,—

পদ　　চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ তোমরা হও সাক্ষী।
মায়ের দ্বারেতে মাকে মা বলিয়ে ডাকি॥

কথা :—তখন ঘুমির ঘোরে শচীমা শুনছেন, যেন কোকিল কুহুধ্বনি করতিছে। শচীমা ঘুমির ঘোরেই বলতিছেন।

পদ　　ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,
এখানে বসে ডাকছিস কেন,
ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,

প্রভু মনে মনে ভাবতিছেন,—মা বিদেয় দেলেন, আশীর্ব্বাদ ত করলেন না।

পদ　　ওগো দেখা কি পাবো,
বল মা তারে দেখা কি পাবো।

শচীমা আবার সেই রকম কোকিলের ধ্বনি শুনতি পেয়ে বলতিছেন—

পদ　　ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,
ব্রজে যেয়ে কৃষ্ণ পাবি
ব্রজের কোকিল ব্রজে যা।

প্রভু মাতৃআজ্ঞে পেয়ে সপ্তবার শচীমার মন্দির প্রদক্ষিণ করে কি করেছেন ?

পদ ঐ চলে যায়, ঐ চলে যায়,
অস্তাচলে চলে যায়,
আর ত উদয় হবে নারে,
অস্তাচলে চলে যায়।

(২)

পদ "ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যাজিয়া,
আইলা সুরধুনীতীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
চলে কাঞ্চননগর পথে।"

[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]।

উপজ ঐ চলে যায়, ঐ যে চলে যায়,
আমার সোণার গৌর চলে যায়।
কেউ ত দেখ্‌তে পেল নারে সোণার গৌর চলে যায়।

এদিকে শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হয়েছে ?

পদ "এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শিরে হানে করাঘাত॥"

[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।]

উপজ ওগো কি হল,
হায়গো আমার কি হল,
আমার প্রাণকান্ত কোথায় গেল
হায়গো আমার কি হল।

"এ মোর প্রভুর, সোণার নূপুর,
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুড়িয়া
জীতে না পারিব আর॥"

[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।]

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের নূপুর দুখানি ধারণ করে বলছেন—

পদ কেন বাজিল না,
ওগো নূপুর কেন বাজিল না
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ বলে আজ নূপুর কেন বাজিল না।

কথা :—মনে মনে চিন্তা করতিছেন, যাই দেখিগে, প্রভু আমার মার মন্দিরেই আছেন। এই বলে শচীমাতার মন্দিরের সন্মুখে এসে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন –

পদ   "শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি,
                    ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।"

[বাসুদেব ঘোষ—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা।]

উপজ   কাঁদিতেছে—
        প্রভু কোথা গেল বলে কাঁদিতেছে।

কথা :—শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, কি হয়েছে বল্ মা?

পদ   "শয়নমন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল,
                    মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।" [ঐ]।

        হেথা এসেছে নাকি,
        দাসীরে ত্যাগ করে হেথা এসেছে নাকি।

কথা :—শচী দেবীর অতিথি সংকার অবধি শয়নে স্বপনে, ভোজনে উপবেশনে, সর্ব্বদা নিমাইর চিন্তা মনে পড়ে। মনে যেন সর্ব্বদায় বলে, নিমাই আমার বক্ষে শেলাঘাত করে যায়। তাই কয় দিন যাবৎ শচীমার আহার নিদ্রে নেই—সর্ব্বদাই কেবল নিমাইর চিন্তা। বিষ্ণুপ্রিয়া যখন একবার মাত্র ডেকেছেন, শচীদেবী অমনি শুনতি পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে বলতিছেন— কি বল্লে বিষ্ণুপ্রিয়ে? বলি নিমাই! বলি আমার নিমাই!! বলি কোথায় গেল?

পদ   "ত্বরিতে জ্বালিয়ে বাতি, খুঁজিলেন ইতি উতি
                    কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়ে।
        বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে,   কাঁদিতে কাঁদিতে পথে
                    ডাকে শচী নিমাই বলিয়ে॥"

[বাসুদেব ঘোষ, পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা।]

উপজ   কোথা গেলি,
        একবার এসে মা বলে ডাক্, ওরে নিমাই কোথায় গেলি।
                    কে আছে—
        তুই বিনে আমার কে আছে।
                    অভাগিনীর মা বলিতে তুই বিনে আর কে আছে॥

কথা :—শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্বোধন করে বল্‌তিছেন,—হ্যাঁ মা বিষ্ণুপ্রিয়ে, কৃপণে যেমন চোরের ভয়েতে নিজের ধনরত্ন অপরের কাছে রেখে দেয়, আমি আমার নিমাই ধন তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম।

পদ   আমার নিমাই দে,
        দে দে আমার নিমাই দে,
                    নিমাই বিনে প্রাণ বাঁচে না,
        দে দে আমার নিমাই দে।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে কেঁদে বল্‌তিছেন, তুমিও যেমন তোমার নিমাইরত্ন আমার নিকট দিইছিলে, আমিও সেই ধন বহু যত্নে বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলাম।

পদ "মুই অভাগিনী, সকল
জাগিনু প্রভুরে লইয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়ে, মোরে নিদ্রা দিয়ে,
প্রভু গেল পলাইয়া॥"
লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

আমার কি হবে,
বল্‌ মা আমার কি হবে,
আর কি আমি পাব না মা বল মা আমার কি হবে।

কথা :—শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার উচ্চস্বরের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিবেশীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। এসে দেখে, শচীবিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় লুটায়ে লুটায়ে নিমাই নিমাই বলে কান্তেছে।

পদ নিমাই বলে কাঁদিতেছে।
তারাও অমনি কাঁদিতেছে।
শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না দেখে তারাও অমনি কাঁদিতেছে।

কথা :—এ দিকে নদেবাসী ভক্তমণ্ডলী প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে গৃহে যাবার সময় প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম শুনে যায়। সেই সব ভক্তগণ গঙ্গাস্নান সেরে প্রভুর দ্বারে এসে হরিনাম শুনবার বাসনায় কর্ণ পেতে দিয়েছে।

পদ "সকল মোহান্ত-মেলি, সকালেতে স্নান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।"

উপাঙ্গ সে ধ্বনি নাই,
সেই গৌর হরি, হরি হরি ধ্বনি নাই,
"গৌরাঙ্গ গিয়াছে চলি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥"
[বাসুদেব ঘোষ—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।]

কথা :—শচীদেবী নিত্যানন্দকে দেখ্‌তে পেয়ে অমনি দু বাহু পাশরিয়ে জড়িয়ে ধরেছে,—হ্যাঁরে নিতাই, আমার নিমাইকে কি কোথায়ও কীর্ত্তনে থুয়ে আইচিস?

পদ বল বল বাপ কৈ রে নিমাই,
নিমাই বিনে প্রাণ বাঁচে না,
ওরে নিতাই কই রে নিমাই।
আমায় কে ডাকিবে
মা বলিয়ে কে ডাকিবে
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে, মা বলিয়ে কে ডাকিবে॥

কথা :—আজ প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনে সকলেই শোকাচ্ছন্ন, এমন কি বৃক্ষাদি তরুলতা পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত। শচীদেবী কখনও ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দেচ্ছেন, কখনও নিমাই নিমাই করে কাঁদ্‌তিছেন। নিত্যানন্দ সেই প্রকার দশা দেখে বল্‌তিছেন,মা তুমি অধীর হয়ো না। তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থিকে পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার নিমাইকে এনে দেখাবো। এই আমি তার অনুসন্ধান করতি চল্‌লাম। এই বলে নিত্যানন্দ ভক্তগণ সঙ্গে করে বের হলেন।

ও দিকে প্রভু আমার অতি দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন করে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কাঞ্চননগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

"কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনীতীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥"

সে বৃক্ষ কিনা তেঁতুল বৃক্ষ ; যার হাওয়া গায় লাগলি ব্যাধি হয়। এমন কি, তেঁতুল বৃক্ষের হাওয়া বহুদিন গায় লাগলি মহাব্যাধি হবার সম্ভাবনা আছে। প্রভু আমার সেই তেঁতুল গাছের মূলে বসেছেন।

"তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দৃপ্ত কলেবর॥"

প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কাটোয়াবাসীদিগের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। কাটোয়াবাসিগণ অকস্মাৎ এই প্রকার জ্যোতি দর্শন করে বলছে, এ বিনা মেঘে বিদ্যুৎজ্যোতি কেমন করে এল। এই প্রকার বলাবলি করে, প্রভুর অঙ্গজ্যোতি দর্শন লালসায় ছুটোছুটী করে আস্‌তিছে।

"নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি, জপ ছাড়ে যতি॥
কেহ চলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ আসে জননীর পরাণ বধিয়া॥
কেহ বলে এ নাগর যেবা দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥"

[বাসুদেব ঘোষ. পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা]।

ও দিকে ভারতী গোঁসাই ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন ছিলেন, তিনি জান্‌তি পালেন, প্রভু কাটোয়া নগরে এসেছেন। ভারতী গোঁসাই প্রভুর আগমনবার্ত্তা জান্‌তি পেয়ে, তাড়াতাড়ি প্রভুর নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভু ভারতী গোঁসাইকে করযোড়ে বল্‌তিছেন, গুরুদেব প্রণমামি।

ভারতী গোঁসাই বল্‌তিছেন, হাঁ হে বালক, তুমি কোথা হতে এসেছ ?

প্রভু বল্‌তিছেন—আমারে চিন্তি পারলেন না,—আমি শচী মায়ের পুত্র নিমাই। আমি সন্নেস নিতি আইচি।

পদ আমি সন্ন্যাসী হব,
বড় আশা আছে মনে সন্ন্যাসী হব।

কথা :—ভারতী গোঁসাই বল্‌তিছেন, কি জন্নি তুমি সন্ন্যাসী হবা ? তুমি কি জান না যে, এ কলিকালে সন্নেস নেই ? আর বিশেষ তুমি ত ছেলেমানুষ। কথায় বলে,

পঞ্চাশের আগে না হয় রাগের নির্ণয়।

মুখের কথায় কি হে কৃষ্ণভজন হয়॥

প্রভু বল্‌তিছেন, গুরুদেব, পঞ্চাশ বৎসরের আগে সন্নেস নিতি নেই ;—পাঁচে শূন্য দিলিই ত পঞ্চাশ হয়।

পদ গুরুদেব আমি শূন্য দিয়েছি।

সে মদনের পঞ্চবাণে শূন্য দিয়েছি॥

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, শুধু পঞ্চাশে হয় না, পঞ্চ তত্ত্ব না জান্‌লি পঞ্চাশ হয় না, ষড়্‌রিপু বশ না হলি ষাটি হয় না, ষট্‌ চক্র ভেদ না হলি সত্তরে হয় না, প্রেমে আসক্তি না জন্মালি আশীতি হয় না, নববিধা ভক্তি ভিন্ন নব্বইতি হয় না, সৎসঙ্গ না করলি একশতে হয় না।

তখন ভারতী দেখ্‌তি পালেন, প্রভুর এই বেগ আর কিছুতেই সংবরণ হবে না। ভারতী বল্‌তিছেন, হাঁ হে বালক, তুমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হবা ?

প্রভু বল্‌তিছেন, গুরুদেব, আমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হবো।

পদ আমায় দয়া কর,

আর ধৈর্য্য ধরতে নাহি পারি,—

আমায় দয়া কর।

কথা :—ভারতী বল্‌তিছেন, যদি একান্তই সন্ন্যাসী হও, তবে যাও, মস্তক মুণ্ডন করে, স্নান করে এস।

প্রভু বল্‌তিছেন, আমি এই কাটোয়া নগরে কখনও আসিনি। দয়া করে আমায় বলে দেন, কোথায় নাপিত পাবো।

ভারতী বলতিছেন, তার জন্নি তোমার চিন্তা নেই। ঐ যে বাড়ীখানা দেখ্‌তি পাচ্ছ, ঐ বাড়ীর নিকটে গিয়ে মধু নাপিত বলে ডাক দিও, তা হলিই সে আসবে।

প্রভু আমার ভারতীর আদেশে কতক দূর অগ্রসর হয়ে ডাকৃতিছেন, মধু মধু মধু, একবার এসো। মধু মহাপ্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তি পেয়েছে। তখন মধু মনে মনে ভাবছে, এই কাটোয়া নগরে বাস করা অবধি কখনও এমন মধুর কণ্ঠস্বর মধুর কর্ণে প্রবেশ করে নি। যাই যাই বলে মধু বাড়ী দ্বারে এসে দেখে,—

ভুবনমোহন রূপ ধরি ব্রাহ্মণকুমার।

মধু মহাপ্রভুর রূপরাশি দর্শন করে বল্‌তিছে, ঠাকুর, আপনি কি আমাকে ডাকতিছেন। প্রভু বল্‌তিছেন, মধু তুমি আমার মস্তক মণ্ডন করে দেও। মধু বলছে, কেন ঠাকুর, তোমার কি দায় যে তুমি মস্তক মণ্ডন করবা।

পদ আমি সন্ন্যাসী হব,

ওরে মধু, আমি সন্ন্যাসী হব,

বড় আশা আছে মনে সন্ন্যাসী হব।

কথা :—মধু বল্‌তিছে, কি বল্লে ঠাকুর, এই নবীন বয়েসে সন্নেসী হবা—কার কাছে সন্নেসধর্ম্ম গ্রহণ করবা ?

প্রভু বল্‌তিছেন, আমি কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষিত হব।

মধু বল্‌তিছে,—

পদ
আমায় যদি দেও হে কড়ি,
তবে ক্ষৌরী করতে পারি
যদি দেও হে কড়ি।

প্রভু বলছেন,—

পদ
আমি কোথা পাব কড়ি,
আমি অতি দীন ভিখারী,
আমি কোথা পাব কড়ি,
আয়রে তোরে পরশ করি
দেই রে তোরে ভবের কড়ি।

মধু বল্‌তিছে,- ঠাকুর তুমি আমায় পরশ কর্‌লি কি হবে ?

(প্রভু বলছেন)

পদ
তার আমার থাকে না,
আমি যারে পরশ করি তার 'আমার' থাকে না।
মধু, কেবল তার আমি থাকি,
তার বল্‌তে কেবল আমি থাকি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে তার বল্‌তে কেবল আমি থাকি।

কথা :— এই বলে প্রভু অমনি দু বাহু বাড়িয়ে মধুকে ধরেছেন। মধু মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেয়ে কেন্দে কেন্দে বল্‌তিছে,—

পদ
মধু বলে কর যুড়ি, যদি ক্ষৌরীর দেও মজুরী,
ধন রত্ন তা কিছু না নেব হে।
আমার অভাব ত নাই হে,
সামান্য ধনের আমার অভাব ত নাই হে।

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, তবে তুমি কি চাও ? (মধু বলছে—)

পদ
কিঞ্চিৎ কৃপা বিতরি, দিলে তোমার চরণতরী,
তবে পাড়ি দিতে পারি ভব হে।
দিতে পারি, ভব পাড়ি দিতে পারি।
দিলে তোমার চরণতরী ভব পাড়ি দিতে পারি।
ডাক শুনিয়ে হল আশা,
কাজ করিব পুরাও আশা,
ভবের বাসা ভেঙ্গে চলে যাই হে।

আমি চলে যাব—
ডঙ্কা মেরে চলে যাব—
কালের মুখে কালী দিয়ে ডঙ্কা মেরে চলে যাব।
আর যেন না হয় আসিতে,
প্রবেশিতে চৌরাশীতে
তাই নাশিতে শ্রীপদে স্থান চাই হে।
কল্পতরু হও নিদানে,
যাতে সুখী হই নিদানে,
তব স্থানে অধীনে যা চাই হে।

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, মধু আমি তোমায় বর দেব, তুমি বেছে নিতি পারবা ত?

(মধু বলছে—)

পদ মনের মত বর পেলে পরে, অমনি নেব শির উপরে,
অন্য পরে করবো না যাচাই হে।
আমি করব না যাচাই।
যা চাই, তা যদি পাই,
তবে কর্‌বো না যাচাই॥

(প্রভু বলছেন—)

আমি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করি,
আমায় জীব চিনে না,
আমি সূক্ষ্ম হয়ে বিরাজ করি,
আমায় জীব চিনে না।

কথা :—মধু তখন বল্‌তিছে, ঠাকুর তুমি আমার ভিতরে আছ? প্রভু বল্‌তিছেন, হাঁ মধু।

(মধু বলছে—)

পদ প্রভু সুমুখে দাঁড়াও,
আমি মিলায়ে দেখি,
তোমার স্থূল রূপে আর সূক্ষ্ম রূপে মিলায়ে দেখি।

কথা :—প্রভু অমনি মধুর সমুখে দাঁড়ায়েছেন। মধু বাহিরে ভিতরে একই রূপ দেখ্‌তিছে। মধু চক্ষু উন্মীলন করে বলছে, ঠাকুর আমার বিশ্বাস হয় না, জানিনে তুমি কি মোহিনী মায়া জান! তোমার সেই শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ রূপে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে যদি কথা বল্‌তে পার, তবে আমার বিশ্বাস হয়। প্রভু বলছেন, হাঁ মধু, আমি তাই কর্‌বো, তুমি নয়ন মুদিত কর। মধু নয়ন মুদিত করল, আর সেই সময়ে প্রভু আমার মধুর হৃদয়নিকুঞ্জে ধড়া চূড়া পীত বসন শ্রীকরপল্লবে বংশী নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন।

পদ মধু দেখ রে,
মধু দেখ রে, মধু দেখ রে,

দেখে জনম সফল কর রে,

দেখ রে।

কথা :—মধু এই আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করলাম, তোমার আর এ ভবে জন্ম নিতি হবে না। অদ্যাবধি তোমার বংশ মধুময়রা বংশে পরিণত হবে। এখন আমার কার্য্য সমাধা করে দেও। তখন মধু প্রভুর ক্ষৌরকার্য্য করতে আরম্ভ করলেন। মধু প্রভুর শ্রীপদ ধরে কেন্দে কেন্দে বলতিছে,—

পদ　　তোরা চান্দ নিবি কে আয়,

তোরা আয় রে কাটোয়াবাসী

চান্দের গাছে চান্দ ধরেছে চান্দের ছড়াছড়ি নদীয়ায়।

কথা :—মধু এই প্রকার ভাবাবেশে শ্রীপাদপদ্মের নখ ছেদন করে মস্তক মণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছে। মধু প্রভুর চাঁচর কেশে হস্ত সঞ্চালন করে কাঁদতে লাগল।

পদ　　কি হল কি হল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে,

নাপিত কান্দয়ে উভরায়।

সকলে কান্দে

প্রভুর মুখ চেয়ে সকলে কান্দে।

কি হল কি হল বলে সকলে কান্দে ॥

কথা :—প্রভু আমার মস্তক মুণ্ডন করে গঙ্গাস্নান করে আর্দ্র বসনে এসে দাঁড়ায়েছেন।

পদ　　অরুণ দুখানি কানি,　　ভারতী দিলেন আনি,

আরও দিল একটী কৌপীন।

মস্তকে পরশ করি,　　পরিলেন গৌরহরি,

আপনাকে মানি অতি দীন।

আমায় দয়া কর,

এইবার আমায় দয়া কর

তোমার চরণে শরণ নিলাম,

এইবার মোরে দয়া কর।

(ভারতী বলছেন—)

বল কে কার গুরু,

তুমি বট জগৎগুরু

কথা :—ভারতী মনে মনে ভাবছেন, দেখ রে জগৎবাসিগণ, আজ সকলেই দেখ। আজ গোলোকবিহারী হরি আমার কাছে সন্ন্যেস গ্রহণ করবার জন্যি কত কাকুতি মিনতি করছেন। যার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, বলি সেই ইচ্ছাময় কি না ভারতীর নিকট কাতরোক্তি করছেন। যার নামের অন্ত নেই - সেই হরিকে আমি কি মন্ত্র দিয়ে দীক্ষিত করবো।

প্রভু ভারতীর মনের ভাব বুঝতি পেরে সেই মহামন্ত্র নাম ভারতীকে প্রদান করলেন।

পদ বলে দিল,

ভারতীর কর্ণমূলে বলে দিল

সেই মহামন্ত্র হরিনাম কর্ণমূলে বলে দিল

ভারতী সেই নাম পুনর্ব্বার প্রভুর কর্ণে প্রদান করলেন।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চত্রিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ষট্‌ত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পঞ্চত্রিংশ বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের বান্ধবের সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিম্নলিখিত তিন জন বান্ধবই পরিষদের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন,—মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর।

সদস্য

বর্ষারম্ভে বিভিন্ন শ্রেণীতে ৯৫৮ জন সদস্য ছিলেন।

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য——৯
(খ) আজীবন-সদস্য——৫
(গ) অধ্যাপক-সদস্য——৫
(ঘ) মৌলভী-সদস্য——০
(ঙ) সহায়ক-সদস্য——২১
(চ) সাধারণ-সদস্য—৯১৮
কলিকাতা—৩৮৫
মফস্বল——৫৩৩
——————
৯১৮
——————
৯৫৮

বর্ষমধ্যে (ক) বিশিষ্ট, (খ) আজীবন ও (গ) অধ্যাপক-সদস্যের সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। একজন বিশিষ্ট-সদস্য ও পাঁচ জন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব আসিয়াছে, অদ্য তাঁহাদের নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে।

(ঙ) আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ২১ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৩ জন নুতন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই জন্য বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা

২৩ হইয়াছে। তন্মধ্যে চারি জনের স্থিতিকাল এই বর্ষে শেষ হইয়াছে। তিনজন নূতন ও তিন জন পুরাতন সদস্যের যথাক্রমে নির্ব্বাচনের এবং পুনর্নির্ব্বাচনের প্রস্তাব অদ্য আলোচিত হইবে।

সহায়ক-সদস্যের মধ্যে প্রবীণ সাহিত্যিক বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া নানা বিষয়ে পরিষদের সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় নানা ভাবে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন।

(চ) সাধারণ-সদস্য। আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে কলিকাতাবাসী ৩৮৫ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন সহায়ক-সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এবং ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ১৩ জন মফস্বলে গিয়াছেন। ২৮ জন নূতন সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত কতিপয় সদস্য পূর্ব্ব বৎসরে চাঁদা বৃদ্ধির জন্য ও অন্য কারণে কিছু দিন সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৩৩ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সদস্য-সংখ্যা ৪২৬ হইয়াছে।

মফস্বলবাসী সদস্যগণের সংখ্যা বর্ষারম্ভে ৫৩৩ ছিল। বর্ষমধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বসদস্য ২৮ জন পুনরায় সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯ জন নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এবং ১৩ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে আসিয়াছেন। এই সকল সংখ্যার যোগ বিয়োগ করিয়া বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সদস্য-সংখ্যা ৫৭৭ হইয়াছে।

অতএব বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে—

(ক) বিশিষ্ট-সদস্য——৯
(খ) আজীবন-সদস্য——৫
(গ) অধ্যাপক-সদস্য——৫
(ঘ) মৌলভী-সদস্য——০
(ঙ) সহায়ক-সদস্য——২৩
(চ) সাধারণ-সদস্য——১০০৩
কলিকাতা—৪২৬
মফস্বল—৫৭৭
———
১০০৩
———
১০৪৫

আলোচ্য বর্ষে ৯৭ জন নূতন সাধারণ-সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৩৩ জন সদস্য-পদ স্বীকার করিয়াছেন। ৬৪ জনের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর পাওয়া যায় নাই। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববৎসরে প্রস্তাবিত সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সদস্য প্রস্তাব-

কর্ত্তৃগণকে অনুরোধ, যেন তাঁহারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব না করেন। উক্ত ৬৪ জনের নিকট হইতে চাঁদা ও প্রবেশিকাদি পাইলে পরিষদের নিশ্চয়ই বলবৃদ্ধি হইবে। যে সকল প্রস্তাবিত সদস্য তাঁহাদের প্রবেশিকাদি এখনও পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়া মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে পরিষৎকে সাহায্য করিবেন।

পরলোকগত সদস্যগণ

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন, পরিষৎ এই জন্য বিশেষ দুঃখিত এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা জানাইতেছেন।

সহায়ক-সদস্য—

১। বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ (কলিকাতা)

সাধারণ-সদস্য—

১। অতুলকৃষ্ণ সিংহ বি এল (হাওড়া)
২। অনঙ্গমোহন পাল (কলিকাতা)
৩। রায় উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাদুর এফ এস এল (শিলং)
৪। উপেন্দ্রনারায়ণ দত্ত গুপ্ত বি এ, বি টি (কটক)
৫। কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল (খুলনা)
৬। মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর (কৃষ্ণনগর)
৭। গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত (রঙ্গপুর)
৮। গৌরচন্দ্র রায় (দিল্লীদেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার)
৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাগাঁচড়া, শান্তিপুর)
১০। চিন্তামণি ঘোষ (এলাহাবাদ)
১১। তারাসুন্দর রায় বি এল (গাইবান্ধা)
১২। রায় নলিনীনাথ শেঠ বাহাদুর (কলিকাতা)
১৩। নিতাইচরণ রায় (হাওড়া)
১৪। মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (চুঁচুড়া)
১৫। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল (কলিকাতা)
১৬। যোগেনচন্দ্র দত্ত এম এ, বি এল, এটর্নি (কলিকাতা)
১৭। শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল (রামপুরহাট)
১৮। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা)
১৯। সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গঙ্গাটিকুরী, বর্দ্ধমান)
২০। সতীশরঞ্জন দাস এম এ, ব্যারিষ্টার (দিল্লী)

২১। নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর, সি আই ই (কলিকাতা)

২২। সোমনাথ রায় (জাড়া, মেদিনীপুর)

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

পূর্ব্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(ক) ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ

(খ) পীযূষকান্তি ঘোষ

(গ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

(ঘ) মহেন্দ্রনাথ করণ

(ঙ) যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল

(চ) যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ আর হিষ্ট্ এস্

(ছ) রসময় লাহা

(জ) রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী

অধিবেশন

(ক) বার্ষিক অধিবেশন

১৩ই জ্যৈষ্ঠ চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চারি জন সাহিত্যিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠা, একজন সদস্যের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রদর্শনের পর ৩৪শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয় এবং ৩৫শ বর্ষের বজেট বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে ৩৫শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনান্তে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম মাসিক, ৬ই শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ। প্রবন্ধ—(ক) গাজী সাহেবের গান—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, (খ) শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

২। দ্বিতীয় মাসিক, ৩রা ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রবন্ধ—(ক) প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ (১ম অংশ)—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, (খ) বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৩। তৃতীয় মাসিক, ৩১এ ভাদ্র, রবিবার। সভাপতি—মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। প্রবন্ধ—(ক) বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দসঙ্কলন—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, (খ) বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি।

৪। চতুর্থ মাসিক, ৭ই আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি। প্রবন্ধ—(ক) কবিরাজ গোবিন্দদাস—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (খ) কঙ্কেলি পুষ্প—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

৫। পঞ্চম মাসিক, ২১এ আশ্বিন, রবিবার। সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি। প্রবন্ধ—(ক) উড়িষ্যায় বাশুলী—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ, (খ) শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত (আলোচনা)—শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন এম এ।

৬। ষষ্ঠ মাসিক, ১৬ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর। প্রবন্ধ—রামগিরি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল।

৭। সপ্তম মাসিক, ২৩এ অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর। প্রবন্ধ—বার্ত্তা, প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি।

৮। অষ্টম মাসিক, ১৫ই মাঘ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। প্রবন্ধ—কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয়—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি-এচ ডি।

৯। নবম মাসিক, ৫ই ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য-সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল।

১০। দশম মাসিক, ২৪এ চৈত্র, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। প্রবন্ধ—প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ (২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

(গ) বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১৫টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১। প্রথম বিশেষ, ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-সভা। সভাপতি হইয়াছিলেন—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় স্বরচিত সঙ্গীত গান করেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়গণ কবিতা পাঠ করেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

২। দ্বিতীয় বিশেষ, ১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসব ও বিশেষ অধিবেশন। প্রাতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নেতৃত্বে সমাধি

ক্ষেত্রে সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া কবির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া, সমাধিস্তম্ভ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করেন। অপরাহ্নে পরিষদ্ মন্দিরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গান করিলে পর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের এবং শ্রীযুক্তা স্বর্ণলতা দেবী মহাশয়ার কবিতা পঠিত হয়। সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে কতিপয় সদস্য কবির সহধর্ম্মিণী হেন্‌রিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী নির্ম্মাণের ও সাগরদাঁড়ীতে কবির স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদার প্রতিশ্রুতি দেন। সভাস্থলে কিছু চাঁদা আদায় হয়।

৩। তৃতীয় বিশেষ, ২০এ শ্রাবণ, রবিবার। সভাপতি হইয়াছিলেন রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর। ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ, ডি লিট মহাশয় "অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৪। চতুর্থ বিশেষ, ৯ই অগ্রহায়ণ, রবিবার। সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়। এই অধিবেশনে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর রাঁচীনিবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার বি এ মহাশয়-প্রদত্ত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কেশগুচ্ছ প্রদর্শন করিয়া, মহাত্মার বিষয়ে আলোচন করেন। শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাশয়া রাধানগরে রামমোহন রায় স্মৃতিমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে রৌপ্য-নির্ম্মিত কর্ণিক উপহার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিষৎকে এই সভায় দান করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র মহাশয় কিছু কিছু বলেন।

৫। পঞ্চম বিশেষ, ২৯এ অগ্রহায়ণ, শনিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর। এই অধিবেশনে ৺ বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। সভাপতি, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় ৺ বাণীবাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন। সভায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬। ষষ্ঠ বিশেষ, ১৪ই পৌষ, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয় "গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

৭। সপ্তম বিশেষ, ২১এ পৌষ, শনিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

৮। অষ্টম বিশেষ, ৭ই মাঘ, রবিবার। সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি স্বর্গীয় স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত,

ডাঃ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এল্, শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড এ দস্তাইন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ ও সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গুণাবলী আলোচনা করেন।

৯। নবম বিশেষ, ২১এ মাঘ, রবিবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ। এই অধিবেশনে ৺ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চিত্র তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় দান করেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর বি এ "দ্বিজেন্দ্রনারায়ণের একতারা" এবং শ্রীযুক্ত কিরণ রায় মহাশয় "কবি দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় কবিতা পাঠ করেন এবং রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ ও সভাপতি মহাশয় কবির বিষয়ে আলোচনা করেন।

১০। দশম বিশেষ, ৫ই ফাল্গুন, রবিবার। সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি মহাশয় "অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১১। একাদশ বিশেষ, ২রা চৈত্র, শনিবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর। এই অধিবেশনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্থ হইতে শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় স্বর্গীয় কর মহাশয়ের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সভাপতি মহাশয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১২। দ্বাদশ বিশেষ, ৪ঠা চৈত্র, সোমবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সরস্বতী" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা করেন এবং ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে সরস্বতীমূর্ত্তির কতিপয় ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

১৩। ত্রয়োদশ বিশেষ, ৮ই চৈত্র, শুক্রবার। সভাপতি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ। এই অধিবেশনে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র ডি এস্-সি মহাশয় "জড়ের উপাদান" (Constitute of Matter) বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সহযোগে পরীক্ষার দ্বারা ও ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছায়াচিত্র প্রদর্শন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দেন।

১৪। চতুর্দ্দশ বিশেষ, ১৯এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। এই অধিবেশনে ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, এবং সভাপতি মহাশয়

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর বিষয়ে আলোচনা করেন এবং মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল মহাশয়-লিখিত এক কবিতা পঠিত হয়।

১৫। পঞ্চদশ বিশেষ, ২৬এ চৈত্র, মঙ্গলবার। সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর। এই অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিপূজা হয়। কুমারী ইলারাণী একটি গান করেন এবং বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষদের সভ্যগণ 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ ও সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের "বাবু" পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় দুইটি কবিতা পাঠ করেন। বঙ্গীয়-নাট্য-পরিষৎ 'বাণীকীর্ত্তন' গান করেন।

সংবর্দ্ধনা

আলোচ্য বর্ষে তিনটি সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সকল সংবর্দ্ধনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

১। বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে "বসু বিজ্ঞান-মন্দিরে' তাঁহার যে সংবর্দ্ধনার আয়োজন হয়, পরিষৎ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়কে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। তুলোট কাগজে মুদ্রিত করিয়া এই অভিনন্দন-পত্র চন্দনকাষ্ঠের পেটিকায় প্রদত্ত হয়।

২। পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শনের জন্য ডাইরেক্টার জেনারেল অফ্ আর্কিওলজি মহাশয়কে পরিষদে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি পরিষদে গত ৭ই মাঘ তারিখে আগমন করেন। তাঁহাকে ঐ দিন সংবর্দ্ধনা করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

৩। কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষ হইতে পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে করপোরেশনের মেয়র, অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণকে গত ৭ই ফাল্গুন তারিখে এক সান্ধ্য-সম্মিলনে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর

" স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সহকারী সভাপতিগণ—কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ
„ জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
„ জিতেন্দ্রনাথ বসু
„ একেন্দ্রনাথ ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ—কুমার ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ

গ্রন্থাধ্যক্ষ— „ কিরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ— „ গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ বিনয়কুমার সরকার

আয়-ব্যয় পরীক্ষক—রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর পরিষদের আয় সংক্রান্ত কার্য্যভার এবং ছাপাখানা-সমিতির কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের উপর পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের পরিচালনা এবং শাখা-পরিষৎ ও স্মৃতিরক্ষার কার্য্যভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিবার ভার অর্পিত ছিল। তিনি বহু দিন পীড়িত থাকায় তাঁহার কার্য্য সম্পাদক যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের সাহায্যে সম্পাদক কার্য্যালয়ের অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

পত্রিকাধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় ৩৫শ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চারি সংখ্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় চিত্রশালার উন্নতির জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যের পরিচয় চিত্রশালার পৃথক্ কার্য্যবিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু আলমারী প্রস্তুত না হওয়ায় ও তালিকার জন্য পৃথক্ লোক নিযুক্ত না হওয়ায়, তাঁহার চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই। সুখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষশেষে পরিষদের

উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালে আলমারী হইয়াছে। এক্ষণে তিনি গ্রন্থ সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিষদের অর্থাদি ডাকঘরে ও ব্যাঙ্কে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় বিশেষ যত্নের সহিত পরিষদের যাবতীয় হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ মহাশয়ের এতৎসম্পর্কীয় মন্তব্য পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর
„ বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
„ সুকুমাররঞ্জন দাশ
„ ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ মন্মথমোহন বসু
„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
৺ বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ

শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র
„ বিনয়চন্দ্র সেন
„ অমলচন্দ্র হোম
„ ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
„ নিবারণচন্দ্র রায়
„ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

(শাখা-পরিষৎ হইতে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
৺ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
„ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়

বর্ষমধ্যে বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় পরলোকগমন করিলে, তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় সমিতির অন্যতম সভ্য নির্ব্বাচিত হন। এই বার্ষিক অধিবেশনের কিছু দিন পূর্ব্বে নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই অল্প দিনের জন্য তাঁহার স্থলে সমিতির নূতন সভ্য নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৬টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত দুইবার সার্কুলার-পত্রদ্বারা সভ্যগণের মত লইয়া কার্য্য করা হয়।

বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল ;—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শন-শাখা, (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ছ) চিত্রশালা-সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) পুরস্কার-প্রবন্ধ নির্ব্বাচন-সমিতি, (ঞ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি—চিত্রনির্ব্বাচন-সমিতি, (ট) আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ-সমিতি, (ঠ) কর্ম্মচারিগণের কার্য্যব্যবস্থা ও কার্য্য-নির্দ্দেশ-সমিতি, (ড) বার্ষিক-কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন-সমিতি, (ঢ) প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ-সমিতি, (ণ) হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনা-সমিতি। পরিশিষ্টে শাখা-সমিতির সভ্যগণের নাম দ্রষ্টব্য। এই শাখা-সমিতিগুলি ব্যতীত পূর্ব্ববৎসরে গঠিত (ক) জ্যোতিষ-সমিতি, (খ) চণ্ডীদাস সম্পাদক-সঙ্ঘ, (গ) প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যকোষ সমিতি প্রভৃতি রহিয়াছে।

এই সকল সমিতি গঠন ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক যে সকল মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত হইবে। তদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলিও সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে,—

(ক) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-পরিষদের কার্য্যকরী সমিতিতে পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(খ) কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম সাহিত্য-সম্মিলনের ন্যাস-সমিতিতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(গ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কমলা লেক্‌চারশিপ কমিটি"তে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(ঘ) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জগত্তারিণী পদক সমিতি"তে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(ঙ) রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে, মাজুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনে, লাহোরের ওরিয়াণ্টাল কন্‌ফারেন্সে, ইন্দোরে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

(চ) পরিষদের ও চিত্রশালার চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের, ড্রেণ ও পায়খানা নির্ম্মাণের এবং ময়লা ও ভাল জল লইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(ছ) পরিষদে ১৩ বৎসর কার্য্য করার পর দামড়ি পিয়ন বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইয়া পেন্সন সহ বিদায় প্রার্থনা করায় তাহাকে এককালীন ১০০৲ সাহায্য করিয়া ছুটি দেওয়া হয়।

(জ) সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে তিনটি করিয়া সাধারণের উপযোগী বক্তৃতা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(ঝ) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান নিরূপণ সম্পর্কে নদীয়া অনুসন্ধান-শাখা-সমিতির পক্ষ হইতে কোথায় শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান ছিল, তাহার বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগ দিয়া প্রবন্ধ পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হয়।

(ঞ) পরিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়জ্ঞাপক পুস্তিকা ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার জন্য শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত হয়। এই পুস্তিকায় চিত্রশালার কতিপয় উল্লেখযোগ্য মূর্ত্তিও প্রভৃতির ও পরিষদ্ মন্দিরের চিত্র থাকিবে।

(ট) প্রতি বর্ষে ৮ই শ্রাবণ তারিখ Bengal Academy of Literature-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইবে ও সেই অধিবেশনে এক বা একাধিক পরলোকগত সাহিত্যিকের বিষয়ে আলোচনা হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান-শাখা-সমিতি

অধিবেশন-সংখ্যা—

সাহিত্য-শাখা—— ৯
ইতিহাস-শাখা——৫
দর্শন-শাখা———২
বিজ্ঞান-শাখা ——৬

এই সকল শাখা-সমিতিতে মনোনীত প্রবন্ধ ও তাহার লেখকগণ,—

(ক) সাহিত্য-শাখা—

১। প্রাচীন ধুয়া-সংগ্রহ (১ম ও ২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

২। গাজী সাহেবের গান—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

৩। বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্যশব্দ সঙ্কলন—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট

৪। রামগিরি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল।

৫। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত (আলোচনা)—শ্রীযুক্ত সুধীর-কুমার সেন এম এ।

৬। উড়িষ্যায় বাশুলী—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ।

৭। ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল্।

৮। তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৯। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কালিকা-মঙ্গল—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

এতদ্ব্যতীত (১) ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বি এ, ডি লিট মহাশয়ের "অপ্রকাশিত গীতি-সাহিত্যের কয়েকটি নমুনা," (২) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়-লিখিত "রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ" এবং (৩) শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের "বাউলের গান" নামক তিনটি প্রবন্ধ বিশেষ অধিবেশনে পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

সাহিত্য-শাখার অন্যতম সভ্য বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটায় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় সেই পদে সাহিত্য-শাখার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

(খ) ইতিহাস-শাখা—

১। বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

২। কয়েকজন প্রাচীন গীতিকারের কালনির্ণয়—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি-এচ ডি।

৩। বার্ত্তা, প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি।

৪। জৈনমূর্ত্তি-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল।

৫। পূজায় বৈচিত্র্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র অ'ঢ্য।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত অভিভাষণের ইঙ্গিত অনুসারে বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগের ভারতের ইতিহাস রচনা হওয়া উচিত—এই মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

(গ) দর্শন-শাখা—

শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের কৌলমার্গ-রহস্য গ্রন্থের ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয়-লিখিত ৺সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের জীবনী গৃহীত হয়, এবং দার্শনিক শব্দের পরিভাষা (এই শাখার আহ্বানকারী

৮ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত) আলোচিত হয়। এতদ্ব্যতীত এই শাখায় কোন প্রবন্ধ আলোচিত হয় নাই।

এই বার্ষিক অধিবেশনের কিছু দিন পূর্ব্বে দর্শন-শাখার আহ্বানকারী নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে।

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা—

১। শব্দ-সংখ্যালিখন-প্রণালী—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

২। বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি।

৩। কঙ্কেলিপুষ্প—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি।

৪। অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

৫। ঋগ্‌বেদের অশ্বদেবতা— „ „ একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস-সি।

আলোচ্য বর্ষে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে।

(ক) রসায়ন-সমিতি, (খ) পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষ-সমিতি, (গ) উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান-সমিতি, (ঘ) ভূ-তত্ত্ব সমিতি, (ঙ) জীববিজ্ঞান-সমিতি।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি মহাশয়-লিখিত "রসায়ন" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে। সমিতির নির্দ্দেশমত পাণ্ডুলিপির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য গ্রন্থকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত জ্যোতিষ-শাখার কার্য্য অগ্রসর হয় নাই। এই শাখার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য গণিত জ্যোতিষও এই শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর এই শাখার নাম হইল জ্যোতিষ-শাখা (ফলিত ও গণিত)।

এই চারি শাখার সভাপতি, আহ্বানকারী ও সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি প্রকাশের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

(ক) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য-কোষ। German Oriental Societyর প্রযত্নে ও পণ্ডিত ঔফ্রেট্ (Aufrecht) মহোদয়ের সঙ্কলনে প্রকাশিত Catalogus Catalogorum নামক বিপুলকায় সংস্কৃত পুথির তালিকা-পুস্তকের আদর্শে এই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য-কোষ প্রকাশ করা হইবে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি দেশমধ্যে ও বিদেশে রহিয়াছে, তাহাদের তালিকা ইহাতে দেওয়া হইবে। গ্রন্থের রচয়িতা, তারিখ এবং বর্ত্তমান সময়ে কোথায় কোথায় পুথিগুলি রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। আলোচ্য বর্ষে পুথির তালিকা সংগ্রহের কার্য্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের 'রতন-লাইব্রেরী'তে সংগৃহীত

পুথির তালিকা পাওয়া গিয়াছে। সহৃদয় দেশবাসী এই তালিকা সংগ্রহকার্য্যে পরিষৎকে সাহায্য করিলে বঙ্গদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইবে।

(খ) হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধনালেখমালা। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম বয়ঃক্রম স্মরণীয় করিবার জন্য বঙ্গভাষায় ভারত-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট লেখকগণের নানা বিষয়ের রচনা এই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট থাকিবে। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ ও প্রবন্ধ সংগৃহীত হইতেছে। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় এই সমিতির সম্পাদক।

(গ) ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্মপুরাণ। এ পর্য্যন্ত যতগুলি ধর্ম্মপুরাণ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—ইহা পরবর্ত্তী লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের একখানি নকল সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-শাখার অনুমোদনে এই গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ।

(ঘ) চণ্ডীদাসের পদাবলী। আলোচ্য বর্ষে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের কার্য্য চলিতেছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা, চট্টগ্রামের মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, 'পদকল্পতরু' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ প্রভৃতি মহাশয়গণের পুথিসংগ্রহ হইতে চণ্ডীদাসের প্রাচীন পদাবলী ও পাঠভেদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার চণ্ডীদাস সম্পাদক-সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের উপর অর্পিত আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি এ পর্য্যন্ত পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

(ঙ) পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ও এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত রামচরিত বঙ্গভাষায় অনূদিত করিয়া টীকা টিপ্পনী সমেত প্রকাশ করা হইবে।

(চ) এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি এবং যে সকল স্থানের শব্দ সংগৃহীত হয় নাই, তাহা সংগ্রহ করিয়া বিশেষজ্ঞগণের সম্পাদনে "প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। এ জন্য যে সমিতি আছে, তাহার দ্বারা এ বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

এই সকল নূতন সঙ্কল্প ব্যতীত পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ গ্রন্থপ্রকাশের কার্য্য নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বর্ষে সম্পন্ন হইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাসের মহাভারত (আদিপর্ব্ব) প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থমুদ্রণের সমস্ত ব্যয় ৭৫৪।৭ তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

(খ) ৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ সঙ্কলিত কৌলমার্গ-রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত

অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল মহাশয়ের ভূমিকা এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ মহাশয়ের লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী এই গ্রন্থারম্ভে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(গ) কবি হেমচন্দ্র—৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। এই গ্রন্থ ফুরাইয়া যাওয়ায় এবং চাহিদা থাকায় পুনরায় মুদ্রিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে (১) পদকল্পতরু ৫ম খণ্ডের ১৫ ফর্ম্মা এবং (২) ন্যায়দর্শনের (৫ম খণ্ড) ৩৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে। (৩) সংকীর্ত্তনামৃত গ্রন্থের ৭ ফর্ম্মা এবং প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩য় খণ্ড ২য় সংখ্যার ৫॥০ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছে।

পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কর্তৃত্বাধীনে এই সকল গ্রন্থের মুদ্রণাদি পরিচালিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে উক্ত সমিতির ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল।

লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ স্থায়ী তহবিল।

আলোচ্য বর্ষে এই তহবিল হইতে পূর্ব্বোক্ত 'সঙ্কীর্ত্তনামৃত' গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই তহবিলের হিসাব পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও কার্য্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষে পঞ্চত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধের ও লেখকগণের নাম দেওয়া হইল।

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—

১। কবিরাজ গোবিন্দ দাস—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২। গাজী সাহেবের গান—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

৩। তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ।

৪। প্রাচীন ধূয়া-সংগ্রহ (১ম ও ২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ।

৫। শ্রীকর নন্দী, বিজয় পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত (আলোচনা)। শ্রীযুক্ত সুধীর-কুমার সেন এম এ।

(খ) গ্রাম্য সাহিত্য—

১। ময়মনসিংহ—কিশোরগঞ্জের গ্রাম্য সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল।

(গ) ভাষাতত্ত্ব—

১। বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য শব্দসঙ্কলন—ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট।

(ঘ) ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব—

১। উড়িষ্যায় বাশুলী—শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম এ।

২। কয়েক জন প্রাচীন গীতিকারের কাল নির্ণয়—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম এ, পি-এচ ডি।

৩। গীতগ্রাম—মোল্লা বরাউদ্দীন আহম্মদ বি এ।

৪। গীতগ্রামের আবিষ্কার—ডাঃ শ্রীযুক্ত স্নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্।

৫। জৈন মূর্ত্তি-তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম এ, বি এল।

৬। পূজায় বৈচিত্র্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আঢ্য।

৭। বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ।

৮। বার্ত্তা, প্রাচীন হিন্দু ধনবিজ্ঞান—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি।

৯। রামগিরি—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্।

১০। সভাপতির অভিভাষণ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

(ঙ) বিজ্ঞান—

১। কঙ্কেলিপুষ্প—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

২। বৈদিক ও পৌরাণিক শিশুমার—ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি।

৩। শব্দসংখ্যা-লিখন-প্রণালী—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি এস্-সি।

এই সকল প্রবন্ধ ব্যতীত ৩৪শ ও ৩৫শ ভাগ পত্রিকার শব্দসূচী প্রকাশিত হইয়াছে। শব্দসূচীগুলি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

এই সূচী ব্যতীত ২৭৷০ ফর্ম্মায় ৩৫শ ভাগ পত্রিকা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৩৪শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ৬৷০ ফর্ম্মা এবং ৩৪শ বার্ষিক মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ ৮৷৷• ফর্ম্মা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ২৷০ ফর্ম্মা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকা, সূচী ও কার্য্যবিবরণাদি ছাপাখানা-সমিতির পরিচালনে মুদ্রিত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকার সহিত (ক) বিবিধ সংগ্রহ (ছড়া, পাঁচালি, গ্রাম্য সঙ্গীত প্রভৃতি), (খ) প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ এবং (গ) পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত প্রাচীন মুদ্রার তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত মূর্ত্তি ও মুদ্রাদি সংগৃহীত হইয়াছে,—

১। উগ্রনরসিংহমূর্ত্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ। প্রাপ্তিস্থান—কান্দী।

২। দশভুজামূর্ত্তি—প্রদাতা মৌলভী আবুল মোক্তার ও মৌলভী এ জ্যাকেরিয়া। প্রাপ্তিস্থান—সালার, কান্দী।

৩। সূর্য্যমূর্ত্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ। প্রাপ্তিস্থান—সালার, কান্দী।

৪। মন্দিরযুক্ত দরজার প্রস্তরখণ্ড—প্রদাতা—ঐ। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।

৫। দশভূজামূর্ত্তি— প্রদাতা—ঐ। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।

৬। বোধিসত্ত্ব—প্রদাতা—মৌলভী এ জ্যাকেরিয়া। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।
(উভয় পৃষ্ঠে মূর্ত্তি)

ধাতুমূর্ত্তি—

৭। দশভূজা মহিষমর্দ্দিনী—প্রদাতা শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কনাথ রায়। প্রাপ্তিস্থান—ঝাড়া, মেদিনীপুর।

মুদ্রা—

১। মেনন্দর— প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ।

২। আণ্টিমেকাস্ ২য়—ঐ ঐ।

৩। সোটার মেগাস্— ঐ ঐ।

৪। কুজুল কদফিস—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

৫—১১। ভারতীয় ছাঁচে ঢালা প্রাচীন মুদ্রা ৭টি। প্রদাতা—মোল্লা রবীউদ্দিন আহম্মদ।
প্রাপ্তিস্থান—গীতগ্রাম, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

মৃণ্ময় দ্রব্য—

১-৩। পোড়া মাটির মূর্ত্তি ৩টি। প্রদাতা—মোল্লা রবীউদ্দীন আহম্মদ। প্রাপ্তিস্থান—ঐ।

৪-৮। নানারূপ নক্সাযুক্ত মৃৎপাত্রের টুক্‌রা ৫ খণ্ড।—ঐ ঐ।

প্রাচীন চিত্র চারিখানি—প্রদাতা—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত।

আলোচ্য বর্ষে প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলির পাদপীঠ ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং শ্রেণীভেদে মূর্ত্তিগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বিবিধ ছোট ছোট দ্রব্য রাখিবার জন্য এবং পুরাতন ইষ্টকগুলি রাখিবার জন্য দুইটি বড় বড় শো-কেস্ খরিদ করা হইয়াছে এবং তাহাতে দ্রব্যগুলি সাজান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কতিপয় প্রাচীন মুদ্রার ছাঁচ (plaster cast) প্রস্তুত করা হইয়াছে। চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় এগুলি স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।

এই সকল মূর্ত্তি ও মুদ্রা সংগ্রহ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে যে ১২টি বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধমূর্ত্তি আনিয়া অস্থায়িভাবে পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে চিত্রশালার গৌরব ও উপকারিতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ৬টিতে উৎকীর্ণ লিপি রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, এগুলি খৃঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য।

চিত্রশালা-সমিতির নির্দ্দেশমত ভারত গবর্মেণ্টের ট্রেজার ট্রোভ বিতরণের তালিকায় পরিষদের নাম সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় পলিটিক্যাল বিভাগে আবেদন করেন। আর্কিও-লজিকাল ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টার জেনারেল মহাশয় এবং শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার মহাশয়

পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। নেগাপটম্ হইতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে তিনটি (বৌদ্ধ মূর্ত্তি ৬৲ মূল্যে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে খরিদ করিতে পারা গিয়াছে।

ট্রেজার ট্রোভ বিতরণের তালিকায় পরিষদের চিত্রশালার নাম সন্নিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে গবর্মেণ্টের আদেশ মত প্রথমে একটি ৩০৲ মূল্যে ও পরে ৬১৸৹/৯ মূল্যে দ্বিতীয় মুদ্রাধার প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। এই শেষোক্তটিতে কিঞ্চিদধিক চৌদ্দ শত মুদ্রার স্থান হইবে। চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় মুদ্রাগুলির সবিবরণ তালিকা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। মুদ্রার চিত্র সমেত এই তালিকা আগামী বর্ষ হইতে পরিষৎ-পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করা হইবে।

পরিষদের চিত্রশালার কার্য্যব্যবস্থা ব্যতীত চিত্রশালার পক্ষ হইতে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দী মহকুমার মধ্যবর্ত্তী রাঙ্গামাটি (কর্ণসুবর্ণ), সালার ও গীতগ্রাম পরিদর্শনের ভার চিত্রশালাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়াছিল। তাঁহারা ঐ সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া এবং স্থানগুলির প্রাচীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া মত প্রকাশ করায়, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগকে ঐ সকল স্থান খনন করিবার জন্য পরিষৎ হইতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথনারায়ণ দীক্ষিত এম এ মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সালার ও গীতগ্রাম পরিদর্শন করেন। গীতগ্রাম ও সালারের স্তূপ খনন নানা কারণে সম্প্রতি অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি রাঙ্গামাটি খননের প্রাথমিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, ঐ স্থানে বহু প্রাচীন নিদর্শন সকল আবিষ্কৃত হইতেছে।

চিত্রশালার তালিকা মুদ্রণের পর যে সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা প্রণয়নের ভার চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে একটি অতি মূল্যবান্ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। রাঁচীনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার স্বনামখ্যাত পিতা রাখালদাস হালদার মহাশয় কর্ত্তৃক বিলাত হইতে আনীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের কেশগুচ্ছ এবং স্বর্গীয় রাজার সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবদের পত্রাবলী পরিষদের চিত্রশালায় অর্পণ করিয়াছেন। এই কেশগুচ্ছ রক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় একটী সুদৃশ্য আধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের চেষ্টায় ও যত্নে এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল দ্রব্য দানের ও এগুলি সংগ্রহের জন্য পরিষৎ চিরদিন শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর ও শ্রীযুক্ত চুণীবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। যে অধিবেশনে এই সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হয়, সেই অধিবেশনে শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী মহাশয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রাধানগরে রামমোহন স্মৃতি-সৌধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় তিনি যে রৌপ্য-কর্ণিক ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও পরিষৎকে দান করেন। সদস্যগণের স্মরণার্থ জানাইতেছি যে, কিছু দিন পূর্ব্বে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনের ব্যবহৃত পাগড়ীটি পরিষদে দান করিয়াছিলেন।

আর একটি আনন্দের সংবাদ জানাইতেছি। পরিষদের চিত্রশালা ও পুথিশালার ক্রমশঃ উন্নতি ও প্রসারের জন্য সম্পাদক মহাশয় কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট বার্ষিক ২৪০০৲ টাকা সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কর্পোরেশন এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া পরিষদের ও দেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছেন যে, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম উৎসাহী সভ্য ও করপোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ ও অন্যান্য কাউন্সিলারগণ এ বিষয়ে সম্পাদককে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষেও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চিত্রশালার বাবদ প্রতিশ্রুত দান ১৬০০০৲ টাকা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের দরুণ কণ্ট্রাক্টারের বিলের টাকা দিতে পারা যায় নাই এবং রমেশ-ভবনের অসম্পূর্ণ কার্য্যগুলিও সম্পন্ন করিতে পারা যায় নাই। আশা করা যায়, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মধ্যেই উক্ত টাকা দান করিয়া গবর্ণমেণ্ট পরিষৎকে উপকৃত করিবেন।

পুথিশালা

বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদের পুথিশালায় ৪৬৯৪ খানি পুথি রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম্ এ ও শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার তন্ত্ররত্ন মহাশয় কতকগুলি পুথি দান করিয়াছেন। সমস্ত পুথির তালিকা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে ১৩৩২ হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের তালিকা এখনও হয় নাই।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, পরিষদের পুথিশালার সংস্কৃত পুথিগুলির তালিকা প্রকাশ করা হইবে এবং ঐ পুথিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণও দেওয়া হইবে।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকাদি খরিদের জন্য কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি মহাশয়দ্বয় পুস্তকালয়-সমিতির অন্যতম সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুসারে যথাসময়ে পুস্তক-পত্রিকা ক্রয় করা হইয়াছে এবং তাহার কার্য্য-বিবরণী করপোরেশনে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫২৫ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫২ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৭৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে।

বর্ষারম্ভে গ্রন্থাগারে নিম্নোক্ত-সংখ্যক পুস্তক ছিল,—

পরিষদের ক্রীত ও সংগৃহীত পুস্তক—	১৭৫৫৮
(ক) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার—	৩৫৪৬
(খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার—	২২৬০
(গ) রমেশচন্দ্র দত্ত "	৭৩২
(ঘ) সাহিত্য-সভা "	২৫৪০
(ঙ) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মৈত্র "	২০০৫
(চ) " সত্যচরণ মিত্র "	৯১৭
	২৯,৫৪৮

অতএব বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

গত বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সংগৃহীত—	২৯,৫৪৮
বর্ত্তমান বর্ষের ক্রীত ও সংগৃহীত—	৫২৫
	৩০, ০৭৩
বর্ত্তমান বর্ষে মাসিক পত্রিকা পুস্তকাকারে বাঁধান—	৬৯
	৩০,১৪২

পরিষদের পরমহিতৈষী ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ এটর্নী মহাশয় ৭০ খানি পুস্তক দান করিয়াছেন এবং গত কয়েক বৎসর তিনি এই ভাবে পুস্তকাদি দান করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রবাবু ও যে সকল সদস্য, গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ পরিষদ্গ্রন্থাগারের পুষ্টি-সাধন ও উন্নতির জন্য পুস্তকাদি উপহার দিয়া সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত ৬১ খানি পুস্তক পরিষদ্গ্রন্থাবলীর সহিত বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান বর্ষে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরী হইতে অনেকগুলি খণ্ডিত মাসিক পত্রিকা ও পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পুস্তকের সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। উপহারদাতৃগণকে পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আমেরিকার Smithsonian Institution তাঁহাদের প্রকাশিত ২৪ খানি গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার Anthropological Association-এর মুখপত্র American Anthropologist, বোষ্টনের Museum of Fine Arts এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the School of Oriental Studies, এই পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া যাইতেছে।

সাময়িক পত্রের মধ্যে শ্রেণীভেদে নিম্নোক্তসংখ্যক পত্র-পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার

বিনিময়ে যথারীতি পাওয়া গিয়াছে,—দৈনিক—১০, সাপ্তাহিক—৩৭, পাক্ষিক—৫, মাসিক—৬২, দ্বৈমাসিক—৪, ত্রৈমাসিক—১২।

এই সকল সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman, Englishman, Basumati, দৈনিক বসুমতী এবং মাসিক পত্রের মধ্যে Indian Antiquary, Modern Review ক্রয় করা হইয়াছিল। সাময়িক পত্রের তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

আলোচ্য বর্ষের শেষে গ্রন্থাগারের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি সুবৃহৎ পুস্তকাধার প্রস্তুত হইয়াছে।

পূর্ব্বসংগৃহীত স্তূপীকৃত গ্রন্থগুলি নূতন পুস্তকাধারে সন্নিবেশিত করা হইতেছে। আগামী বর্ষমধ্যে পরিষদে সংগৃহীত সমুদায় গ্রন্থের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই কার্য্য বহু ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতির ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। পুস্তকাধার প্রস্তুতের এষ্টিমেট, নূতন পুস্তক ক্রয়, খণ্ডিত মাসিক পত্রগুলি বাঁধান এবং স্তূপীকৃত পুস্তকরাশি নূতন আলমারীতে রাখিবার ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রস্তাব সমিতিকর্তৃক অনুমোদিত হয়।

বর্ষমধ্যে ১৭৪ জন সদস্য পুস্তক পাঠার্থ বাড়ীতে পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত ৩৫৯৬ বার পুস্তক আদান-প্রদান করা হয়।

প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন পাঠক নির্দ্ধারিত সময়ে পাঠাগারে সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি পাঠের জন্য নিয়মিত আসিয়াছিলেন। সদস্যগণকে ৫½টা হইতে ৭½টা পর্য্যন্ত পুস্তক আদান-প্রদান করা হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত ছুটীর দিন ও প্রতি বৃহস্পতিবার ব্যতীত প্রত্যহ যথানিয়মে ২টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সাধারণের জন্য পরিষদের পাঠাগার উন্মুক্ত ছিল।

ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডের শ্রীমতী নিশারাণী ঘোষ মহাশয়া তাঁহার জননীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুইটি আলমারীপূর্ণ পুস্তক পরিষৎকে দান করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে পুস্তকগুলি পরিষদের হস্তগত হয় নাই।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে (ক) বড়বাজারের গীতা-জয়ন্ত্যুৎসবের প্রদর্শনীতে এবং (খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার প্রদর্শনীতে দুষ্প্রাপ্য ও প্রথম মুদ্রিত কতকগুলি পুস্তক প্রেরিত হইয়াছিল।

স্মৃতিরক্ষা

চিত্র-প্রতিষ্ঠার দ্বারা আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্য-সেবিগণের স্মৃতি-রক্ষা করা হইয়াছে,—

(ক) গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (তৈলচিত্র)। এই চিত্রের জন্য মাননীয় স্যর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ২৫৲, ৺প্রকাশচন্দ্র দত্ত ২৫৲, শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী ১০৲, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মিত্র ৪৲ এবং শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু ২৲ মোট ৭১৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। চিত্র প্রতিষ্ঠায় ৭০৲ ব্যয় হইয়াছে। ১৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(খ) মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম এ, বি এল (তৈলচিত্র)। এই চিত্রের জন্য শ্রীযুক্ত জে পি সিংহ ৩০৲ এবং শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মিত্র ২০৲ মোট ৫০৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। এই চিত্রের জন্য আলোচ্য বর্ষে ৩২৲ ব্যয় হইয়াছে। ১৮৲ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে।

(গ) শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ (ব্রোমাইড), (ঘ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার (ব্রোমাইড) এবং (ঙ) ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (তৈলচিত্র)। এই চিত্র তিনখানি শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-স্থাপিত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিভাণ্ডারের অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে।

(চ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (তৈলচিত্র)। এই চিত্রের জন্য যাঁহাদের নিকট চাঁদা পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম গত বর্ষের কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে। এখনও চিত্রকরের দেনা মিটাইতে পারা যায় নাই। প্রতিশ্রুত চাঁদা এখনও অনাদায় রহিয়াছে।

(ছ) দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম এ (তৈলচিত্র)। কবির পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় স্বব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে।

(ক) বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ।

(খ) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(গ) ভোলানাথ চন্দ্র। ইঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ চন্দ্র মহাশয় একখানি চিত্র দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(ঘ) যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ইঁহার একখানি চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

স্মৃতিরক্ষার জন্য স্থাপিত ভাণ্ডারগুলির অবস্থা বর্ষশেষে নিম্নোক্তরূপ দাঁড়াইয়াছে,—

(ক) কাশীরাম দাস স্মৃতিভাণ্ডার—৩৪১৮/৯।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। বর্ষমধ্যে ৪১৶০ আয় হয়। আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে "কবি হেমচন্দ্র" পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। তাহার ব্যয় মধ্যে ২১।০ এবং হেমচন্দ্র সুবর্ণ-পদকের জন্য ৩৫৸০, মোট ৫৭৲ খরচ হইয়াছে। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত—৭৫১৮/০।

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-তহবিল হইতে বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবের ব্যয় ২২।৶৯ বাদে উদ্বৃত্ত ২৭/০।

(ঘ) অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল। বর্ষমধ্যে ১১৸০ আয় হয় এবং পদকের জন্য ১০৸০ ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত—২৭১৲।

(ঙ) আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল—২১৬৭।৯।

(চ) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল—৬৫।০।

(ছ) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল—১০০৲।

(জ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল—১৪৫৲।

(ঝ) স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। এই তহবিলের ৪৪৲ মধ্যে চিত্রের মূল্য মধ্যে ৪০৲ ও চিত্র-প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যয় ৮৵৬ মোট ৪০৮৵৬ ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত—৩।৶৬।

(ঞ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষে উদ্বৃত্ত ৬৫৲ টাকাই চিত্রকরকে দেওয়া গিয়াছে। এখনও চিত্র শেষ হয় নাই।

(ট) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল। আলোচ্য বর্ষের দান ৫০৲ বর্ষমধ্যেই পূর্ব্বোক্ত দুইখানি ব্রোমাইড্ প্রস্তুত করাইতে ব্যয় হইয়াছে। বিগত বর্ষে কোন দান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের তৈলচিত্র পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যিকগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবিগণের চিত্ররক্ষার সঙ্কল্প সম্বন্ধে প্রধানতঃ অর্থাভাববশতঃই কিছুই করিতে পারা যায় নাই। পরিষদের হিতৈষিগণ এই কার্য্য উদ্ধার করিতে পরিষৎকে সাহায্য করিলে পরিষৎ বিশেষ উপকৃত হইবেন।

(ক) কালীপ্রসন্ন ঘোষ, (খ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (গ) ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, (ঘ) নীলরতন মুখোপাধ্যায়, (ঙ) হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ন, (চ) প্রাণনাথ দত্ত, (ছ) চারুচন্দ্র ঘোষ, (জ) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, (ঝ) পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, (ঞ) রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, (ট) ললিতচন্দ্র মিত্র, (ঠ) স্যর আশুতোষ চৌধুরী, (ড) যাদবেশ্বর তর্করত্ন, (ঢ) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ণ) মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, (চিত্রের জন্য ১৲ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে), (ত) মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়, (থ) দামোদর মুখোপাধ্যায়, (দ) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (ধ) চণ্ডীচরণ সেন, (ন) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, (প) অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (ফ) যোগীন্দ্রনাথ বসু, (ব) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

পদক ও পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকগণকে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার দেওয়া হইবে, তাহা ঘোষিত হইয়াছিল।

পদক

পদক	প্রবন্ধ
১। হেমচন্দ্র সুবর্ণপদক	হেমচন্দ্রের কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।
২। হরপ্রসাদ সুবর্ণপদক	হিন্দু-রাজত্বে রাঢ়।
৩। তরলাসুন্দরী সুবর্ণপদক	বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গত ২৫ বৎসরের মধ্যে কি কাজ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস।
৪। অক্ষয়কুমার বড়াল সুবর্ণপদক	অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য, বিশ্লেষণ ও আলোচনা।
৫। কালীকৃষ্ণ সুবর্ণপদক	আধুনিক বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের গতি।
৬। রামগোপাল রৌপ্যপদক	অক্ষয়কুমারের 'কনকাঞ্জলি'র বিশেষত্ব।

৭। অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদক — অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে করুণ রস।

৮। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রৌপ্যপদক — মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার ধারা।

পুরস্কার

১। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-পুরস্কার (১০০৲) — শতপথ, গোপথ ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহের বিবরণ ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

৭ম পদকটি মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ৩য়, ৪র্থ ও ৮ম পদকের জন্য, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। নিম্নে কোন্ বিষয়ের জন্য কয়টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, প্রবন্ধ পরীক্ষক ও যিনি পদক বা পুরস্কার পাইবেন, তাঁহাদের নাম লিখিত হইল।

১ম প্রবন্ধ—২টি

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ।

শ্রীযুক্ত অহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এই পদক পাইবেন।

২য় প্রবন্ধ—১টি

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল।

প্রবন্ধটি পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৫ম প্রবন্ধ—৩টি

পরীক্ষক—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, ডি এল্।

কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৬ষ্ঠ প্রবন্ধ—২টি

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাকুমার বসু এম্ এ এই পদক পাইবেন।

৭ম প্রবন্ধ—২টি

পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ।

কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

পুরস্কার—১

পরীক্ষক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, ডি লিট, সি আই ই।

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এম এ, পি আর এস্ এই পুরস্কার পাইবেন।

পদকদাতৃগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

১। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল, ২। রায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ বাহাদুর, ৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটার, ৪। অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল, ৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৭। বহুবাজার ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন, ৮। শ্রীযুক্ত আশুতোষ বড়াল।

পুরস্কারটি (১০০৲) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিলে লালগোলার মহারাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত দান ৫০০৲ হইতে দেওয়া হইবে।

যাঁহারা পদক বা পুরস্কারের জন্য টাকা দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

স্বর্গীয় অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত ১০০০৲ টাকার দরুণ আলোচ্য বর্ষ পর্য্যন্ত ৩১৸৹ সুদ পাওয়া গিয়াছে। বিগত বার্ষিক অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধপূর্ব্ব যুগের ভারতের ইতিহাস রচনার যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তদনুসারে ইতিহাস রচনা কি ভাবে হইতে পারে ও যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সভাপতি মহাশয়ের নিকট এই কার্য্যের জন্য এই তহবিলের অর্থ হইতে একজন লেখক নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এই সকল বিষয়ে সভাপতি মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবার জন্য ইতিহাস-শাখার আহ্বানকারী মহাশয়ের উপর ভার অর্পিত আছে। আলোচ্য বর্ষে এই সম্বন্ধে কোন কাজ হয় নাই।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। রাজপুতানায় জয়পুরে একটি শাখা স্থাপনের বিষয় পত্রব্যবহার চলিতেছে। শাখাগুলির মধ্যে রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, গৌহাটী, ভাগলপুর, ত্রিপুরা, মীরাট, উত্তরপাড়া, নদীয়া ও কটক-শাখার কার্য্যবিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্টে সেই সকল কার্য্যবিবরণের সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইল। রঙ্গপুর ও মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে মূল পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল।

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে ছাত্র-সভ্য-তালিকায় ৫০ জনের নাম ছিল। আলোচ্য বর্ষে একজন মাত্র ছাত্র-সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত ৫০ জনের মধ্যে কত জন এক্ষণে ছাত্র আছেন ও তাঁহারা পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কোন কাজ করিয়াছেন কি না, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার কোনই অধিবেশন হয় নাই।

নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত বর্ষে যে সকল প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তনাদির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেগুলি শাখা-সমিতি ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হইয়াছে। সকল সদস্যের মতামতের জন্য প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে মতামত আসিলে এক সাধারণ সভায় সেগুলির আলোচনা হইবে।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট

পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব

বৎসরের ন্যায় ১২০০৲ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০২ খানি পত্রিকা ক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন শিক্ষা-বিভাগের অন্তর্গত স্কুল ও কলেজে দান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষেও চিত্রশালার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদের প্রতিশ্রুত দান ১৬০০০৲ টাকা পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষ মধ্যেই উক্ত টাকা পরিষদের হস্তগত হইবে।

কলিকাতা করপোরেশন

পরিষদের পুস্তকালয়ের পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্য করপোরেশন আলোচ্য বর্ষেও ৬৫০৲ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের চিত্রশালার ও পুথিশালার জন্য ১৯২৮।২৯ সালের বাবদ ২৪০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে এই টাকা পরিষদের হস্তগত হয় নাই। *

এই অর্থ সাহায্য ব্যতীত করপোরেশন পরিষদ্ মন্দিরের ১৯২৮।২৯ বঙ্গাব্দের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষদের চিত্রশালা 'রমেশ-ভবনে'র ট্যাক্স রেহাই দিবার আবেদনের ফলে করপোরেশন ট্যাক্স রেহাই-এর পরিবর্ত্তে ১৯২৮।২৯ সালের জন্য ৫৬৸০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

এই সকল উদারতা ও সহানুভূতিপূর্ণ কার্য্যের জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ বিশেষ দান

সদস্যগণের নির্দ্ধারিত চাঁদা ব্যতীত পরিষৎ আলোচ্য বর্ষে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সকল দান পাইয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। এই সকল দানের জন্য পরিষৎ দাতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন।

(ক) স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

(খ) কলিকাতার মেয়র, অল্ডারম্যান্ ও কাউন্সিলারগণের সংবর্দ্ধনার জন্য দান।

(গ) পুরস্কারের জন্য দান।

(ঘ) এককালীন দান।

(ঙ) গ্রন্থ-প্রকাশার্থ দান।

পরিশিষ্টে প্রদাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইল।

এতদ্ব্যতীত (ক) শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একখানি বৈদ্যুতিক পাখা এবং (খ) শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ মহাশয় একখানি টেবিল-ক্লথ দান করিয়াছেন।

মন্দির ব্যবহার

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে আলো ও পাখার খরচ বাবদ ৫৲ হিসাবে লইয়া তাঁহাদের অধিবেশনাদির জন্য পরিষদের হল ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

১। ২৪-পরগণা সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন, দুই দিন।

২। শুভ-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন, এক দিন।

* গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ তারিখে এই ২৪০০৲ পাওয়া গিয়াছে।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-তহবিলের, স্থায়ী তহবিলের ও বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের মোট ১৪৬৬২৵৯ টাকা আয় এবং উক্ত তিন তহবিলের সর্ব্বরকমে মোট ১৯৪৯১৸৯ টাকা ব্যয় হইয়া, পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্তের টাকা যোগ দিয়া এবং আলোচ্য বর্ষের আয়-ব্যয় বাদ দিয়া বর্ষশেষে মোট ২৭৬৬৯৴১ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরিষদের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। বর্ষারম্ভের বজেটে চাঁদা আদায় খাতে ৬৫০০৲ টাকা ধরা হইয়াছিল, কিন্তু বর্ষশেষে চাঁদা আদায় খাতে ৬৫৫০৲ টাকা আদায় হইয়াছে। যদিও বজেট অপেক্ষা ৫০৲ টাকা বেশী চাঁদা আদায় হইয়াছে, কিন্তু অনাদায়ী চাঁদার সংখ্যা বর্ষশেষে ৫৭৫১৷০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। সদস্যগণকে নিজ নিজ চাঁদা বর্ষমধ্যেই দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষেও স্থায়ী তহবিলের ঋণ শোধ করিতে পারা যায় নাই। আপনারা লক্ষ্য করিবেন যে, পরিষদের সাধারণ কার্য্য পরিচালনের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যে যে তহবিল হইতে ঋণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একমাত্র স্থায়ী তহবিলের ঋণ ছাড়া অন্যান্য তহবিলের ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণ বিশেষ অনুগ্রহপূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষৎকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন। এ জন্য পরিষৎ তাঁহাদের সকলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। স্থায়ী তহবিলের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে তাহার সুদ হইতে পরিষদের কার্য্যের সুবিধা হইবে। তজ্জন্য আজ আবার পরিষৎ স্থায়ী তহবিলের বাকী ৪০০০৲ টাকা ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য পরিষদের শুভানুধ্যায়ী মহোদয়গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। সাহিত্য-পরিষদের ব্যয়-বহুল কার্য্যগুলি তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন করিবার উপায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে আয়-ব্যয়-সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপ্রদত্ত ২১০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও তাহার সুদ এবং তাঁহার প্রদত্ত ও অন্যের প্রদত্ত পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থে বর্ষারম্ভে ২৪৬৪৸৵৩ ছিল। বর্ষমধ্যে উক্ত প্রকারে ৮০৷৴ আয় হইয়াছে। ৺ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের কন্যা ও ৺ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পত্নী মহাশয়াকে সাহায্য বাবদ আলোচ্য বর্ষে ১৮১৲ দেওয়া বাদে বর্ষশেষে এই তহবিলে ২৩৬৪৷৩ উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু এই তহবিলে আরও ৩৸০ টাকা সুদের ৮৪০০৲ টাকার গবর্ম্মেণ্ট প্রমিশারী নোট দান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক তাঁহার এই প্রস্তাবিত দানের সর্ত্তগুলি গৃহীত হইয়াছে। দান-পত্র রেজিষ্টারীর ব্যবস্থা হইতেছে।*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ১৬ই ও ১৭ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশন হাওড়া মাজু

* কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হইতেছে যে, ১৩৩৬ সালের প্রারম্ভেই এই কোং কাগজ এবং দান-পত্র পাওয়া গিয়াছে

গ্রামে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, বি এল এবং শ্রীযুক্ত হরলাল মজুমদার মহাশয়দ্বয় সম্পাদক ছিলেন। মূল সভাপতি ছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ছিলেন—ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ। সম্মিলনে গৃহীত মন্তব্যগুলি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। মাজুতে সম্মিলনের কার্য্য পরিচালনের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিচালন-সমিতির সম্পাদককে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আগামী বর্ষে দক্ষিণ-কলিকাতাবাসিগণ ভবানীপুরে সম্মিলনের উনবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

উপসংহার

পরিষদের কার্য্যের প্রসার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে মহানুভাবগণ এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যে গভীর প্রেম ও ভক্তি ছিল, পরবর্ত্তিগণ তাহারই বলে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য এতাবৎ কাল চালাইয়া আসিতেছেন। এখনও আমাদের অনেক কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতাদের স্থাপিত ভিত্তির উপর তাঁহাদের আদর্শ-প্রতিম মন্দির আমরা এখনও গড়িয়া শেষ করিতে পারি নাই। পুস্তক ও পুথি ও ঐতিহাসিক উপাদানাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চিত্রশালার উন্নতি, বিদ্বন্মণ্ডলী যাহাতে আমাদের সংগৃহীত উপাদান সহজে জানিতে পারেন ও ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা, ছাত্রগণের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া তাহাদের যথার্থ পথ প্রদর্শন, ইত্যাদি অনেক কার্য্য আমরা প্রধানতঃ অর্থাভাবে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশবাসীর নিজ হস্তে গঠিত প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে সজীব ও শক্তিপূর্ণ হইয়া দেশের জ্ঞান-গৌরব ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে, সে ব্যবস্থা করা দেশবাসীর অবশ্যকর্ত্তব্য। আজ দেশের সর্ব্বসাধারণের উপর এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠানটি রক্ষা করা ও সম্পূর্ণ করার যে ভার আছে, তাহা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ইতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
কলিকাতা,
বঙ্গাব্দ ১৩৩৬।২৬এ জ্যৈষ্ঠ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি

দৈনিক

১। Amrita Bazar Patrika, ২। Basumati*, ৩। The Bengalee, ৪। The Englishman*, ৫। The Forward, ৬। The Statesman*, ৭। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮। দৈনিক বসুমতী*, ৯। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ, ১০। বাঙ্গালার কথা।

সাপ্তাহিক

১। The Calcutta Municipal Gazette, ২। Indian Messenger, ৩। The Mussalman, ৪। Navavidhan ৫। Welfare, ৬। Young India*, ৭। আত্মশক্তি, ৮। এডুকেশন গেজেট, ৯। খাদেম, ১০। খুলনাবাসী, ১১। গৌড়দূত, ১২। গৌড়ীয়, ১৩। চারুমিহির, ১৪। চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ, ১৫। ঢাকা-প্রকাশ, ১৬। ত্রিস্রোতা, ১৭। নাচঘর, ১৮। পল্লীবাসী, ১৯। পাবনার কথা, ২০। প্রান্তবাসী, ২১। ফরিদপুর-হিতৈষিণী, ২২। বঙ্গবাসী, ২৩। বঙ্গ-রত্ন, ২৪। বসুমতী, ২৫। বীরভূম-বার্ত্তা, ২৬। মুক্তি, ২৭। মেদিনীপুর-হিতৈষী, ২৮। মোহাম্মদী, ২৯। শক্তি, ৩০। সঞ্জয়, ৩১। সঞ্জীবনী, ৩২। সময়, ৩৩। সুরাজ, ৩৪। স্বদেশী-বাজার, ৩৫। স্বায়ত্ত-শাসন, ৩৬। হিতবাদী, ৩৭। হিন্দু।

পাক্ষিক

১। তত্ত্ব-কৌমুদী, ২। তরুণ-শক্তি, ৩। ধর্ম্মতত্ত্ব, ৪। সম্মিলনী, ৫। হিন্দু-মিশন।

মাসিক

১। American Anthropologist, ২। The Calcutta Medical Journal, ৩। The Calcutta Review, ৪। Commercial India, ৫। Health and Happiness, ৬। Indian Antiquary*, ৭। Indian Medical Record, ৮। Industry, ৯। Journal of Ayurveda, ১০। Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, ১১। Modern Review*, ১২। Property, ১৩। Welfare, ১৪। অর্চ্চনা, ১৫। আর্য্য-দর্পণ, ১৬। আর্থিক উন্নতি, ১৭। আহ্‌মদী, ১৮। উৎসব, ১৯। উদ্বোধন, ২০। উপাসনা, ২১। কায়স্থ-পত্রিকা, ২২। কায়স্থ-সমাজ, ২৩। কালি-কলম, ২৪। কৃষি-সম্পদ, ২৫। গন্ধবণিক্ মাসিক পত্র, ২৬। গৌড়প্রভা,

* তারকাচিহ্নিতগুলি ক্রীত হইয়াছিল।

২৭। চিকিৎসা-প্রকাশ, ২৮। জন্মভূমি, ২৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩০। তন্তু ও তন্ত্রী, ৩১। তাম্বুলী পত্রিকা, ৩২। তেলী-বান্ধব, ৩৩। প্রজাপতি, ৩৪। প্রবর্ত্তক, ৩৫। প্রবাসী ৩৬। বঙ্গসাহিত্য, ৩৭। বিচিত্রা, ৩৮। বিশাল ভারত (হিন্দী), ৩৯। ব্রহ্মবাদী, ৪০। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪১। ব্রাহ্মণ-সমাজ, ৪২। ভক্তি, ৪৩। ভাণ্ডার, ৪৪। ভারতবর্ষ, ৪৫। মাতৃমন্দির, ৪৬। মাধবী, ৪৭। মানসী ও মর্ম্মবাণী, ৪৮। মাসিক বসুমতী, ৪৯। মাহিষ্য-সমাজ, ৫০। যোগিসখা, ৫১। রামধনু, ৫২। শনিবারের চিঠি, ৫৩। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ, ৫৪। সাধনা, ৫৫। সাহিত্য-সংবাদ, ৫৬। সুবর্ণবণিক-সমাচার, ৫৭। শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ, ৫৮। সৌরভ, ৫৯। স্বাস্থ্য-সমাচার, ৬০। সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ৬১। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬২। হোমিওপ্যাথি পরিচারক।

দ্বৈমাসিক

১। গ্রামের ডাক, ২। প্রকৃতি, ৩। Indian Journal of Medicine, ৪। Museum of Fine Arts Bulletin, Boston.

ত্রৈমাসিক

১। আসাম-সাহিত্য-সভার পত্রিকা, (অসমীয়া), ২। কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (কানাড়ী), ৩। নাগরী-প্রচারিণী-পত্রিকা (হিন্দী), ৪। প্রতিভা, ৫। Indian Historical Quartery, ৬। Muslim Review, ৭। Quarterly Journal of the Andhra Historical Society, ৮। Quarterly Journal of the Mythic Society, ৯। ১০। Rupam, ১১। Bulletin of the School of Oriental Studies, London University ১২। Vishwa-Bharati Quarterly.

শাখা-সমিতির সভ্যগণ

(ক) সাহিত্য-শাখা

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল, ৺বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এম এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যবিনোদ, রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান-বিশারদ, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বনিধি এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়—আহ্বানকারী।

(খ) ইতিহাস-শাখা

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়ুয়া এম্ এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, বি এল পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম এ, বি এল্, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ, শ্রীযুক্ত তমোনাশ দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, সি আই ই, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল্—আহ্বানকারী।

(গ) দর্শন-শাখা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্ত-রত্ন এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাংখ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত এম এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ এম এ, বি এল, পি-এচ্ ডি, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও স্বর্গীয় নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য—আহ্বানকারী

(ঘ) বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, এফ্ জি এস্—সভাপতি।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্-সি (এডিন), এফ আর এস ই; ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, এফ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস্-সি, কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ এম্ ডি বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, ডি এস্-সি, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ—আহ্বানকারী।

(ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মাধবদাস সাঙ্খ্যতীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ অহ্বানকারী।

(চ) ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—আহ্বানকারী।

(ছ) পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—আহ্বানকারী।

(জ) চিত্রশালা-সমিতি

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেদায়েত হোসেন সামস্-উল্ উলেমা, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এডিন্), এফ আর এস ই, শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী, ডাঃ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ এম এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট্, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস্, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত রমেশ বসু এম এ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল্, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস্-সি, এম ডি, এফ্ জেড্ এস্, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, বি এল, পরিষদের সভাপতি এবং সম্পাদক।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার শাখা-সমিতিগুলি

আহ্বানকারী—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম্ এ।

(ক) রসায়ন-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সেন এম এ, ডি এস-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এফ সি এস, রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার

মজুমদার এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ডি এস-সি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উমাপতি বাজপেয়ী এম এ।

(খ) পদার্থ-তত্ত্ব, গণিত ও জ্যোতিষ-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ, ডি এস-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত ডি, এস-সি, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম এস-সি, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, এফ্ জেড এস্, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র লাহা এম এ।

(গ) উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু এম এ, এফ সি এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত সহায়রাম বসু এম এ, বি এল, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার এম এ, শ্রীযুক্ত অলক সেন এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম্ ডি, শ্রীযুক্ত অনুতোষ দাশগুপ্ত এম এ।

(ঘ) প্রাণিতত্ত্ব-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস-সি (এঁডিন্), এফ আর ই এস, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত বি কে দাস ডি এস-সি।

(ঙ) ভূতত্ত্ব-সমিতি

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ, এফ জি এস, শ্রীযুক্ত কিরণকুমার সেনগুপ্ত এম এস-সি, শ্রীযুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস এম এস্-সি।

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম এ, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম এস-সি, এম ডি, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এচ ডি— আহ্বানকারী।

আয়-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সঙ্কোচ-সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং পরিষদের সম্পাদক (আহ্বানকারী)।

পুরস্কার-প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন-সমিতি

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়চন্দ্র সেন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত সুকুমার-রঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, (আহ্বানকারী)।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ (আহ্বানকারী)।

প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ সমিতি

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ, (আহ্বানকারী)।

কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-ব্যবস্থা ও কার্য্য-নির্দেশ সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি-এচ ডি, শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্-সি, পরিষদের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ (আহ্বানকারী)।

বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পরিদর্শন সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং পরিষদের সম্পাদক।

জ্যোতিষ-সমিতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম ডি, এম এস্ সি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ তারাসিদ্ধান্তবিনোদ বি এল, শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন (আহ্বানকারী)।

চণ্ডীদাস-সম্পাদক-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য কোষ সমিতি

পরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডি লিট, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ (আহ্বানকারী)।

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর-শাখা

চতুর্ব্বিংশ বর্ষ

সভাপতি—রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন ১, বিশিষ্ট ৩, অধ্যাপক ৫, সাধারণ ১০৮ ও ছাত্র ৪৮, মোট ১৬৫।

নিম্নলিখিত সদস্যগণের মৃত্যু হইয়াছে—প্রিয়নাথ পাকড়াশী, অমূল্যদেব পাঠক বি এল, তারাসুন্দর রায় বি এল্, যাদবচন্দ্র দাস বাণীভূষণ, নবদ্বীপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত এবং ছাত্রসভ্য—গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এম এ।

শাখার বার্ষিক অধিবেশনে মূল-পরিষদের সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম এ, এল এল ডি, সি আই ই মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

অধিবেশন-সংখ্যা—১০। পঠিত প্রবন্ধের তালিকা—

অস্তাচলে শশধর—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

স্মৃতিপূজা—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন।

লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাউল সঙ্গীত ও লালন শাহ্ ফকীর—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন।

বঙ্গভাষা—কুমারী সিন্ধুবালা আতর্থী।

শাখার পরিচালনে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন ১২ই ও ১৩ই শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়। এই সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত হইতেছে।

একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত চারিটী পদক ছাত্রসভ্যগণের প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার জন্য দেওয়া হইবে,—

	বিষয়	পদক	প্রদাতা
১।	বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ রচনার জন্য (বিষয় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে)	স্বর্ণপদক	রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর।
২।	নারীশিক্ষা	রৌপ্য-পদক	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।
৩।	বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপ	,,	শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুর।
৪।	গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের সাহিত্য-সাধনা	,,	শ্রীযুক্ত কালীপদ বাগছী।

শাখা, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এককালীন দান ১৪০৲ এবং রঙ্গপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে দুই বৎসরের সাহায্য ৬০০৲ পাইয়াছেন।

আয় ৮৯১॥৵০, গত বর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল ১০৬৫।৵০, ব্যয় ৪০৯/৯, স্থায়ী ধন-ভাণ্ডারে রক্ষিত ১৫০০৲, উদ্বৃত্ত ৫০৵৩।

ভাগলপুর-শাখা

১৩৩৫

সভাপতি—শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ এম এ, বি এল।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমূল্যকৃষ্ণ রায় এম এ, বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—৯১, তন্মধ্যে ৬ জন মহিলা-সদস্য।

অধিবেশন-সংখ্যা ৫। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক—ভারতীয় সঙ্গীত—শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দিত করা হয়।

পুস্তক-সংখ্যা—৭৫০। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র ৮ খানি লওয়া হয়।

গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে আলোচ্য বর্ষে ৩৩০৪৲ সংগৃহীত হইয়াছে।

আয়—২৩৩৮৭॥, ব্যয়—২৩০॥৵০, উদ্বৃত্ত—৩/৭॥০।

ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউট গৃহে শাখার কার্য্যালয় রহিয়াছে। স্থানীয় প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ শাখার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ত্রিপুরা-শাখা

১৩৩৪।১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত এম এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস বি এল।

সদস্য-সংখ্যা—২৩৫।

অধিবেশন-সংখ্যা—১৮। এই সকল অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নাময় বসু, রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার কর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ, বি ই, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস এম এ, বি এল, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সেন বি এ, কাব্যতীর্থ বৈদ্যশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি মহাশয়গণ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়কে সংবর্দ্ধনার জন্য দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়।

পাঠাগারে তিন শতের অধিক প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

মূর্ত্তি-সংগ্রহ। কুমিল্লার ছয় মাইল দূরে ময়নামতী পাহাড় হইতে কয়েকটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত পাহাড়-গাত্রে যে লিপি রহিয়াছে, তাহার পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় সদস্যগণ চাঁদা তুলিয়া দেনা মিটাইয়াছেন।

শাখার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি মহাশয় ৫০০৲ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

তত্ত্বজ্ঞান-সমিতির গৃহে পরিষৎকে স্থান দান করিয়া উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

মেদিনীপুর-শাখা

সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম এ, বি এল, এম আর এ এস।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে।

সদস্য-সংখ্যা—১১১, অধিবেশন-সংখ্যা—৩০।

শাখার মাসিক অধিবেশনাদিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি শাখা-পরিষদের মুখপত্র "মাধবী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৪৬০।

আয়-ব্যয়:—আয় ২৫২৲, ব্যয় ২০৪।১৫, উদ্বৃত্ত ৪৭॥৶৫।

বালক বালিকাগণকে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করিবার জন্য "জ্ঞানদাময়ী রৌপ্য-পদক" এবং "শশিপ্রভা রৌপ্য-পদক" দানের ঘোষণা শাখা-পরিষৎ হইতে করা

হইয়াছে। প্রথমটীর দাতা শ্রীযুক্ত আতঙ্কভঞ্জন কর্ম্মকার বি এল এবং দ্বিতীয়টির দাতা শ্রীযুক্ত শৈলেশনাথ বিশি বি এল।

শাখা-পরিষদের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তরপাড়া-শাখা

১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় চৌধুরী।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সভ্য-সংখ্যা—৭০। অধিবেশন-সংখ্যা ১১ (তন্মধ্যে সাধারণ ৩টী ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ৮টী)। পুস্তক-সংখ্যা চারি হাজারের অধিক। ষ্টার ইউনিয়ন লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি খরিদ হইয়াছে। গ্রন্থাগারে ৬ খানি মাসিক ও ২ খানি দৈনিক পত্র লওয়া হয়।

শাখার সম্পাদক মূল-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

শাখা, গ্রাম-সংগঠন বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন এবং উত্তরপাড়ায় 'সমবায় কোষ' (Co-operative Bank) স্থাপন করিয়াছেন। উহার মূলধন ৫০,০০০৲

মাজুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনে শাখা প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন।

আয় ৭৪২৬, ব্যয় ৭৩৮৬, উদ্বৃত্ত ৫।০। এতদ্ব্যতীত ব্যাঙ্কের হিসাব পৃথক্।

গৌহাটী-শাখা

বিংশ বর্ষ—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

অধিবেশন-সংখ্যা ৭। অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির নাম ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল।

বৃহত্তর ভারত-পরিষৎ	শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন।
আত্মঘাতী (দার্শনিক)	,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।
শক্তির কণাবাদ (বৈজ্ঞানিক)	,, শশিভূষণ মানী এম ডি, এম এস্-সি।
মেঘে আলোক (গল্প)	,, সত্যভূষণ সেন।
ভক্তের স্বরভেদ	,, হরিজীবন গোস্বামী।
কবি ব্রাউনিং	,, প্রমোদচন্দ্র গোস্বামী এম এ।
রাসায়নিক আবিষ্কারে দৈব ঘটনার প্রভাব (বৈজ্ঞানিক)	আনন্দকিশোর দাস এম এ, বি এস-সি।
সোডা প্রস্তুতের ইতিহাস (ঐ)	,, ,,
কন্যাদায়ের সমারোহ (গল্প)	,, সত্যভূষণ সেন

বর্ষ-বোধন (কবিতা)	শ্রীমতী সুবর্ণলতা দাশগুপ্তা সরস্বতী।
ব্রাউনিংএর 'রবিবেন এজরা'	শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র গোস্বামী এম এ।
বেলুচিস্থানের স্মৃতি	,, সত্যভূষণ সেন।
রাজা ক্রুক (ইতিহাস)	,, ভুবনমোহন সেন এম এ।
সাধনার সুর	,, হরিজীবন গোস্বামী।

"দেশাত্মবোধে ক্ষীরোদপ্রসাদ" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়-প্রদত্ত রৌপ্য-পদক দেওয়া হয়।

(ক) ৺বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, (খ) ৺সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং (ঘ) ৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

কটক-শাখা

ব্যবহর্ত্তা—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল।

অধিবেশন-সংখ্যা ১৯ (সাধারণ-সভা ৪, প্রবন্ধালোচনা সভা ৭, বালক-সভা ২, হাস্যোদ্দীপক প্রবন্ধালোচনা-সভা ৬)।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'নেতার' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত "মানবজীবনে সাহিত্যের স্থান", "আর্টের ভবিষ্যৎ", "কৃত্তিবাসের রাম ও রাবণ-চরিত্র", "বর্ত্তমান ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার অনাবশ্যকতা", "রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা" প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য" বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

পুস্তকাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ১১খানি মাসিক, ৩ খানি সাপ্তাহিক ও ৬ খানি দৈনিক পত্রিকা লওয়া হয়।

আয় ৪০০৲, ব্যয় ৪৩৬৲। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত স্থায়ী ভাণ্ডারের তহবিল হইতে ৩৬৲ লইয়া দেনা মিটান হয়।

নদীয়া-শাখা

সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বি এ, এম বি।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল।

অধিবেশন-সংখ্যা—২। এক অধিবেশনে মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করা হয় এবং শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল মহাশয় প্রবন্ধ পাঠ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এম এ মহাশয় "বিবাহপ্রথা—পাশ্চাত্য ও ভারতীয়" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রামগোপাল টাউন হলে শাখার অধিবেশনগুলি হইয়াছিল।

শাখার সদস্য-সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে ও কোন চাঁদাও আদায় হয় নাই।

মীরাট-শাখা

সভাপতি—ডাঃ শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এল এম এস।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অবনীনাথ রায় বি এ।

সদস্য-সংখ্যা—৯০, অধিবেশন-সংখ্যা—১৩। এই সকল অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম,—

ধর্ম্ম (১ম ২য় অংশ)—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দে।

অবিচার—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র নন্দী।

কাব্য ও প্রকৃতি—শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চন্দ এম এ।

সে কাল ও এ কাল—কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরতন রায়।

বাংলার সেনরাজগণ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।

বর্ত্তমান কৃষিকার্য্য—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়।

আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ।

সাহিত্য (বক্তৃতা)—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী এম এ, ডি এল্।

বৃহত্তর ভারত (বক্তৃতা)—ডাঃ শ্রীযুক্ত বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি-এইচ্, ডি, ডি লিট্

(ক) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (খ) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং (গ) ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে সংবর্দ্ধনা করা হয়।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বি এ ৫টি, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত রায় বি এ একটি, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ মিত্র ৬টি, শ্রীমতী প্রতিভাময়ী দেবী একটি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সেন একটি ও শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার লাহিড়ী দুইটি গান গাহিয়া সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

যাঁহাদের গৃহে অধিবেশন হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম,—শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকান্ত মিত্র, ডাঃ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, আনাজমণ্ডি মেস, শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার রায়, বাকিংহাম মেস, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং ৺দুর্গাবাড়ী।

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক দুঃস্থ-সাহিত্যিক ভাণ্ডারে অর্থ দানের নিয়োগ-পত্র।

Seal of the Registrar of Calcutta.

No. 1356 of 27-5-29.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাং—২৪৩৷১ নং অপার সারকুলার রোড, সহর কলিকাতা।

(ইংরাজি ১৮৬০ সালের ২১ নং আইনানুসারে রেজেষ্টরীকৃত সভা।)

বরাবরেষু—

লিখিতং— শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, পিতা ৺প্রসাদদাস দত্ত,

সাং— ১ নং শিকদারপাড়া লেন, সহর কলিকাতা। জাতি সুবর্ণ-বণিক, পেশা—জমিদারী।

কস্য ট্রষ্ট (Trust) বা নিয়োগ-পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি বঙ্গ-ভাষার সেবক দুঃস্থ সাহিত্যিকগণকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া, আপনাদের হস্তে ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার বার্ষিক ৩৷৷০ টাকা সুদের ভারত গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি বা প্রমিসারি নোট দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। ঐ পরিমাণ সিকিউরিটির বর্ত্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭৬০০৲ সাত হাজার ছয় শত টাকা হইতেছে। তন্মধ্যে নিম্নে (ক) তপশীলে বর্ণিত ২১০০৲ দুই হাজার এক শত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে পূর্ব্বে দিয়াছি। অন্য (খ) তপশীলে বর্ণিত ৮৪০০৲ আট হাজার চারি শত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে দিতেছি। উক্ত ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটি আপনাদের হস্তে (Trust) ন্যস্ত রহিল। উক্ত সিকিউরিটির সুদ যে যে সময়ে প্রাপ্য হইবে, আপনারা উঠাইয়া লইবেন ও গ্রহণ করিবেন। ঐ সুদের টাকা হইতে আমার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর অন্তিম অনুরোধ-মত কোন একটি দুঃস্থ সাহিত্যিকের অসহায় শিশুকে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়া সাহায্য করিবেন। ও অবশিষ্ট সুদের টাকা হইতে বঙ্গ-ভাষার সেবক এক বা একাধিক দুঃস্থ সাহিত্যিককে অথবা তাঁহার বা তাঁহাদের পরিবারগণকে এককালীন বা মাসে মাসে সাহায্য করিবেন।

কাহাকে বা কাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে, কি পরিমাণ বা কিরূপ সাহায্য করা হইবে, ও কত দিনের জন্য সাহায্য করা হইবে, তাহার বিচার ও ব্যবস্থা করিবার ভার (discretion) আপনাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পণ করিলাম। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যেরা কৃতবিদ্য সজ্জন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া দান-গ্রহণ-যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন করিবেন। উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক যেরূপ বিচার ও ব্যবস্থা হইবে, সুদের টাকা উক্ত উদ্দেশ্যে তদনুরূপে ব্যয় হইবে।

এতদ্ব্যতীত ঐ সুদের টাকা পরিষৎ অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোনও রূপে ব্যয় করিতে বা হাওলাত লইতে পারিবেন না।

আরও প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনও সময়ে উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিবেচনায় উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া যায়, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত সুদের টাকা লইয়া যতটা পারেন ৩।৹ সাড়ে তিন টাকা সুদের গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি খরিদ করিয়া এই তহবিলের ফণ্ড বা মূলধন বৃদ্ধি করিবেন। ও সেই বৃদ্ধি এই দলিলের দ্বারা স্থাপিত ট্রষ্ট-ফণ্ডভুক্ত হইবে ও তাহার আয় এই দলিলের নিয়ম মত নিয়োজিত হইবে।

যদি কোন সময়ে আপনাদের সাহিত্য-পরিষৎ স্থায়ী না হয় বা লুপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ১০৫০০৲ দশ হাজার পাঁচ শত টাকার সিকিউরিটি ও বৃদ্ধি হইলে ঐ বর্দ্ধিত ফণ্ড আমার স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর স্থাপিত কোন অনুরূপ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের হস্তে অথবা অফিসিয়াল ট্রষ্টী (Official Trusty)র হস্তে ন্যস্ত হইবে। এই ট্রান্স্ফার বা (Selection) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শেষ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণে করিবেন। ও উক্ত ট্রষ্ট ফণ্ডের সিকিউরিটির সুদের টাকা উপরিলিখিত নিয়মমত ব্যয় হইবে, তাহাতে কস্মিন্ কালে কোনরূপ অন্যথা হইবে না। যদি সাহিত্য-পরিষৎ উপরিউক্ত নির্দ্দেশের (direction) কোনরূপ ব্যতিক্রম করেন বা পরিষৎ উঠিয়া গেলে ট্রান্স্ফার না করিয়া দেন, তবে আমি বা আমার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ অফিসিয়াল ট্রষ্টের হস্তে এই ফণ্ড ট্রান্স্ফার করিয়া দিতে ক্ষমতাবান রহিলেন। এইরূপ ট্রান্স্ফার করিতে যে কিছু খরচ লাগিবে, এই ফণ্ডের সুদের টাকা হইতে ঐ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। এতদর্থে স্বইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আমি অত্র (Trust) বা নিয়োগ-পত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি—ইংরাজী ১৭ই মে, সন ১৯২৯ সাল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন ১৩৩৬ সাল।

"ক" তপশীল—

১৮৫৪।৫৫	সালের	২০৭৭৩৬ নং	এককেতা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার
ঐ	ঐ	১৯১৫১৭ নং	এককেতা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার
ঐ	ঐ	১৯৭৫৮৬ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
১৯০০।১	ঐ	৩০৩০১৯ নং	এককেতা ৫০০৲ পাঁচশত টাকার
ঐ	ঐ	২৬৫২৬৪ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
ঐ	ঐ	২৬৫২৬৫ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
ঐ	ঐ	২৬২৩৬৩ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
ঐ	ঐ	২৬২৩৬২ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
ঐ	ঐ	২৭৯২৫৭ নং	এককেতা ১০০৲ একশত টাকার
মোট ৯ নয় কেতা (৯)			২১০০৲ দুই হাজার একশত টাকা

"খ" তপশীল—

১৯০০—১ সালের ৩৪১১৫৩ নং এককেতা ৮৪০০৲ আট হাজার চারি শত টাকা।

একুনে ১০ দশ কেতা — একুন ১০৫০০ দশ হাজার পাঁচ শত টাকা।

লেখক—শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন
৬ ওল্ড পোঃ আঃ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
ইসাদি—শ্রীহরিদাস দত্ত
শ্রীগৌরমাধব দত্ত
১ সিকদারপাড়া লেন, কলিকাতা।

(স্বাক্ষর) শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত
(Sd Illegible)
17-5-29
Registrar of Assurances,
Calcutta.

স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের

—সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে—

অভিনন্দন

কল্যাণভাজন স্যর জগদীশ,

ভগবানের কৃপায় আপনি আজ সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া একাত্তর বৎসরে পড়িতেছেন। সত্তর বৎসরে যমরাজের নাম "ভীমরথ", সেই জন্য সত্তর বৎসরের পর লোকের ভীমরথী হয়। আপনার সেরূপ কিছুই হয় নাই। ইহা যে শুধু আপনারই সৌভাগ্য এবং আমাদেরই সৌভাগ্য, এমন নহে; ইহা জগতের সৌভাগ্য। কারণ, এখন আপনি আর শুধু আমাদের ন'ন—সমস্ত জগতের স্যর জগদীশচন্দ্র বসু।

আমাদের অতিশয় সঙ্কট সময়ে আপনি সভাপতিত্ব করিয়া আমাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন; সে জন্য আমরা সকলেই মনে মনে আপনার পূজা করিয়া থাকি। তাই আজ এই শুভ দিনে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি শতায়ু হউন। ইতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩৩৫।১৫ই অগ্রহায়ণ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
শুভার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টাদশ অধিবেশনে

(মাজু গ্রামে) গৃহীত প্রস্তাবসমূহ :—

১ম প্রস্তাব—মঙ্গলাচরণ।

২য় „ —সাহিত্যিক ও সাহিত্যবন্ধুগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

৩য় „ এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর একটি

উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হউক এবং নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া এতদর্থে একটি সমিতি গঠিত করা হউক। অনধিক তিন বৎসরের মধ্যে যাহাতে এই জীবনী ও গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক এবং এই সম্বন্ধে অর্থ সংগ্রহাদি যাবতীয় কার্য্যের ভার সমিতিকে দেওয়া হউক। সমিতি দুই মাসের মধ্যে লোক নিযুক্ত করিবেন এবং কার্য্যের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্য-বিবরণ সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির নিকট প্রেরণ করিবেন। আবশ্যক বোধ হইলে সমিতি নিজ সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

আরও স্থির হইল যে, এই সম্মিলনের অধিবেশন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলানের পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা এই ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া (ক) কার্য্যকরী সমিতি ও (খ) সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল,—

(ক) কার্য্যকরী সমিতি—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ।
,, মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য—সম্পাদক।
,, হরলাল মজুমদার—সহকারী সম্পাদক।
,, অনিলকুমার সরকার।
,, ফণিভূষণ দত্ত।
,, প্রভাকর মুখোপাধ্যায়।
,, রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য।

(খ) সম্পাদক-সঙ্ঘ—

শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর।
,, ডাঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
,, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।
,, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।
,, রতিকান্ত ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ প্রস্তাব—

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন "রমেশ-ভবন" নির্ম্মাণকল্পে সমস্ত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

(খ) রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য সাহায্য করিতে সমগ্র ভারতবাসী সাহিত্যিক, সাহিত্যানুরাগী এবং স্বর্গীয় মহাত্মার গুণমুগ্ধ ও অনুরাগী ব্যক্তি-মাত্রকেই এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

(গ) কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা হউক এবং তজ্জন্য একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হউক।

পঞ্চম প্রস্তাব—

হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট তথ্যাদিপূর্ণ গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন এবং তাঁহারা এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে অনুরোধ করিতেছেন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্থশালা, পাঠাগার ও প্রচারণ (Circuleting) পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডকে এবং ইংরেজি স্কুল ও কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগারে উপযুক্ত-সংখ্যক উচ্চ শ্রেণীর সুপাঠ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রাখিবার জন্য শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

সপ্তম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সম্মিলনের মতে বঙ্গদেশে বঙ্গভাষাকেই কি উচ্চ, কি নিম্ন, সকল প্রকার শিক্ষারই বাহন করা উচিত। এই সম্মিলন বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচারার্থ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বিত করা আবশ্যক।

(ক) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন এবং ছাত্রেরাও প্রশ্নের উত্তর বাঙ্গালা ভাষায় দিতে পারিবেন—এইরূপে ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

(খ) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(গ) বঙ্গভাষায় উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থপ্রণয়ন এবং সংস্কৃত, আরবী, পার্শী ও ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এবং বিদেশীয় ভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন সদ্‌গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঘ) বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থাবলীর উদ্ধার ও প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(ঙ) দেশের প্রাচীন ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, কিংবদন্তী প্রভৃতির উদ্ধার সাধন ও প্রচারের সুব্যবস্থা করা উচিত।

উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি সম্মিলনের সভাপতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এবং ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী বোর্ড অব এডুকেশনের নিকট প্রেরিত হউক।

অষ্টম প্রস্তাব—

এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, বাঙ্গালা দেশে কৃষিবিষয়ক পত্রিকা অধিক পরিমাণে সাধারণের বোধগম্যরূপে যাহাতে প্রচারিত হয় এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করিয়া পুস্তকাদি প্রচার করা হয়, তদ্বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

নবম প্রস্তাব—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কিংবদন্তী, কৃষি-কথা, ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি, বিভিন্ন জাতির আচার-

ব্যবহার, প্রাদেশিক শব্দ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া সমিতি গঠিত করা হউক। হাওড়া জেলায় এই কার্য্য করিবার জন্য হাওড়াবাসীকে অনুরোধ করা হউক এবং প্রতি বৎসর সম্মিলনের অধিবেশনে এই সমিতিগুলিকে তাহাদের কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক।

দশম প্রস্তাব—

প্রত্যেক জেলায় ঐতিহাসিক তথ্য, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের জন্য জেলা বোর্ডগুলি শিক্ষা-সংক্রান্ত সাহায্য (Grant) হইতে অথবা আবশ্যক হইলে এই উদ্দেশ্যে গবর্মেণ্টের নিকট হইতে শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ হইতে প্রতি বৎসর কতক টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখুন। এই কার্য্যে শিক্ষা দিবার জন্য অন্ততঃ প্রতি বৎসর দশ জন করিয়া ছাত্র ভারত গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব ও জীব-তত্ত্ব বিভাগের নির্দ্দেশ মত যাহাতে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রীক্‌ট-বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হউক, যেন তাঁহারা স্ব স্ব জেলার প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন ও সংগ্রহ করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

একাদশ প্রস্তাব—

বঙ্গদেশে যে সকল মেডিক্যাল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে স্কুল আছে এবং ভবিষ্যতে স্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণ বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত করা হউক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন গবর্মেণ্টকে এইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব—

সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে একটি স্থায়ী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতি গঠন করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। এই শাখা-সমিতি প্রতি মাসে যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার একটি নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাঁহাদিগের মন্তব্য সহ প্রতি বার্ষিক অধিবেশনে সেই নির্ঘণ্ট আলোচনার জন্য উপস্থিত করিবেন।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব—

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক এবং বিষয়ান্তরের আলোচনাকারীদিগের আলোচনার সুবিধার জন্য প্রতি বর্ষে বাঙ্গালার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, আচার, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালা অথবা অন্য ভাষায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের এক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক। সম্ভবপর হইলে এই তালিকা প্রতি বৎসর সম্মিলনে উপস্থাপিত করা হইবে। পরিচালন-সমিতি এই কার্য্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। এই সমিতির সভ্যগণের মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তিকে এক এক বিষয়ের তালিকা সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব—

সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি-গঠিত হয়।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সাধারণ তহবিল, স্থায়ী-তহবিল ও বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ

(আয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল	মোট আয়
১	চাঁদা	৬৫৫০৲	...	...	৬৫৫০৲
২	প্রবেশিকা	৪৭৲	...	...	৪৭৲
৩	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয় ...	৩১৭৲	...	১৪০।৶৬	৪৫৭।৶৬
৪	পত্রিকা বিক্রয়	৭২১।৵০	...	...	৭২১।৵০
৫	বিজ্ঞাপনের আয়	২০০৲	...	...	২০০৲
৬	সুদ আদায়	৮৫৶০	২৪৫৸০	৮০৭৸০	১১৩৮॥৶০
৭	এককালীন দান	১৯০৯৻৬	...	...	১৯০৯৻৬
৮	গভর্ণমেণ্টের বার্ষিক সাহায্য ...	১২০০৲	...	...	১২০০৲
৯	মিউনিসিপালিটীর বার্ষিক সাহায্য ...	৬৫০৲	...	...	৬৫০৲
১০	স্মৃতিরক্ষার নগদ আয়	...	...	৮৫৲	৮৫৲
১১	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায় ...	২৫।/০	...	...	২৫।/০
১২	বিবিধ আয়	৩১॥০	...	...	৩১॥০
১৩	হাওলাত আদায়	৫২৬৷৯	...	৩৫০৲	৮৭৬৷৯
১৪	হাওলাত জমা	৩৫০৲	...	২৩৬॥০	৫৮৬॥০
১৫	আমানত জমা	১৬৲	...	..	১৬৲
১৬	সংবর্দ্ধনার আয়	১০১৲	...	...	১০১৲
১৭	পদক ও পুরস্কার	৪৫৲	...	...	৪৫৲
১৮	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২২৲	...	...	২২৲
	মোট	১২৭৯৬॥৶৩	২৪৫৸০	১৬১৯॥৵৬	১৪৬৬২৵৯

(ব্যয়)

	বিবরণ	সাধারণ তহবিল	স্থায়ী তহবিল	বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল	মোট ব্যয়
১	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩১৫৭॥৵৩	...	৬৬০॥/৯	৩৮১৮।০
২	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১৩২৫৵৯	...	...	১৩২৫৵৯
৩	পুস্তকালয়	২০৮১॥৶৬	...	...	২০৮১॥৶৬
৪	পুথিশালা	২৮৮।/৬	...	...	২৮৮।/৬
৫	চিত্রশালা	৪৯২৸৶৩	...	...	৪৯২৸৶৩
৬	বিবিধ মুদ্রণ	১৮৪।৵৩	...	...	১৮৪।৵৩
৭	ডাকমাশুল	৬২৯।/৬	...	...	৬২৯।/৬
৮	বাড়ী মেরামত	৩৮৪০।৩	...	...	৩৮৪০।৩
৯	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল...	২০৩৲	...	...	২০৩৲
১০	„ তার বদল ও মেরামতি বিল	১০২৲	...	...	১০২৲
১১	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া ...	৬০৲	...	...	৬০৲
১২	„ পোষাক ...	১৫৸০	...	...	১৫৸০
১৩	দপ্তর সরঞ্জামী	১১১।/০	...	...	১১১।/০
১৪	নূতন আসবাব	১৬৸০	...	...	১৬৸০
১৫	গাড়ী ভাড়া	৬৬৲	...	...	৬৬৲
১৬	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২১৵৬	...	...	২১৵৬
১৭	স্মৃতি-রক্ষার ব্যয়	৪৩।৬	...	২৪০।৵৩	২৮৩॥৵৯
১৮	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	১৮৸/৬	...	...	১৮৸/৬
১৯	হাওলাত শোধ	৫১২৲	...	১৭০।৯	৬৮২।৯
২০	বেতন	৩১১৮৸৶৬	...	...	৩১১৮৸৶৬
২১	চাঁদা আদায়ের কমিশন	৪১৯৸/০	...	...	৪১৯৸/০
২২	„ „ গাড়ী ভাড়া ...	৩৭৸/৩	..	...	৩৭৸/৩
২৩	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের দান ...	...	...	১৮১৲	১৮১৲
২৪	স্থায়ী তহবিলের দান ...	...	২৪৫৸০	...	২৪৫৸০
২৫	বিবিধ ব্যয়	১০৭৸৬	...	...	১০৭৸৬
২৬	হাওলাত দাদন	৬০৫৵০	...	৩৫০৲	৯৫৫৵০
২৭	আমানত শোধ	৫৲	...	...	৫৲
২৮	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	১২২।/৬	...	...	১২২।/৬
২৯	ঋণশোধের চাঁদা আদায় জন্য ব্যয় ...	৫॥৬	...	...	৫॥৬
৩০	পদক ও পুরস্কার	১০৸০	...	৪৬॥০	৫৭।০
	মোট	১৭৬০৩।/০	২৪৫৸০	১৬৪৮৸৯	১৯৪৯৭৸/৯

কৈফিয়ত—১৩৩৫

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের মোট আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের মোট ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়				মোট
							কোম্পানীর কাগজ মজুত	ব্যাঙ্কে মজুত	ডাকঘরে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত	
১	সাধারণ তহবিল	৫০৬১৷৷/৪	১২৭৯৬৷৷৶৩	১৭৮৫৮৷৭	১৭৬০৩৷/০	২৫৪৸৶৭	...	...	...	২৫৪৸৶৭	২৫৪৸৶৭
২	স্থায়ী তহবিল	৫৬৩৫৷৵৯	২৪৫৸০	৫৮৮১৵৯	২৪৫৸০	৫৬৩৫ ৵৯	৫৬৯৫৷/৩	...	/৬	...	৫৬৩৫৷৵৯
৩	বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিল	২১৮০৭৸০	১৬১৯৷৷৶৬	২৩৪২৭৶৬	১৬৪৮৸৯	২১৭৭৮৷৷৵৯	২০৯৬৪৷৷৵৯	৪২০৶০	২৬৸/৩	৩৬৬৷৷৶৯	২১৭৭৮৷৷৵৯
	মোট	৩২৫০৪৸১	১৪৬৬২৵৯	৪৭১৬৬৸৵১০	১৯৪৯৭৸/৯	২৭৬৬৯/১	২৬৬০০৲	৪২০৷৶০	২৬৸৵৯	৬২১৷৷৶৪	২৭৬৬৯/১

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি
কত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন।
২৬।২।৩৬

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সভাপতি
আয়-ব্যয়-সমিতি।
৪।২।৩৬

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন।
১৪।২।৩৬

পরীক্ষান্তে হিসাব নির্ভুল
প্রতিপন্ন করিলাম।
শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
৪।২।৩৬

স্থায়ী ও বিভিন্ন গচ্ছিত তহবিলের আয়-ব্যয়-বিবরণ, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

	বিবরণ	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়	মোট	বর্ত্তমান বর্ষের ব্যয়	বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: কোঃ কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	ব্যাঙ্কে মজুত	কার্য্যালয়ে মজুত	সাধারণ-তহবিলে হাওলাত
১	স্থায়ী তহবিল ...	৯৬৩৫।৶৯	২৪৫৸০	৯৮৮১৶৯	১৪৫৸০	৯৬৩৫।৶৯	৫৬৩৫।/৩	/৬	০	০	৪০০০৲
২	লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল ...	১৩০০০৲	৮০৮৸৬	১৩৮০৮৸৬	৮০৮৸৬	১৩০০০৲	১৩০০০৲	০	০	০	০
৩	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৭৬৭॥৶০	৪১৶০	৮০৮৸/০	৫৭৲	৭৫১৲/০	৭১১৸/০	০	০	৪০৲	০
৪	অক্ষয়কুমার বড়াল স্মৃতি-তহবিল ...	২৭০৲	১১৸০	২৮১৸০	১০৸০	২৭১৲	২৭১৲	০	০	০	০
৫	মাইকেল মধুসূদন বার্ষিক স্মৃতি-তহবিল ...	৪৯॥৯	০	৪৯॥৯	২২।৶৯	২৭/০	০	০	০	২৭/০	০
৬	ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-তহবিল ...	১২৫৪৸০	৬২॥০	১৩১৭।০	০	১৩১৭।০	১২৭৫৲	০	০	৪২।০	০
৭	কাশীরাম দাস স্মৃতি-তহবিল ...	৩২৫॥/৯	১৬।০	৩৪১৸/৯	০	৩৪১৸/৯	৩৪১৸/৯	০	০	০	০
৮	বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিল ...	৯৯৯৸/৬	৫০৸/০	১০৫০॥৶৬	॥৶০	১০৫০৶৬	৯৫৫৲	০	০	৯৫৶৬	০
৯	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী স্মৃতি-তহবিল ...	২০৬৪৶৯	১০৩৶০	২১৬৭।৯	০	২১৬৭।৯	২১১০৲	২৬৸/৩	৩০।৶০	৶৬	০
১০	দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার ...	২৪৬৪৸৶৩	৮০।/০	২৫৪৫।৩	১৮১৲	২৩৬৪।৩	২৩০০৲	০	০	৬৪।৩	০
১১	স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৬৫০	০	৬৫।০	০	৬৫।০	০	০	০	৬৫।০	০
১২	মনোমোহন চক্রবর্ত্তী স্মৃতি-তহবিল ...	৫০৲	০	৫০৲	৩২৲	১৮৲	০	০	০	১৮৲	০
১৩	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি স্মৃতি-তহবিল ...	১০০৲	১০০৲	২০০৲	১০০৲	১০০৲	০	০	১০০৲	-	০
১৪	সাহিত্য-সংরক্ষণ তহবিল ...	১৪৫৲	১৪৫৲	২৯০৲	১৪৫৲	১৪৫৲	০	০	১৪৫৲	০	-
১৫	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি-তহবিল ...	১৪৫৲	১০৫৲	২৫০৲	১০৫৲	১৪৫৲	০	০	১৪৫৲	০	০
১৬	স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিল ...	৩৯৲	৫৲	৪৪৲	৪০৸৶৬	৩/৬	০	০	০	৩/৬	০
১৭	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি-তহবিল ...	৬৫৲	০	৬৫৲	৬৫৲	০	০	০	০	০	০
১৮	গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী স্মৃতি-তহবিল ...	২৲	২৯৲	৩১৲	৩০৲	১৲	০	০	০	১৲	০
১৯	গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ,, ...	০	৫০৲	৫০৲	৫০৲	০	০	০	০	০	০
২০	মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ,, ...	০	১৲	১৲	০	১৲	০	০	০	১৲	০
২১	মহাভারত আদিপর্ব্ব তহবিল ...	০	১০৲	১০৲	।০	৯৸০	০	০	০	৯৸০	০
	মোট	৩১৪৪৩৶৯	১৮৬৫।৶৬	৩৩৩০৮॥৶৩	১৮৯৪॥৯	৩১৪১৪/৬	২৬৬০০৲	২৬৸৶৯	৪২০।৶০	৩৬১॥৶৯	৪০০০৲

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ—হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সভাপতি,

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
সভাপতি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীরামকমল সিংহ—প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

গত বর্ষের হাওলাত দাদন——১০৮৯৪৶৯

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিকিউরিটী জন্য— ৪০৲

১০,৯৩৪৶৯

বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত দাদন ৬০৫।৶০

১১৫৩৯।।৴৯

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের হাওলাত আদায়—— ৫২৬।৯

১১,০১৩৴০

জায়—

১। রমেশভবন—১০৪৩৯৸৶০

২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১৬০৸৴০ (চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন জন্য)

৩। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী তহবিল———— ·২৩৬৷৷০

৪। শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী——৩০৲

৫। শ্রীনিবারণচন্দ্র সুর—১০৬৲

৬। ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন——৩০৲

১১,০১৩৴০

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

গত বর্ষের আমানত জমা ——১২০।০

বর্ত্তমান বর্ষের আমানত জমা—১৬৲

১৩৬।০

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের আমানত শোধ—৫৲

১৩১।০

জায়—

১। পাঁচুরাম বারি————৫০৲ (জমাদার)

প্রোবোষ্টোন কোং————২০৲

পুস্তক বিক্রয় বাবদ জমা——১।০

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের সমাধি সংরক্ষণ জন্য————১৫৲

৫। পুস্তকালয়ের বহি আদান প্রদানের ডাকমাশুল বাবদ———৩৲

৬। চণ্ডীদাসের পদাবলীর গ্রাহক শ্রেণী —অগ্রিম জমা————৭৲

৭। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র দাস———৫৲

১৩১।০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।
২৬।২।৩৬

শ্রীমন্মথনাথ গুপ্ত
শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।৩৬

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীগণপতি সরকার
কোষাধ্যক্ষ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়
কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
আয়-ব্যয়-সমিতির সভাপতি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
৪।২।৩৬

এককালীন দান ও বার্ষিক সাহায্যের তালিকা

১। বার্ষিক সাহায্য- -১৮৫০৲

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট- —১২০০৲

মিউনিসিপালিটী- —৬৫০৲

১৮৫০৲

২। এককালীন দান- ———১৪২৯॥৯

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা——৫০৪॥৯

" রায় সূর্য্যকান্ত চৌধুরী—৩০০৲

রাজা " গোপাললাল রায় বাহাদুর——২৫০৲

(৫০০৲ মধ্যে)

" হরিদাস বসু——-—২০০৲

" যতীন্দ্রনাথ বসু———১৫০৲

" বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য——২৫৲

১৪২৯॥৯

৩। স্থায়ী তহবিলের সুদ হইতে প্রাপ্ত—- -২৪৫৸০

৪। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী তহবিল হইতে খরচ আদায়--——————- -২৩৩৷৶৯

৫। কলিকাতার মেয়র, করপোরেশনের অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণের সংবর্দ্ধনার জন্য চাঁদা আদায়—— -৬৪৲

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—১৫৲

কুমার ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা————১৫৲

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত——————১৫৲

" যতীন্দ্রনাথ বসু——————১৫৲

ডাঃ " পঞ্চানন নিয়োগী —————২৲

" নিবারণচন্দ্র রায়————--—২৲

৬৪৲

৬। আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য চাঁদা আদায়——— -৩৭৲

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী— ৲

" যতীন্দ্রনাথ বসু— ৫৲

ডাঃ " যতীন্দ্রনাথ মৈত্র-- ৫৲

" বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫৲

রায় " খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর—৫৲

ডাঃ " বনওয়ারিলাল চৌধুরী—২৲

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর——২৲
,, জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ——২৲
অধ্যাপক ,, নিবারণচন্দ্র রায়——২৲
,, কিরণচন্দ্র দত্ত——২৲
,, গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—২৲

৩৭৲

৭। পুরস্কার প্রদানের জন্য——৪৫৲

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন ৪৫৲

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ স্থায়ী তহবিল।

আয়		ব্যয়	
১। কোং কাগজের সুদ আদায়—	৪৫৫৲	১। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ব্যয়—	৬৩৮।৶৯
২। গ্রন্থাবলী বিক্রয় (সেটে ও খুরচা)	১১৭।৬	২। সাধারণ তহবিলের হাওলাত শোধ—	১৭০।৯
৩। সাধারণ তহবিল হইতে হাওলাত জমা—	২৩৬॥০		
	৮০৮৶৬		৮০৮৶৬

কৈঃ—

গতবর্ষের জের—	১৩০০০৲
—	৮০৮৶৬
	১৩৮০৮৶৬
বাদ ব্যয়—	৮০৮৶৬
উদ্বৃত্ত —	১৩০০০৲

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী— সভাপতি।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু—সম্পাদক।
শ্রীগণপতি সরকার—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি।
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু,
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—আয়-ব্যয়-সমিতির অধিবেশনের সভাপতি।

শ্রীরামকমল সিংহ— প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল—হিসাব-রক্ষক।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ।

আয়

১।	চাঁদা	৬৭৫০্
২।	প্রবেশিকা	১০০্
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	৫০০্
৪।	পত্রিকা বিক্রয়	১২৫্
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৩৫০্
৬।	স্থায়ী ও গচ্ছিত তহবিলের সুদ আদায়	১০৫৩্
৭।	বার্ষিক সাহায্য	৭৮৫০্
	(ক) বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ১২০০্	
	(খ) কলিকাতা করপোরেশন	
	(১) চিত্রশালা ও পুথিশালার জন্য ৬০০০্	
	(২) পুস্তকালয়ের জন্য ৬৫০্	
	৭৮৫০্	
৮।	এককালীন দান	২৫০০্
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২৫০্
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	২৫্
১১।	বিবিধ আয়	২৫্
১২।	হাওলাত আদায়	৩৭২॥০
১৩।	সংবর্দ্ধনার চাঁদা আদায়	২৫্
১৪।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	২৫্
১৫।	পদক ও পুরস্কার	৫০্
১৬।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	২৫৪্
১৭।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	৫০্
		২০,৯০৪॥০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
সম্পাদক।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক

ব্যয়

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	৩৬০০্
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	১২০০্
৩।	পুস্তকালয়	১৮০০্
৪।	চিত্রশালা ও পুথিশালা	৩৪৭২্
৫।	বেতন	৬৫০৪্
	(ক) চিত্রশালা ও পুথিশালা ২৮৫৬্	
	(খ) গ্রন্থাবলী মুদ্রণ বিভাগ ৯৪৮্	
	(গ) পুস্তকালয় ,, ৩৯৬্	
	(ঘ) সাধারণ ,, ২৩০৪্	
	৬৫০৪্	
৬।	বিবিধ মুদ্রণ	২০০্
৭।	ডাকমাশুল	৬০০্
৮।	বাড়ী মেরামত	৫০
৯।	ইলেক্‌ট্রিক লাইট ও পাখার বিল	২০্
১০।	তার বদল ও মেরামতের বিল	১৫০্
১১।	ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া	৬০্
১২।	ভৃত্যদিগের পোষাক	২৫্
১৩।	দপ্তর সরঞ্জামী	১০০্
১৪।	গাড়ী ভাড়া	৭০্
১৫।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২৫০্
১৬।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	২৫্
১৭।	পদক ও পুরস্কার	৫০্
১৮।	চাঁদা আদায়ের কমিশন ও গাড়ী ভাড়া	৪২৫্
১৯।	সংবর্দ্ধনার ব্যয়	২৫্
২০।	দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার	১৯২্
২১।	বিবিধ ব্যয়	৭৫্
২২।	বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন	২৫্
২৩।	জল ড্রেন পায়খানা	১২০০্
২৪।	চতুঃসীমার প্রাচীর	৩০০্
		২০,৫৯৮্

শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়।
সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি।
১৪।২।৩৬

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় পরীক্ষার মন্তব্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া, হিসাব নির্ভুল দেখা গেল।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দের হিসাব পরীক্ষার মন্তব্যানুসারে এই বৎসরে পরিষদের তিনটী তহবিলের পৃথক্ পৃথক্ তিনখানি ক্যাশ-পুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে,—

(১) পরিষদ্ সাধারণ তহবিল (Main cash)

(২) বিভিন্ন বিশিষ্ট-ভাণ্ডার (গচ্ছিত তহবিল) (Trust fund)

(৩) সাধারণ স্থায়ী তহবিল (Reserved fund)

পরিষদে যেমন তিনখানি ক্যাশপুস্তক রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তদ্রূপ এই তিনখানি ক্যাশপুস্তকের তিনখানি খতিয়ান (Cash abstract) রাখিলে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি, পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন।

সাধারণ স্থায়ী তহবিলের মজুত জমা ৯৬৩৫৷৶৯ টাকার মধ্যে কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ সাধারণ তহবিল ৪০০০৲ টাকা হাওলাত লইয়াছেন, সুতরাং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উদ্বৃত্ত জমা (Opening Balance) ৫৬৩৫৷৶৯ টাকা দেখান হইয়াছে।

এককালীন দান

গত বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরে সাধারণের নিকট হইতে দান বেশী পাওয়া গিয়াছে। মাননীয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা হাওলাত শোধ খাতে খরচ হইয়া এককালীন দান খাতে জমা হইয়াছে।

মহাভারত আদিপর্ব্ব মুদ্রণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকাও এককালীন দান খাতে জমা দেখান হইয়াছে।

গত বৎসরের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ভিন্ন ভিন্ন তহবিলের মজুত কোম্পানী কাগজের সুদের দুই বৎসর কালের টাকা ও কোম্পানী কাগজ একখানি বিক্রয়ের প্রিমিয়াম্ (Premium) টাকা এককালীন দান খাতে জমা দেখান হওয়ায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের এককালীন দান ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ অপেক্ষা বেশী পাওয়া গিয়াছে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে সাধারণ স্থায়ী তহবিলের মজুত কোম্পানীর কাগজের সুদ ২৪৫৮৹ টাকা ও পরিষদ্ সাধারণ তহবিল হইতে লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের পুস্তক মুদ্রণ, ডাকমাশুল প্রভৃতির ২৩৩৷৶৯ টাকা খরচ যাহা হইয়াছিল, তাহা লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আদায় হইয়া পরিষদ্ সাধারণ তহবিলের এককালীন দান খাতে জমা দেখান হইল।

মন্দির মেরামত

পরিষদ্ মন্দির মেরামত নিমিত্ত কলিকাতা করপোরেশন হইতে প্রাপ্ত ২৫,০০০৲ টাকার মধ্যে পরিষদ্ রমেশভবনকে ১০,০০০৲ টাকা হাওলাত দাদন (Loan) দিয়াছেন এবং ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন আফিসে সিকিউরিটী ডিপজিট (Security deposit)

দিবার জন্য আরও ৪০৲ টাকা হাওলাত দাদন দেওয়া হইয়াছিল। এই মোট ১০,০৪০৲ টাকা দাদন দেওয়া বাদে মন্দির মেরামতের জন্য জমা অপেক্ষা খরচ ৩১৫৵০ বেশী হওয়ায় ঐ টাকা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পরিষৎ সাধারণ তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। মন্দির মেরামতের জন্য কণ্ট্রাক্টারের বিলের টাকা সমুদয় পরিশোধ হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডার

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল

আয়—

কোম্পানীর কাগজের সুদ আদায়	৪৫৫৲
পুস্তক বিক্রয়ের টাকা পরিষদ্ সাধারণ তহবিল হইতে প্রাপ্ত	১১৭।৬
	৫৭২।৬

ব্যয়—

পরিষৎ সাধারণ তহবিলের হাওলাত শোধ	১৭০।৯
সঙ্কীর্ত্তনামৃত পুথি নকল	৫৲
২২ রিম কাগজ ৮৸৵০ হিঃ	১৮৯৸০
২১ ফর্ম্মা মুদ্রণের খরচ ১০৲ হিঃ	২১০৲
উক্ত তহবিলের অন্যান্য খরচ যাহা পরিষদ্ সাধারণ তহবিল হইতে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা প্রদানার্থে	২৩৩॥৶৯
	৮০৮৸৬

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের আয় ৫৭২।৬ ও ব্যয় ৮০৮৸৬। সুতরাং এই ব্যয় মিটাইবার জন্য এ বৎসরেও লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল ২৩৬॥০ টাকা হাওলাত গ্রহণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র ১৩০০০৲ টাকা কোম্পানীর কাগজ মজুত আছে।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

এই তহবিলে কোম্পানীর কাগজের সুদ ২৪৫৸০ টাকা আদায় হইয়া পরিষদ্ সাধারণ তহবিলে এককালীন দান খাতে জমা হইয়াছে।

মজুত জমা———২৭৬৬৯/১

(Closing Balance)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের তিনটি তহবিলের এক সঙ্গে হিসাবের কৈফিয়তে ৩১৬৬৯/১ টাকা মজুত জমা দেখান হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে পরিষদ্ সাধারণ তহবিলে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হাওলাত ৪০০০৲ টাকা সাধারণ স্থায়ী তহবিলের কোম্পানীর

কাগজ ও ডাকঘরে মজুত জমা ৫৬৩৫।৵৯ টাকার সহিত যোগ হইয়া হিসাবে দেখান হওয়ায় আমার হিসাবের সহিত ৪০০০৲ টাকার অমিল হইয়াছে। আমার মতে ঐ ৪০০০৲ টাকা সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উদ্বৃত্ত জমায় দেখান উচিত নহে। কারণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের মজুত জমার হিসাবে বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত জমায় ৩১৪৪৩৵৯ টাকা দেখান হইয়াছে। তন্মধ্যে গচ্ছিত তহবিলের উদ্বৃত্ত জমা টাকা ২১৮০৭৸০ টাকা হওয়ায় সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উদ্বৃত্ত জমা ৯৬৩৫।৵৯ টাকা হইয়াছে। এবং এই টাকা পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে। কিন্তু ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের সাধারণ স্থায়ী তহবিলের ক্যাশপুস্তকে ৫৬৩৫।৵৯ টাকা মজুত দেখান হইয়াছে। যখন সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে ৪০০০৲ টাকা পরিষদ্ সাধারণ তহবিলে হাওলাত দাদন প্রদত্ত হইয়াছে, তখন সাধারণ স্থায়ী তহবিলের উদ্বৃত্ত জমা ৯৬৩৫।৵৯ টাকা হইতে ৪০০০৲ টাকা বাদ দিয়া ৫৬৩৫।৵৯ টাকা মজুত দেখান কর্ত্তব্য। মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিবেন।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত জমা————		২৭৬৬৯/১ টাকা
কোম্পানী কাগজে মজুত-————	২৬৬০০৲	
ব্যাঙ্কে মজুত————————	৪২০।৶০	
ডাকঘরে মজুত————————	২৬৮৵৯	
কার্য্যালয়ে মজুত————————	৬২১৷৷৶৪	
	২৭৬৬৯/১	

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরে কার্য্যালয়ে মজুত টাকা অনেক বেশী রহিয়াছে দেখিলাম। মজুত জমার কৈফিয়ত সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে, এবং ইহা দৃষ্টে তিনটী পৃথক্ তহবিলের মজুত জমার টাকা কত, তাহা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৎসরের শেষে উদ্বৃত্ত জমায়,—কোম্পানী কাগজে মজুত জমার টাকা দেখান সম্বন্ধে পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কোম্পানী কাগজে মজুত টাকা Capital হিসাবে মজুত রাখিয়া, ব্যাঙ্কে, ডাকঘরে ও কার্য্যালয়ে মজুত নগদ টাকা কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত মজুত জমায় দেখান হইবে। কারণ, বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত জমায় মজুত অনেক টাকা দেখিয়া পরিষদের ক্যাশে অনেক টাকা আছে, ইহা অধিকাংশ সদস্য অনুমান করিয়া থাকেন এবং পরিষদ্ Solvent, এই মন্তব্যও অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ বাবুর এই যুক্তি আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। কোম্পানী কাগজে মজুত জমা Capital account নহে, উহা Property এবং assetsএর অন্তর্গত। যেমন Building, Furniture ইত্যাদি Block accounts উক্ত Property and assetsএর অন্তর্গত। পরিষদের গৃহ ও আসবাবাদির মূল্য কত, তাহা এখন পর্য্যন্তও ধার্য্য না থাকায় পরিষদের Balance Sheet প্রস্তুতেরও কোনরূপ আশু সম্ভাবনা নাই—যদিও গৃহ ও আসবাবাদির মূল্য ধার্য্য করিয়া পরিষদের রেওয়া (Balance Sheet) প্রস্তুতের জন্য আমি এবং ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য হিসাব-পরীক্ষকগণ বহুবার সভ্যগণকে জানাইয়াছিলাম। যখন Balance Sheetএ পরিষদের হিসাব দেখান হইতেছে না, তখন যদি সমুদয় সভ্যের অনুমোদন হয়, তাহা হইলে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত জমা (Opening Balance) মোট ২৭৬৬৯/১ হইতে কোম্পানী কাগজে মজুত ২৬৬০০৲ টাকা বাদ দিয়া মোট ১০৬৯/১ টাকা দেখাইয়া এই টাকা তিন তহবিলে মজুত নগদ টাকা হিসাবানুসারে দেখাইতে হইবে; পরে বৎসরের শেষে হিসাবে আয় ব্যয়ে কোম্পানী কাগজে মজুত টাকা উভয় দিকে দেখাইলে হিসাবের কোন ভুল থাকিবে না, বরং

কেবলমাত্র নগদ মজুত টাকা বর্ষশেষে মজুত জমায় থাকিয়া যাইবে। অথচ কোম্পানী কাগজে মজুত জমার টাকাও আয়-ব্যয় হিসাবে ও Contraentry হইয়া দেখান হইবে। পরিষৎ সাধারণ তহবিল ক্যাশে প্রথমে এই entry করিয়া, পরে অন্য তহবিলের ক্যাশে ইহা দেখাইতে হইবে।

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—আমি ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পরিষদের তিনটী তহবিলের আয়-ব্যয় এবং তৎসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক নথিপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া যে সমুদয় বিষয় আবশ্যক মনে করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটু একটু মন্তব্য (Touching remarks) প্রকাশ করিয়াছি। যদিও পরিষদের হিসাবাদি অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তথাপি এই হিসাব দৃষ্টে অনেকেই পরিষদের আভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বুঝিতে পারিবেন না জানিয়া হিসাব-পরীক্ষকের কর্ত্তব্যানুসারে কতকগুলির সম্বন্ধে টীকা (Comment) দিতে বাধ্য হইয়াছি। যেমন তিনটী তহবিলের তিনখানি ক্যাশবুক প্রস্তুত হইয়াছে, সেইরূপ তিনটী ভিন্ন তহবিলের তিনটি পৃথক্ খতিয়ান প্রস্তুতও করা উচিত। ইহাতে কাজেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয় তত সন্তোষজনক নহে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে উক্ত তহবিলে ৫৩৬১।।/৪ মজুত ছিল। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ঐ মজুত জমার সহিত আয় ব্যয়ের হিসাব মিশাইয়া ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের উদ্বৃত্ত জমায় (Closing Balance) কেবল মাত্র ২৫৪৮৶/১ টাকা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৫০৲ টাকা পুস্তকের দেনার জন্য ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে চৈত্র মাসে প্রদানের কথা ছিল, কিন্তু উহা চৈত্র মাসে প্রদত্ত না হইয়া ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে প্রদান করা হইয়াছে। আমি দেনার তালিকা (Liabilities) পরীক্ষার সময় ইহা দেখিয়াছি। আগামী বৎসরে যদি আয় না বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে পরিষদের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় হইবে। সদস্য মহোদয়গণ অনেকেই পরিষদের হিসাব একবার মাত্র পড়িয়া লয়েন। কিন্তু কিরূপ কষ্টের সহিত পরিষদের কার্য্য চলিতেছে, তাহা অনেকেই অনুসন্ধান করিবার সময় পান না। সুতরাং হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্য পাঠে তাঁহারা পরিষৎ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইয়া, ইহার অর্থকষ্ট দূর করিবার মানসে বিশেষ চেষ্টা করিবেন। যাহা হউক, হিসাব সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়াছে ও পরীক্ষায় হিসাব নির্ভুল দেখিয়াছি। হিসাব পরীক্ষার সময়ে রামকমল বাবু, সূর্য্যকুমার বাবু প্রভৃতি সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বঙ্গের গৌরবস্তম্ভ, বাঙ্গালীর চির আদরের বস্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে আমার ন্যায় অতি নগণ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করায় আমি মাননীয় সভ্য মহোদয়গণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। পরিষদের কার্য্যের সামান্য অংশ আমি বহন করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। আমার সাধ্যমত হিসাব পরীক্ষা করিয়া আমি অদ্য পরিষদের প্রণম্য মাননীয় সদস্য মহোদয়গণের নিকট পরীক্ষার মন্তব্য সহ উপনীত হইলাম। আমার সাদর সম্ভাষণ সকলকে জানাইয়া অদ্য বিদায় লইলাম। যদি সভ্যগণের ইচ্ছায় আমি ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে পুনরায় হিসাব-পরীক্ষক-পদে নির্ব্বাচিত হই, তাহা হইলে আবার সকলকে আমার অভিভাষণ জানাইব। পরিষদের অন্যতম হিসাবপরীক্ষক মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত বাহাদুর হিসাব পরীক্ষার সময়ে আমায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। ইতি।

বিনীত

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬। হিসাবপরীক্ষক।